আলোরপথ

৮ম সংখ্যা, ১১ মার্চ ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ, ১ রমজান ১৪৪৫ হিজরি

রামাদ্বানুল মোবারক : কুরআন মাজিদ ও তাকওয়া

আসুন পবিত্র মাহে রামাদ্বানের বরকতে সিক্ত হই

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় নব্য-ঔপনিবেশিক আঘাতগুলোকে চ্যালেঞ্জ করতেই হবে

ইসলামে দাওয়াহ'র মধ্যমপন্থী পদ্ধতি

রামাদ্বান মাসে অন্যতম বড়ো সহজ আমল : দোয়া

আলোরপথ

৮ম সংখ্যা, ১১ মার্চ ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ
১ রামাদ্বান ১৪৪৫ হিজরি

উপদেষ্টামণ্ডলী
ব্যারিস্টার হামিদ হোসাইন আজাদ
ড. মুহাম্মাদ আব্দুল বারী
মোসলেহ ফারাদী
নুরুল মতিন চৌধুরী
মোসাদ্দেক আহমেদ
ড. দিলদার হোসেন চৌধুরী

সম্পাদক
আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

সম্পাদনা সহযোগী
সৈয়দ তোফায়েল হোসেন
মোস্তাকিম প্রামানিক
আবু ইহসান
মুজাম্মেল হোসেন তুহিন
ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান
ব্যারিস্টার আবু বকর মোল্লা
ড. মুহাম্মদ এহসানুল হক

পাবলিকেশন্স সহযোগী
জামিল মাহমুদ

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
কনসেপ্ট ডিজাইন
conceptdesign1971@gmail.com

প্রকাশকাল
মার্চ : ২০২৪

প্রকাশনায়
MUSLIM COMMUNITY ASSOCIATION
মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন (এমসিএ)
3rd Floor Business Wing
38-44 Whitechapel Road
London E1 1jx
www.mcasite.org

সূচিপত্র

- রামাদ্বানুল মোবারক : কুরআন মাজিদ ও তাকওয়া ০৪
  খুররম মুরাদ
- আসুন পবিত্র মাহে রামাদ্বানের বরকতে সিক্ত হই ১১
  হামিদ হোসাইন আজাদ
- ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় নব্য-ঔপনিবেশিক আঘাতগুলোকে চ্যালেঞ্জ করতেই হবে ১৪
  ড. মুহাম্মাদ আব্দুল বারী
- ইসলামে দাওয়াহ'র মধ্যমপন্থী পদ্ধতি ১৭
  মোসলেহ ফারাদী
- রামাদ্বান মাসে অন্যতম বড়ো সহজ আমল : দোয়া ২১
  শায়খ আবদুল কাইয়ুম
- রোজার আদব ও হাকিকত ২৩
  ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ গাজালী (রহ.)
- ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গঠনে রামাদ্বান ও কুরআন ২৫
  নুরুল মতিন চৌধুরী
- মাহে রামাদ্বান ও রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সিয়াম সাধনা ২৮
  অধ্যাপক মফিজুর রহমান
- রামাদ্বান এবং আমাদের করণীয় ৩৭
  মুহাম্মদ আবুল হুসাইন খান
- মুসলিম মাইনোরিটি এলাকায় রামাদ্বান পালন ৪৫
  ডা. মোহাম্মদ আমিন
- রামাদ্বান : প্রশিক্ষণের এক অনুপম মাস ৪৮
  ড. আব্দুস সালাম আজাদী
- যিকরুল্লাহ ৫৪
  ব্যারিস্টার মু. আবু বকর সিদ্দিক মোল্লা
- ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ছে ইসলামের জ্যোতি ৫৬
  সাঈদ চৌধুরী
- মধ্যম ও মধ্যমপন্থা ৬৯
  ড. মুহাম্মাদ মুজাম্মিল এইচ. সিদ্দিকী
- আত্মগঠনে ক্বিয়াম আল-লাইল : সমাজ সংস্কার আন্দোলনে নববী আদর্শ ৭১
  আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ
- রামাদ্বান মাসের ঐতিহাসিক সব বিজয় ৭৯
  আলী আহমদ মাবরুর
- মিযান-২ ৮২
  মো. সারওয়ার কবির শামীম
- মুসলমানদের সোনালি অতীত (৩য় পর্ব) ৮৬
  আবু নাঈম মু শহীদুল্লাহ
- মাহে রামাদ্বান উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সভাপতির বাণী ৯০
- সংগঠন সংবাদ ৯৩

সম্পাদকীয়

আলহামদুলিল্লাহ। শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, বিশ্বজগতের একমাত্র অধিপতি, আমাদের মালিক, আমাদের রব আল্লাহ তায়ালার নিকট, যিনি আমাদেরকে আলোর পথ ম্যাগাজিনের ৮ম সংখ্যা প্রকাশ করার তাওফিক দান করেছেন। দরুদ ও সালাম পেশ করছি মানবতার মুক্তিদূত, রাহমাতুল্লিল আলামিন হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর প্রতি।

আমাদের সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাগণ এবার এমন একটি সময়ে আলোর পথ পেতে যাচ্ছেন, যখন রহমত, মাগফিরাত আর নাজাতের বার্তা নিয়ে পবিত্র রামাদ্বান মাস আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছে। এ কারণে, এবারের আলোর পথ আমরা রামাদান সংশ্লিষ্ট লেখনী দিয়েই সাজানোর চেষ্টা করেছি।

আলোর পথের শুরুতেই আমাদের রাহবার খুররম জাহ মুরাদের রামাদান বিষয়ক একটি লেখা রয়েছে, যা আজকের সময়েও ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। রামাদ্বান মাসের বারাকাতে সিক্ত হওয়ার মতো প্রেরণাদায়ক একটি লেখার পাশাপাশি আরও থাকছে এই মাসে সহজে কিছু বাড়তি আমল করার টিপস, রোজার আদব ও হাকীকত, ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গঠনে রামাদ্বানের প্রভাব, নবিজি (সা.) যেভাবে সিয়াম সাধনা করতেন, রামাদান মাসে আমাদের দায়িত্ব ও করণীয়, সংখ্যালঘু মুসলিম এলাকায় রামাদান পালনের পদ্ধতি, রামাদান মাসের প্রশিক্ষণ, কিয়ামুল লাইল কিংবা রামাদান মাসে ইসলামের সব ঐতিহাসিক বিজয়ের ওপর একটি নিবন্ধসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ লেখনি।

একইসঙ্গে, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আর্টিকেলও এবারের সংখ্যায় প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। বিশেষ করে নব্য ঔপনিবেসিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার গুরুত্ব ও প্রক্রিয়া, ইসলামে বিশেষ করে দাওয়াতি কার্যক্রমে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের গুরুত্বও নিয়ে দুটো লেখা থাকছে।

আলোর পথে লেখা দিয়ে, বিজ্ঞাপন দিয়ে কিংবা মূল্যবান সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়ে যারা আমাদের পাশে আছেন, তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আশা করছি, এই সহযোগিতা আগামী দিনগুলোতেও একইভাবে অব্যাহত থাকবে। ইসলামের সুমহান বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার এই উদ্যোগে আমাদের অংশগ্রহণকে আল্লাহ তায়ালা কবুল করে নিন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে এর বিনিময়ে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমিন।

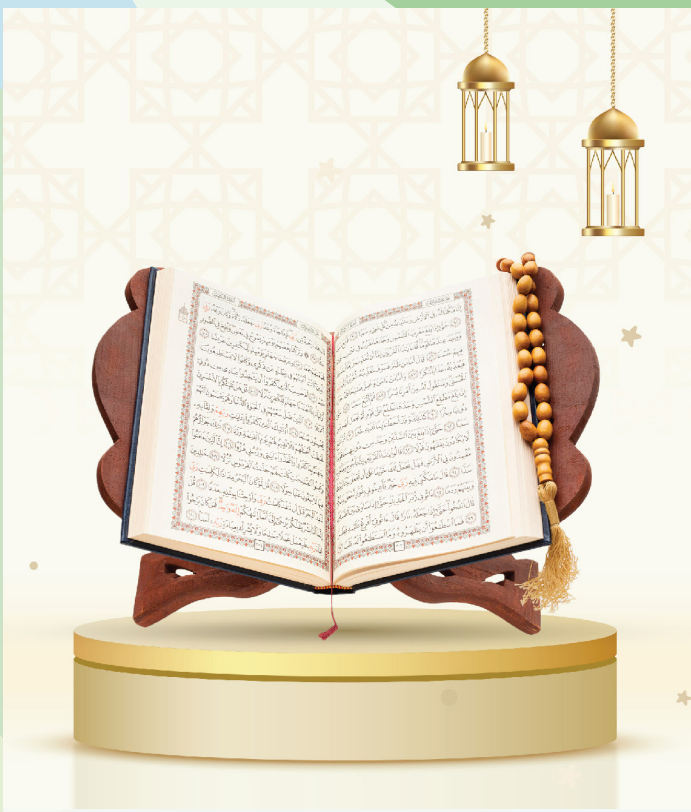

রামাদ্বানুল মোবারক : কুরআন মাজিদ ও তাকওয়া

খুররম মুরাদ

আর মাত্র কয়েকদিন অতিবাহিত হলে রামাদ্বানের মোবারক মাস আরেকবার আমাদের উপর ছায়া বিস্তার করবে, তার রহমতের বারিধারায় আমাদের জীবন সিক্ত করতে থাকবে। সেই পবিত্র মাসের মহত্ত্ব এবং বরকত সম্পর্কে আমাদের কিইবা বলার আছে? যেখানে স্বয়ং নবি করিম (সা.) এ মাসটিকে 'শাহরুন আযিম' এবং 'শাহরুম মোবারক' নামে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ এ মাসটি হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মহান মাস, বরকতের মাস। আমাদের বর্ণনা এ মাসের মহত্ত্বকে ছুঁতেও পারবে না, আর না আমাদের ভাষা এর বরকত বর্ণনা করে শেষ করতে পারবে।

এ মোবার মাসটি মহান কেন?

এ মাসেরই আঁচলে এমন একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও মহামূল্যবান রাত্রি লুকায়িত আছে, যে রাতে হাজার মাসের চেয়েও অধিক কল্যাণ ও বরকতের কোষাগার লুটিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং লুটিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে। সেই মোবারক রাতেই আমাদের মহান প্রতিপালক আমাদের জন্য তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রহমত আমাদের উপর নাজিল করেছেন।

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ - الدخان : ٣

"আমরা একে (সুস্পষ্ট কিতাব) বরকতের রাতে নাজিল করেছি।" (সুরা আদ দুখান : ৩)

এ কিতাবটা কী? رحمةً مِن رَّبِّكَ (তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে রহমত)। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে এ মাসের প্রতিটি দিবস পবিত্র। প্রতিটি রাত বরকতপূর্ণ। এর প্রতিটি দিনের সূর্যোদয়ের সাথে সাথে অগণিত বান্দাহ প্রভুর আনুগত্য এবং সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের শরীরের বৈধ আকাঙ্ক্ষা এবং প্রয়োজনীয় চাহিদা পরিত্যাগ করে সাক্ষ্য দেয় যে, শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালাই তাদের প্রভু এবং একমাত্র তিনিই তাদের চাওয়া পাওয়ার মূল লক্ষ্যবস্তু। জীবনের প্রকৃত ক্ষুধা এবং পিপাসা হচ্ছে তাঁর আনুগত্য এবং ইবাদাত করা। একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত রয়েছে অন্তরের প্রশান্তি আর শিরা-উপশিরার প্রবাহ।

আর যখন রাতের অন্ধকার নেমে আসে, তখন অসংখ্য বান্দাহ আল্লাহ তায়ালার সামনে কিয়াম, তাঁর সাথে কথা বলা এবং তাঁর যিকিরের স্বাদ ও বরকত সংগ্রহ করে ধন্য হতে থাকে। আর এভাবে তাদের অন্তর উজ্জ্বল প্রদীপ হয়ে রাতের আকাশের তারার মতো চমক সৃষ্টি করতে থাকে।

مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّى رِجَالٌ : لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلٰوةِ وَإِيتَاءِ الزَّكُوةِ من ص

"ঐ আলোর উদাহরণ এমন যেমন তাকের উপর একটা প্রদীপ রয়েছে। প্রদীপের বাইরে কাঁচের চিমনি আছে। চিমনি হীরার মতো চক চক করছে। অথচ লোকদের ব্যবসা বাণিজ্য, কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহর যিকির, নামাজ কায়েম এবং যাকাত আদায়ের ব্যাপারে বিভ্রান্ত করতে পারে না।" (সুরা নুর : ৩৫-৩৭)

এ মাসের প্রতিটি মুহূর্তের মধ্যে এত বেশি বরকত লুকায়িত আছে যে, নফল সৎকাজগুলো ফরজ সৎকাজের মর্যাদা পায়। আর ফরজ কাজগুলো সত্তর গুণ অধিক মর্যাদা পায়। (সালমান ফারসী, বায়হাকী) রামাদ্বান মাস এলে আকাশের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় এবং রহমত বর্ষণ হতে থাকে। জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। সৎপথে চলা সকলের জন্য সহজ এবং উন্মুক্ত হয়ে যায়। শয়তানকে শিকলে আবদ্ধ করা হয়। অন্যায় ও অসৎ তৎপরতা বিস্তারের সুযোগ অপেক্ষাকৃত কমতে থাকে। (বুখারি ও মুসলিম; আবু হুরায়রা রা.)

অতএব, যে ব্যক্তি রামাদ্বানের সম্পূর্ণ রোজা রাখবে তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। এ মাসে যারা নামাজ আদায় করার জন্য

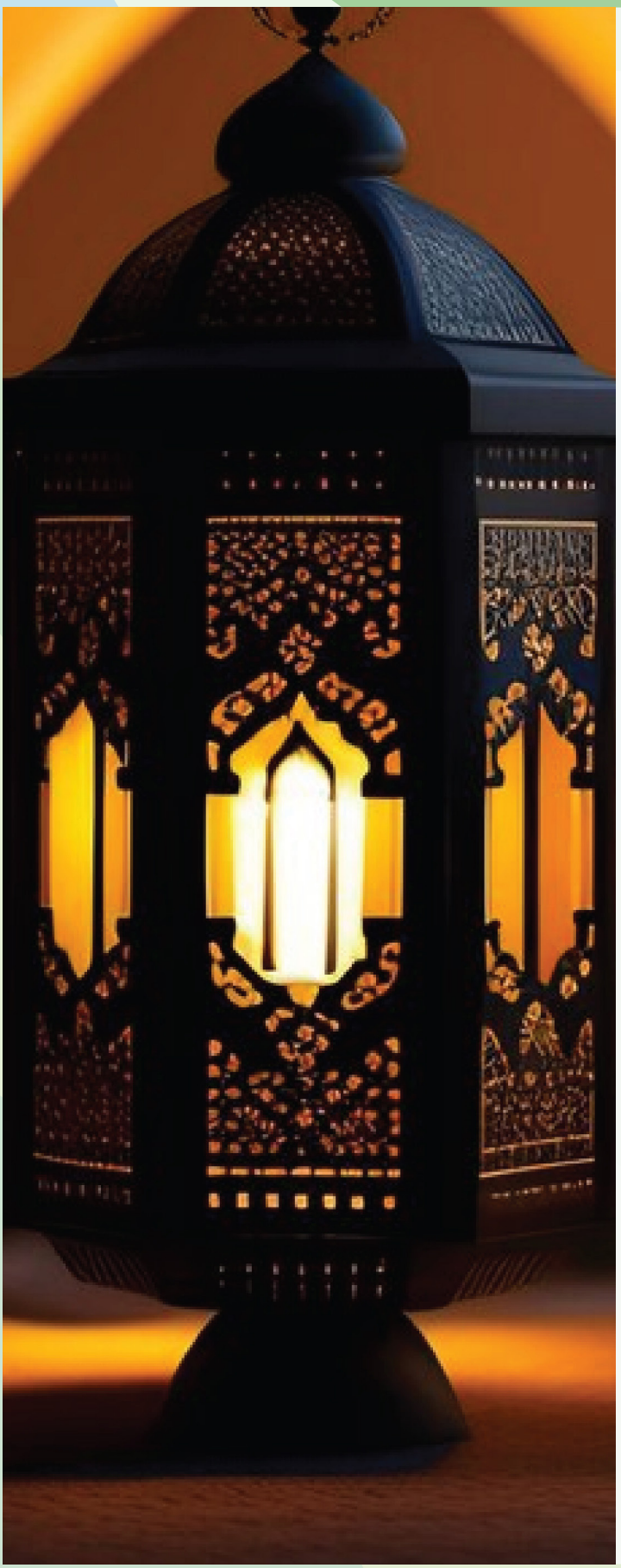

কিয়াম করে, তাদেরও গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। শবে কদরে যে ব্যক্তি কিয়াম করে রাত কাটিয়ে দিবে, তাদেরকেও ক্ষমা করা হবে শুধুমাত্র এ শর্তে যে, আল্লাহর সকল বাণী আর সকল ওয়াদাকে সত্য মনে করবে। নিজের সকল দায়িত্ব বিশ্বস্ততার সাথে পালন করবে এবং সর্বদা সতর্কতার সাথে আত্মসমালোচনার কথাও মনে রাখবে। (মুসলিম, আবু হুরায়রা রা.)

এ মাস নিসন্দেহে অত্যন্ত মর্যাদা ও বরকতের মাস। গতানুগতিকতার স্বাভাবিক প্রবাহে যারা এ মাসটিকে পেয়েছে এর মর্যাদা ও বরকত তাদের জন্য নয়। বৃষ্টি নামলে বিভিন্ন নদী, নালা, ডোবা, পুকুর, নিজ নিজ প্রশস্ততা ও গভীরতা অনুযায়ী বৃষ্টির পানি ধারণ করে। ভূখণ্ডের বিভিন্ন অংশ নিজের উর্বরতা অনুসারে ফসল উৎপাদন করে। অথচ বৃষ্টির পানি ভূখণ্ডের সকল অংশে সমানভাবে বর্ষিত হয়। একটি বড় প্রশস্ত পুকুরে যে পরিমাণ পানি ধারণ করা যায় একটি ছোট কলসীর পক্ষে সে পরিমাণ পানি ধারণ করা সম্ভব নয়। এমনিভাবে যদি বিস্তীর্ণ মরুভূমি বা অনুর্বর জমিতে বৃষ্টির পানি পড়ে, তাতো শুধু প্রবাহিত হয়েই চলে যায়। ভূমি তা থেকে উপকৃত হতে পারে না। কিন্তু উর্বর ভূমিতে বৃষ্টির পানি পড়লেই ফসল জীবন্ত হয়ে উঠে। ঠিক একই অবস্থা মানুষের। রামাদ্বানুল মোবারকের ঐ মজুদ সম্পদ থেকে আপনি কী কিছু পাবেন? উর্বর ভূমির মতো আপনার মন নরম, চক্ষু অবনত করুন, অন্তরে ঈমানের বীজ বপন করুন, নিজের যোগ্যতা ও ধারণক্ষমতা থাকলে বীজ অঙ্কুরিত হবে, সম্পূর্ণ বৃক্ষ হবে। আর বৃক্ষ সৎকাজের ফুল-ফল ও পত্ররাজিতে সুশোভিত হয়ে উঠবে। অতঃপর আপনি সাফল্যের ফসল কেটে ঘরে উঠাবেন। কৃষকের মতো আপনি শ্রম দেবেন, কাজ করবেন, প্রতিদানে জান্নাতের পুরস্কারসমূহের ফসল আপনার জন্য প্রস্তুত হতে থাকবে। যত বেশি শ্রম দেবেন, ততবেশি ফসল পাবেন। পক্ষান্তরে যদি আপনার মন পাথরের মতো শক্ত হয় এবং আপনি অসতর্ক কৃষকের মতো শুয়ে বসে দিন কাটান, তাহলে রোজা, তারাবিহ, রহমত ও বরকতের সমস্ত পানি বয়ে চলে যাবে এবং আপনার তহবিলে কিছুই আসবে না।

প্রকৃত অর্থে আল্লাহর দেওয়া সুযোগ ছাড়া সত্যিই কিছু পাওয়া যায় না। আর এই আল্লাহর দেওয়া সুযোগ শুধু তাদেরই হস্তগত হয়, যারা চেষ্টা-সাধনা এবং পরিশ্রম করে। দেখুন এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কী বলেন? আপনি তাঁর দিকে একহাত অগ্রসর হলে আল্লাহ আপনার দিকে দু'হাত অগ্রসর হবেন। আপনি তাঁর দিকে হেঁটে অগ্রসর হলে তিনি আপনার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হবেন (মুসলিম, আবু জরদ রা.)। কিন্তু পিছন দিক ফিরে, অসচেতন বা বেপরোয়াভাবে আপনি যদি দাঁড়িয়ে থাকেন, তাহলে বলুন, আল্লাহ কীভাবে আপনাকে সুযোগ সৃষ্টি করে দেবেন?

পুরো রামাদ্বান মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাবে, আর আপনার তহবিল শূন্য থেকে যাবে। এমন দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা কেউ সৃষ্টি করবেন না। কিছু করার জন্য এবং নিজের ভাগের রহমত পাওয়ার জন্য কোমর কষে নিন এবং নবি করিম (সা.)-এর এ সতর্কবাণীটিকে ভালোভাবে স্মরণ রাখুন। "অনেক রোজাদার এমন আছেন, যাঁরা নিজেদের রোজা থেকে ক্ষুৎ-পিপাসায় কষ্ট ছাড়া আর কিছুই পান না। অনেকে রাতের নামাজ পড়ে থাকেন, কিন্তু তাঁদের নামাজ রাত্রি জাগরণ ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে না" (দারেমী, আবু হুরায়রা রা.)। নবি করিম (সা.) রামাদ্বানের

প্রবন্ধ

আগমনের পূর্বে নিজের সাথীদেরকে উদ্দেশ্য করে এ মাসের মহত্ত্ব এবং বরকত সম্পর্কে আলোচনা করতেন এবং এ মাসের বরকতের ভাণ্ডার থেকে নিজেদের পরিপূর্ণ অংশ সংগ্রহ করার জন্য ব্যাপক পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার তাগিদ করতেন। নবি করিম (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আজকে আমিও একই বিষয়বস্তুর উপর আলোচনা করবো। অর্থাৎ রামাদ্বান মাসের মহত্ত্ব ও বরকতের গূঢ় রহস্য কী? এ মাস থেকে পরিপূর্ণ কল্যাণ লাভের জন্য কী পরিমাণ সতর্কতা ও প্রস্তুতি প্রয়োজন, কোন কাজগুলোর প্রতি অগ্রাধিকার দিতে হবে? লক্ষ্যপানে পৌঁছার জন্য কোন পথে চলতে হবে এবং চিহ্নিত করতে হবে ভ্রান্ত পথ?

বরকত ও মহত্ত্বের রহস্য

রামাদ্বান মাসের মহত্ত্ব ও বরকতের রহস্য কোন জিনিসটির মধ্যে লুকায়িত আছে সর্বপ্রথম এটা জানা দরকার। কারণ না জেনে সেই ভাণ্ডার থেকে নিজের আঁচল ভরে নেওয়া সম্ভব নয়। এ উদ্দেশ্যের জন্য একাগ্রতা, মনোযোগ, পরিশ্রমের মর্যাদা ও গুরুত্ব অনুধাবন করাও সম্ভব নয়। এ বরকত ও মহত্ত্বের রহস্য শুধুমাত্র একটি জিনিসের মধ্যেই লুকায়িত আছে। আর তা হচ্ছে এই যে, এ মাসে পবিত্র কুরআন মাজিদ নাজিল করা হয়েছে অথবা নাজিল শুরু হয়েছে অথবা সম্পূর্ণ কুরআন মাজিদ লাওহে মাহফুজ থেকে নাজিল করে জিবরাঈল (আ.)-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে অথবা এ মাসে কুরআন নাজিলের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। আসলে এ মাসে মহান দয়াবান পরম করুণাময় প্রভু তাঁর অসীম অনুগ্রহে মানবতাকে পথ প্রদর্শনের সামগ্রী দান করেছেন। তাঁর অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিকমাত মানুষের চিন্তা ও কর্মের সঠিক পথ আলোকিত করেছে। কোনটা সঠিক আর কোনটা ভ্রান্ত তা পরখ করার জন্য ভ্রান্তি, বক্রতা ও বিকৃতিমুক্ত এক কষ্টিপাথর তিনি দান করেছেন। এ ঘটনা এমন এক সময়ে হয়েছে অর্থাৎ রামাদ্বান মাসের এক ভোরের সূর্যোদয়ের পূর্বে মহাপ্রভুর মহান বাণীর প্রথম কিরণ মুহাম্মদ (সা.)-এর অন্তরাত্মাকে আলোকোদ্ভাসিত করেছে। অর্থাৎ রোজা রাখা হয় এবং কুরআনের তেলাওয়াত করা হয় এজন্য রামাদ্বান মাসের শ্রেষ্ঠত্ব বৃদ্ধি পায়নি বরং পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হবার মহান ও তুলনাহীন ঘটনার কারণে এ মাসটি মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান অর্জন করেছে, আর এ কারণেই রোজা রাখা ও অধিক হারে কুরআন তেলাওয়াতের জন্য এ মাসটিকে নির্ধারিত করা হয়েছে। কুরআন নাজিলের এ মহান ঘটনার কারণেই এ রামাদ্বান মাসের দিনকে রোজা রাখা এবং রাতকে কিয়াম ও তেলাওয়াতের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা একথাটি এভাবে এরশাদ করেছেন–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ .

“রামাদ্বান সেই মাস। যে মাসে মানবজাতির পথ প্রদর্শন, পথ প্রদর্শনের উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ এবং ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্যকারী কুরআন নাজিল করা হয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি এ মাসটি পেল সে যেন অবশ্যই রোজা রাখে।” (সুরা আল বাকারা : ১৮৫)

কুরআনের নিয়ামত

পবিত্র কুরআন মাজিদ আল্লাহর দেওয়া নিয়ামাতসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তুলনাহীন নিয়ামাত। তাঁর রহমতসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় রহমত। এর নাজিলের ঘটনা মানবতার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা বড় ঘটনা। এটা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার অসীম রহমতের সাগরে দুনিয়াতে প্রকাশপ্রাপ্ত সবচেয়ে বড় জ্বলোচ্ছ্বাস। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন–

الرحمنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ

অর্থাৎ এ অসীম দয়াবান আল্লাহ কুরআন শিখিয়েছেন। অন্যত্র তিনি বলেন :

تَنْزِيْلُ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمُ

অর্থাৎ এটা নাজিল করা হয়েছে পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালুর পক্ষ থেকে। মানুষের জন্য ন্যায় ও ইনসাফের কোনো পাল্লা যদি থেকে থাকে তা একমাত্র কুরআন। আলোর উৎসধারা যদি থেকে থাকে তবে তা এটাই, ব্যবস্থাপত্র যদি থাকে তাও একমাত্র সেটাই আছে।

এমনিতে তো আমাদের উপর আল্লাহ তায়ালার অসংখ্য নিয়ামাত রয়েছে। আমরা প্রতিটি মুহূর্তে দুই হাতে সেই নিয়ামাত থেকে লুটে নিচ্ছি। কিন্তু এ পৃথিবী এবং পৃথিবীর প্রতিটি নিয়ামাত শুধু ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের জন্য নির্ধারিত যতক্ষণ পর্যন্ত শ্বাস-প্রশ্বাস আসা-যাওয়া করে। শেষ নিঃশ্বাস বের হয়ে যাবার সাথে সাথে জীবনের সকল স্পন্দন শেষ, দুনিয়ার সকল নিয়ামাতও আমাদের জন্য শেষ। যে জিনিসটি স্পন্দনহীন জীবনকে সীমাহীন স্পন্দিত জীবনে রূপান্তরিত করবে, এ অসুস্থ জীবনের দিনগুলোকে শান্তির জীবনে পরিবর্তিত করবে, এ শেষ হয়ে যাওয়া নিয়ামাতসমূহকে চিরস্থায়ী নিয়ামাতে রূপান্তরিত করবে সেটা দুনিয়ার সকল ভাণ্ডারের চেয়ে মূল্যবান ভাণ্ডার। এ কারণেই কুরআন অবতরণের রাতকে মোবারক রাত্রি এবং ‘লাইলাতুল কদর’ বলা হয়েছে। এছাড়া যেখানে যেখানে এর নাজিলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে ঘটনাকে আল্লাহ তায়ালা নিজের রহমত, পুনঃ পুনঃ বিতরণ করা রহমত, নিজের সীমাহীন হিকমাত এবং নিজের অসীম শক্তির সাথে সংযুক্ত করেছেন। আরেক আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে রামাদ্বানের শেষে ঈদ উৎসব পালনের আহ্বান জানানো হয়েছে। কেননা; এ মাসকে কুরআন নাজিলের বর্ষপূর্তির মাস বলা হয়।

يأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ - يونس : ٥٨٥٧

“হে মানবজাতি! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে পথ প্রদর্শন এসে গেছে। এটা সেই জিনিস যা অন্তরের অসুস্থতা নিরাময় করে, যারা এটা গ্রহণ করবে তাদের জন্য পথ প্রদর্শক এবং রহমত হিসেবে কাজ করবে। (হে নবি!) আপনি বলে দিন যে, আল্লাহ অত্যন্ত করুণা ও মেহেরবানি করে এ মহামূল্যবান জিনিস পাঠিয়েছেন, এ কারণেই লোকদের উৎসব করা উচিত মানুষ যা কিছু সংগ্রহ করার কাজে ব্যস্ত, সেসব কিছুর চেয়ে এটা শ্রেষ্ঠ।” (সুরা ইউনুস : ৫৭-৫৮)

আল্লাহর সৃষ্ট সকল মাস-দিন সমান। এগুলোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু কিছু কিছু এমন থাকে যার সাথে সমগ্র মানবতা এবং সমগ্র সৃষ্টিজগতের ভবিষ্যত সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। এটা এমনি এক মুহূর্ত যখন হেরা পর্বতের গুহায় মহান প্রভুর হেদায়াতের সর্বশেষ আলোর কিরণ প্রবেশ করেছে। আর এর ধারক ও বাহক হলেন মানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ (সা.)। এই মহান মুহূর্তটি পবিত্র রামাদ্বান মাসের মধ্যে রয়েছে আর এটা হচ্ছে রামাদ্বান মাসের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের গূঢ় রহস্য।

রামাদ্বানে রোজা ও তারাবিহ কেন?

কুরআন নাজিলের বর্ষপূর্তির মাসে প্রতিদিন রোজা রাখতে এবং প্রতিরাত কয়েক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে কুরআনের তেলাওয়াত শুনতে কেন জোর দেওয়া হলো? যদি আপনারা কুরআন মাজিদের অন্তর্নিহিত নিয়ামাতের অর্থ বুঝতে পারেন এবং যদি একটু মনোযোগ সহকারে ভেবে দেখেন যে, কুরআন মাজিদের ধারক ও বাহক হলে কী কী দায়িত্ব বর্তায়?

কুরআনের মহান আমানত ও এর মিশন চলুন নিয়ামাত যত বেশি মূল্যবান, তার হক আদায় করার দায়িত্বও ততই ভারী। আল্লাহর কিতাব ও তাঁর বাণী সবচেয়ে বড় রহমত ও বরকতের জিনিস। এ কারণেই কুরআন মাজিদ নিজের আঁচলে দায়িত্বের একটা আস্ত পৃথিবী বহন করে। যেহেতু এ কিতাব জীবনের আসল উদ্দেশ্য, জীবনের সাফল্য লাভ ও লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সঠিক পথ প্রদর্শন করে, সেহেতু এর বাহকের প্রতি সেই দায়িত্বসমূহ বর্তায়। এ কিতাব মানুষের সকল গোপন-প্রকাশ্য, ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক ব্যধির ব্যবস্থাপত্র। এ কিতাব গভীর অন্ধকারে হাবুডুবু খাওয়া লোকদের জন্য আলোর মশাল।

> “কিন্তু কিছু কিছু এমন থাকে যার সাথে সমগ্র মানবতা এবং সমগ্র সৃষ্টিজগতের ভবিষ্যত সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। এটা এমনি এক মুহূর্ত যখন হেরা পর্বতের গুহায় মহান প্রভুর হেদায়াতের সর্বশেষ আলোর কিরণ প্রবেশ করেছে। আর এর ধারক ও বাহক হলেন মানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ (সা.)।”

এদিক থেকে দেখলে বুঝতে পারবেন যে, আল্লাহর দেওয়া হেদায়াতের এই মহামূল্যবান উপহার দুটি বড় দায়িত্ব সাথে নিয়ে এসেছে:

এক: বাহক নিজে এর প্রদর্শিত পথে চলবে, এর আলোকে নিজের জীবন চলার পথ অতিক্রম করবে। এর ব্যবস্থাপত্রকে নিজের অসুস্থতার চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করবে। নিজের মন, চিন্তা, কর্ম, চরিত্র ও তৎপরতাকে এর নিজস্ব ছাঁচে ঢেলে সাজানোর প্রচেষ্টায় লেগে যাবে।

দুই: যে হেদায়াত “হুদাল্লিন্নাস” সমগ্র মানব জাতির জন্য, শুধুমাত্র নিজের ব্যক্তি জীবনের জন্য নয়, এ হেদায়াতকে সমস্ত মানুষের নিকট পৌঁছানো, তাদের সামনে এ হেদায়াতকে উন্মুক্ত করা, এর প্রদর্শিত পথে চলার জন্য আহ্বান করা, অন্ধকার পথসমূহকে আলোকিত করা এবং রোগীদের হাতে ঔষধ পৌঁছে দেওয়া।

এবার একটু ভাবুন, দ্বিতীয় দায়িত্বসমূহ প্রথমোক্ত দায়িত্বসমূহেরই অনিবার্য দাবি। আর দ্বিতীয় দফার কাজগুলো ছাড়া প্রথম দফার কাজ পূর্ণাঙ্গভাবে সমাধান হবে না। একদিকে একথা জানতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে যে, কুরআন মাজিদ “হুদাল্লিন্নাস” দাবি করে যে, এটা অপরের নিকট পৌছাতে হবে। বিভ্রান্ত পথিকদেরকে পথ দেখানো সঠিক পথের অনুসারীদের দায়িত্ব। ঠিক এমনিভাবে রোগীদের অধিকার হচ্ছে যাদের নিকট ঔষধ আছে তারা রোগীদের নিকট ঔষধ পৌঁছে দেবে। অপরদিকে অবস্থা হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত একজন লোক অপরকে কুরআনের পথে চালানোর জন্য চেষ্টা সাধনা ও পরিশ্রম না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কুরআনের সঠিক পথে নিজের চলা অপূর্ণাঙ্গ এবং অসমাপ্ত থেকে যাবে।

অতএব অপরকে দীনের দাওয়াত না দিলে স্বয়ং নিজের মনজিলে মকসুদে পৌঁছাটাও ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। কেননা দাওয়াত ও জিহাদ কুরআনি কর্মসূচির অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ কারণে আপনাদের জীবন অন্য মানুষের জীবনের সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত ও সংযুক্ত রয়েছে যে, অন্যেরা এ পথে না চললে আপনাদের একা একা চলা কঠিন হয়ে পড়বে এবং পূর্ণাঙ্গভাবে চলা কঠিনতর হবে।

দেখুন, নবি করিম (সা.)-এর উপর প্রথমে ওহি নাজিল হয়। এতে ‘ইকরা’ অর্থাৎ পাঠ করার হেদায়াত প্রেরিত হয়। পড়ার মধ্যে অন্যকে শুনানোর কাজ নিহিত রয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় বারের ওহির মধ্যে কথা একেবারে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। একটি সংক্ষিপ্ত বিরতির পর এরশাদ হলো, ‘কুম ফাআনজির’ অর্থাৎ ওঠে দাঁড়াও এবং সাবধান করে দাও, ‘ফাকাব্বির’ অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতির সামনে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহত্ত্ব ঘোষণা করো এবং তাদের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত কর। তিনিই সর্বাপেক্ষা মহান, এছাড়া সকল মহত্ত্ব তাঁর সম্মুখে অবনত হবে। এমনকি পৃথিবীতে কেউ আল্লাহর স্থলাভিষিক্ত হয়ে রাজত্ব করতে পারবে না। কেউ নিজেকে নিজের মতামতকে অপরাপর মানুষের উপর চাপিয়ে দিতে পারবে না। আর মানুষের মাথা শুধুমাত্র নিজের মালিক ও স্রষ্টার সম্মুখে অবনত হবে।

একটু দৃষ্টি দিন, মুসলিম উম্মতের শুধু সৃষ্টি এ কারণেই হয়েছে। নতুবা এটা কোনো গোপন কথা নয় যে, যে যুগে কুরআন নাজিল শুরু হয়েছে সে সময় আল্লাহর এমন এমন বান্দাহ পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন, একত্ববাদে বিশ্বাস করতেন, রিসালাতের ধারাবাহিকতা এবং কিতাবের উপর ঈমান রাখতেন, যারা ইবাদাতের স্থানসমূহে রাত ভর দাঁড়িয়ে আল্লাহর ইবাদাত করতেন এবং দিনভর রোজা রাখতেন, আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক এবং তাদের সুন্দর চরিত্র সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নিজেই পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। এরপরও

একটি নতুন রিসালাত, একটি নতুন দাওয়াত এবং একটি উম্মত কেন প্রয়োজন হলো? এর একটি প্রয়োজন এই ছিল যে, ঈমান ও আমলের সকল পথ মানুষের সৃষ্ট সকল বিভ্রান্তি থেকে পবিত্র হয়ে আলোকিত হয়ে থাকে। কিন্তু এর অপর প্রয়োজনটি হলো, এমন একটি উম্মত অস্তিত্ব লাভ করুক, যারা মানুষের সামনে নিজেদের প্রভু এবং তাঁর দীনের সাক্ষ্য হিসেবে দাঁড়াবে, যাতে করে মানুষ ন্যায় ভিত্তির উপর নিজেকে স্থাপিত করতে পারে:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

"এবং এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে করে তোমরা মানুষের সামনে সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়াতে পারো।" (সুরা আল বাকারা : ১৪৩)

এটা কুরআনের মিশন, এটা সেই মিশন যা কুরআন পাওয়া এবং এ আমানতের বাহক হবার ফলে আমার, আপনার এবং কুরআনের উপর ঈমানের দাবিদার সমগ্র উম্মতের মিশন হিসেবে স্বীকৃত।

এ দায়িত্ব কত বড় এবং কত ভারী তার চিত্র তুলে ধরাও অত্যন্ত কঠিন কাজ। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র মানবতাকে সঠিক পথে পরিচালিত করা এক সীমাহীন মহান কাজ। এ অনুভূতির কারণেই হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এ মহান দাওয়াতের প্রথম বাণী প্রাপ্ত হয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় হেরা গুহা থেকে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে পৌঁছান। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এ পবিত্র কুরআনের আমানতকে এক ভারী বক্তব্য বা কাওলে ছাকিল বলেছেন এবং কোমর ভাঙা বোঝা আখ্যায়িত করেছেন। এটা কোনো সহজ কাজ নয়, আবার এমন কঠিনও নয়, যা বহন করা অসম্ভব। যদি তাই হতো পরম দয়ালু করুণাময়, ন্যায় বিচারক, মহাজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালা এ বোঝা মানুষের উপর চাপিয়ে দিতেন না।

অতএব এ বোঝা বহন করার জন্য আমার নিজের মধ্যে এমন একজন মানুষ সৃষ্টি করতে হবে, যে মানুষটি শুধুমাত্র আল্লাহর গোলাম হবে এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না। এ নতুন মানুষটি তৈরি করার জন্য এবং নিজের চর্তুদিকে এমন পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন, শুধুমাত্র আল্লাহর হুকুমে মানুষের মাথানত হবে তাঁর সামনে, কুরআনের উপর ঈমান থাকতে হবে, কুরআনের জ্ঞান থাকতে হবে, সবর ও দৃঢ়তা সৃষ্টি করতে হবে, একই সাথে নিয়মিত আন্দোলন এবং কুরবানিও প্রয়োজন। কুরআনের মিশন অনেক উন্নতমানের চরিত্র দাবি করে। এ মিশন আশা করে যে, মানুষ কুরআনের পতাকা উত্তোলনের সাথে সাথে নিজেদের চিন্তা এবং কর্মতৎপরতাকেও উন্নত করবে। এজন্য শক্তি এবং যোগ্যতা উভয়েরই প্রয়োজন।

এ শক্তি, যোগ্যতা এবং উন্নত চরিত্রের মানদণ্ড হচ্ছে তাকওয়া। আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবের প্রথমেই ঘোষণা করে দিয়েছেন, যারা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে, এ কিতাব থেকে কেবলমাত্র তারাই হেদায়াত পাবে এবং সঠিক পথে চলতে পারবে। "হুদাল্লিল মুত্তাকিন" অর্থাৎ তাকওয়া অর্জনকারীদের জন্য পথ প্রদর্শন। অপরদিকে রোজা রাখার উদ্দেশ্য বা রোজা রাখার ফল সম্পর্কে বলা হয়েছে "লায়াল্লাকুম তাত্তাকুন" অর্থাৎ যাতে করে তোমাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি হয়।

এ দুটি আয়াতকে মিলিয়ে পড়ুন এবং এ ব্যাপারে গভীর মনযোগ দিন। সাথে সাথেই আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন যে, রোজার সাথে পবিত্র কুরআনের এতো সম্পর্ক কেন? এও বুঝতে পারবেন যে, কুরআন নাজিলের বর্ষপূর্তির মাসকে রোজা রাখার জন্য কেন নির্দিষ্ট করা হয়েছে? রোজার মাধ্যমে তাকওয়ার সে গুণ সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে হবে যার মাধ্যমে কুরআন নির্ধারিত পথ চলা সহজ হয়ে যায় এবং কুরআনের আমানতের বোঝা বহন করা সম্ভব হবে। এ কাজের জন্য এ মাসের বরকতপূর্ণ সময়ের চেয়ে আর কোন সময় উপযুক্ত হতে পারে?

তাকওয়া কী?

তাকওয়া অত্যন্ত উঁচুদরের এবং অত্যন্ত মূল্যবান একটি গুণ এবং সকল কাঙ্ক্ষিত গুণের সমষ্টিও বটে। যাঁর মধ্যে তাকওয়ার গুণ রয়েছে তাঁকে আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদে দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত কল্যাণের জামানত দান করেছেন। তাকওয়া এমন একটি জিনিস, যার মাধ্যমে সকল সমস্যা মোকাবিলা করার পথ পাওয়া যায়। তাকওয়ার মাধ্যমে রিযিকের দরজা এমনভাবে উন্মুক্ত হয়, যা কল্পনাও করা যায় না। তাকওয়ার কারণে দীন ও দুনিয়ার সকল কাজ সহজ হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেন এবং মহান পুরস্কার দান করেন। মুত্তাকীনদের জন্য এমন জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, যার প্রশস্ততার মধ্যে সমগ্র পৃথিবী ঢুকে যাবে। তাদের সাথে সেই মাগফিরাতের ওয়াদা করা হয়েছে যা মানুষকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। জান্নাত তাদের উত্তরাধিকার, দুনিয়াতেও আসমান ও যমীনের সকল বরকতের দুয়ার খুলে দেওয়ার ওয়াদা তাঁদের সাথে করা হয়েছে যাঁরা ঈমান ও তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত।

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَٰتٍ مِّنَ السَّمَاءِ

যদি লোকালয়ের লোকেরা ঈমান গ্রহণ করে আর তাকওয়া অবলম্বন করে, তাহলে আমরা তাদের জন্য আসমান ও যমীনের সমস্ত বরকত সমূহের দরজা খুলে দেবো। (সুরা আল আরাফ : ৯৬)

তাকওয়া কী? গুছিয়ে যদি বলা যায় তাহলে বলতে হয়, অন্তর ও রুহ, জ্ঞান ও সচেতনতা, আগ্রহ ও ইচ্ছা, সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, আমল ও কর্মতৎপরতার সেই শক্তি এবং যোগ্যতার নাম, যার প্রভাব বলয়ে আমরা সে কাজ থেকে বিরত হয়ে যাই, যাকে আমরা ভুল বলে মনে করি ও সাব্যস্ত করি এবং নিজের জন্য ক্ষতিকর মনে করি। পক্ষান্তরে আমরা সে কাজের উপর দৃঢ় হয়ে যাই যাকে আমরা সঠিক মনে করি এবং সাব্যস্ত করি। তাকওয়ার আভিধানিক অর্থ নিরাপদে থাকা। আমি আপনাদের সামনে যা আলোচনা করলাম তাতে উল্লেখিত অর্থসমূহের মধ্যে তাকওয়া শব্দটি একেবারে মৌলিক ও প্রাথমিক অর্থবোধক শব্দ। কোনো ধরনের ক্ষতি এবং আঘাত থেকে রক্ষা পাওয়ার শক্তি আমাদের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবেই আছে। লাভের প্রতি লোভ এবং লাভের সন্ধানে চলতে থাকার আগ্রহ না থাকলে মানুষের বেঁচে থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়বে। এ না হলে মানুষের উন্নতিও সম্ভব নয়। জ্বলন্ত আগুনে আমরা হাত দেই না, বরঞ্চ আমাদের হাত জ্বলন্ত আগুনের কাছ থেকে আপনা-আপনি দ্রুত ফেরত চলে আসে। আমাদের শিশু অজ্ঞতাবশত আগুনের নিকটে গেলেই তাকে উদ্ধার করে জড়িয়ে ধরার জন্য অস্থির হয়ে পড়ি, কিন্তু কেন? কেননা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, আগুনে আমাদের হাত পুড়ে যাবে, আগুনের নিকটবর্তী হলে আমাদের শিশু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। এটা পার্থিব আগুন সম্পর্কে আমাদের তাকওয়া, এই আগুনের ক্ষতি সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে, এটা আমাদের চোখের সামনেরই ঘটনা। এছাড়া আরেক প্রকার আগুন রয়েছে। এ আগুন ঈমান, আমল, চিন্তা ও চরিত্রের বিপর্যয়ে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। সে আগুনে পড়া এবং জ্বলা কি সম্ভব? কোন পথে

চললে এ পার্থিব আগুন এবং পরকালের আগুন থেকে বাঁচা যাবে? একথাই কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে। সে সতর্ক করছে ঐ পথগুলোর নিকটেও যেও না। ঐ আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর। একগুয়েমী, যুলুম, মিথ্যা, হারাম মাল, হক অস্বীকার করা, এই সবকিছুই আগুন।

এ আগুন আমরা চোখে দেখতে পারি না, এ ব্যাপারে আমাদের বাস্তব কোনো অভিজ্ঞতা নেই। এ আগুনে হাত দিয়ে আমরা জ্বলার কষ্ট সাথে সাথেই উপলব্ধি করতে পারি না। পার্থিব আগুন আমরা দেখতে পাই বলে এর ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবার চেষ্টা করি। এর মধ্যে পুড়ে গেলে সাথে সাথেই এবং এক্ষুণি জ্বালা অনুভব করি। এর ক্ষতি সম্পর্কে আমাদের পুরোপুরি দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। যদি ঠিক এমনিভাবে একথার উপর আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায় যে, মিথ্যা বলার সাথে সাথে জিহ্বা আগুনে জ্বলে, হারাম খেলে পেট আগুনের অঙ্গারে পূর্ণ হতে থাকে, অথবা হারাম পথে চললে আগুনের বিছানা এবং আগুনের খাওয়া-দাওয়া তৈরি হতে থাকে, তাহলে অবশ্যই আমাদের দেহ-মন জীবনে সেই শক্তি, যোগ্যতা সৃষ্টি হবে যা আমাদেরকে উল্লেখিত কাজগুলো থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হবে।

এটা আল্লাহ এবং তাঁর আগুন সম্পর্কে তাকওয়া, এ তাকওয়ার প্রথম দৃষ্টি হচ্ছে অদৃশ্যে বিশ্বাস, "আল্লাজিনা ইউমিনুনা বিল গাইব" কুরআন থেকে হেদায়াত পাওয়ার জন্য যোগ্য মুত্তাকীগণ গায়েবের প্রতি অর্থাৎ অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস রাখে। আজকের ঈমানের ত্রুটি এবং খারাপ কাজ আগামী কালের আগুন, যদিও আজকে আমরা তা দেখতে পাই না, এ অদৃশ্য কথার উপর দৃঢ় বিশ্বাসই তাকওয়া সৃষ্টি করে। এ দৃঢ় বিশ্বাস সেই শক্তির জন্ম দেয়, কুরআনের পথে চলার জন্য যার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, এর মাধ্যমে চলার পথের সবচেয়ে দরকারী সম্বল তাকওয়া সংগৃহিত হয়।

তাকওয়ার উল্লেখিত হাকীকত সামনে রেখে একটু চিন্তা করুন, আপনারা সাথে সাথেই বুঝতে পারবেন যে, তাকওয়ার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন চারিত্রিক সৌন্দর্য, কাজের মধ্যে ভুল ও শুদ্ধ, হক ও বাতিলের স্থায়ী বিধান এবং মানদণ্ড নির্ণয় করা এবং পাশাপাশি এর অনুসরণ করা। যারা বলে আকীদা ও চরিত্রের মধ্যে ভুল ও শুদ্ধের কোনো সুনির্দিষ্ট অস্তিত্ব, বিধান বা মানদণ্ড নেই, এগুলো অপ্রয়োজনীয় বিষয়, এটা তো যুগ ও অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়, অথবা ব্যক্তি ঈমানদার হোক বা বেঈমান হোক এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তাদের জন্য তাকওয়ার প্রশ্নই উত্থাপিত হতে পারে না।

আমরা আল্লাহ তায়ালাকে আমাদের প্রভু হিসেবে স্বীকার করি। এর অর্থ হচ্ছে ন্যায় ও সঠিক শুধু সেটাই যার মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। যা কিছু তাঁর নির্দেশ, যা কিছু করার জ্ঞান তিনি দান করেছেন, তাঁর অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করে এমন প্রতিটি জিনিস, তাঁর গজবে ইন্ধন যোগায় এমন প্রতিটি কাজ, যে কাজ করলে তাঁর আদেশ লঙ্ঘিত হয়, সেসব কিছুই ভুল এবং পরিত্যাজ্য, সেটা ক্ষতিকর এবং লোকসানের পথ। এসব থেকে আত্মরক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি।

আল্লাহ তায়ালাকে প্রভু হিসেবে স্বীকার করার অর্থ এও হয় যে, প্রকৃতিতে কিছু বস্তু এমনও আছে যা বাস্তবের চৌহদ্দীর বাইরে। যার দেহ বা জীবন নেই, যা ক্ষুধা ও পিপাসা থেকে মুক্ত, যা উপস্থিত কামনা পূরণের স্বাদের চেয়েও অধিক মূল্যবান।

ভুল-শুদ্ধের জ্ঞান শুধু তিনি দিতে পারেন এবং ঐ বাস্তবতার জ্ঞানও শুধু তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া যেতে পারে, যাঁর নিকট দৃশ্য-অদৃশ্য উভয় জ্ঞানই রয়েছে এবং যাঁর ইচ্ছাই শুদ্ধ-অশুদ্ধের কষ্টিপাথর।

মোত্তাকী তাঁরা হতে পারেন যাঁরা এই অদৃশ্য নির্দেশাবলীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন। একথাগুলোকে মেনে নেন, তাঁদের জন্য একটিই পথ আছে, অর্থাৎ তাঁরা নিজেদের তন-মন-ধন সবকিছু পরিপূর্ণভাবে নিজেদের প্রভুর নিকট সমর্পণ করবেন। তাঁদের ওঠা-বসা, চলা-ফিরা, বলা-শোয়া, সবকিছু আল্লাহর বন্দেগীর জন্য ওয়াক্ত হয়ে যায়। যা কিছু তারা দিয়েছে সেটা সম্পদ হোক বা সময়, বস্তু হোক বা আত্মীক কিছু হোক, তাঁরই পথে লাগিয়ে দিবে এবং এ প্রয়োজনেই খরচ করে দেয়, পুরো জীবনটাই এ চিন্তায় অতিবাহিত করে যে, আগামীকাল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হবে। আর সে সময়ের সাফল্যই আসল সাফল্য।

এটাই তাকওয়ার সেই সূত্র যা আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদের শুরুতেই সুরায়ে বাকারায় বলে দিয়েছেন অদৃশ্যে বিশ্বাস, নামাযের মাধ্যমে দেহ-মনের ইবাদাত, তাঁর দেওয়া সম্পদ থেকে তাঁর পথে ব্যয় করা, ন্যায়- অন্যায়ের পার্থক্যের জন্য ওহিকে কষ্টিপাথর হিসেবে বিশ্বাস করা, এবং আখেরাতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা।

যারা আল্লাহকে নিজেদের প্রভু বলে স্বীকার করে অথচ নিজেদের দেহ-মনের শক্তিকে, নিজেদের সময় ও সম্পদকে আল্লাহর অপছন্দনীয় পথে লাগায় এবং যে কাজে আল্লাহর অসন্তুষ্টির আগুন জ্বলে ওঠে সে কাজ থেকে বিরত হয় না, তারা তাকওয়া থেকে বঞ্চিত। তাকওয়া শুধু প্রকাশ্য কাজের অনুসরণের নাম নয়, এটা মনের গভীরে রক্ষিত শক্তি ও দৃঢ় বিশ্বাসের নাম। এ কারণেই রাসুলে করিম (সা.) একদিন নিজের পবিত্র কলবের দিকে তিন তিনবার ইঙ্গিত করে বললেন, তাকওয়া তো এখানে থাকে। (মুসলিম, আবু হোরায়রা রা.)

তাকওয়া ও রোজা

তাকওয়ার উল্লেখিত তাৎপর্য মনে রাখলে একথা বুঝা কঠিন হবে না যে, তাকওয়া সৃষ্টি করার জন্য রোজা, কিয়ামে লাইল এবং কুরআন তেলাওয়াতের চেয়ে অধিক কার্যকর কর্মসূচি তৈরি করা অত্যন্ত কঠিন, আর এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য পবিত্র রামাদ্বান মাসই সবচেয়ে মোক্ষম মাস। রোজা ও রাতে দাঁড়িয়ে কুরআন তেলাওয়াত উভয় কাজকে রামাদ্বান মাসে একত্রিত করে আল্লাহ তায়ালা প্রকৃতপক্ষে এ তাকওয়া অর্জনের পথ আমাদের জন্য খুলে দিয়েছেন।

আমরা রোজা রাখলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্ষুধা-পিপাসাসহ শরীরের অপরাপর বৈধ চাহিদাও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় পূরণ করা থেকে বিরত থাকি। তাঁর কাছ থেকে বিনিময় ও পুরস্কার পাবার জন্য নিজেদের বৈধ চাহিদাগুলোকেও কুরবান করে দেই। রাত এলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর কালাম শ্রবণ করি, আর সারা মাসে কমপক্ষে একবার পুরো কিতাবের তেলাওয়াত শুনে নেই। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, ভাষা না জানার কারণে এবং পরিশ্রম না করার কারণে আমাদের পাল্লায় কিছুই পড়ে না, কেননা আল্লাহ আমাদেরকে কি বললেন আর আমরা কি শুনলাম কিছুই বুঝা গেল না। কিন্তু আল্লাহর উদ্দেশ্য একেবারে সুস্পষ্ট, তিনি চান এ মাসের মধ্যে আমরা একবার পুরো হেদায়াত গ্রন্থ থেকে আলোকিত হই, যা তিনি কুরআন মাজিদের মাধ্যমে আমাদেরকে দান করেছেন। যার উপর আমল করা এবং যার দিকে অন্যদেরকে আহ্বান করা আমাদের প্রথম কর্তব্য। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে জ্ঞান ও ঈমান লাভ হয় এবং রোজার মাধ্যমে আমলের শক্তি অর্জিত হয়।

রোজার মধ্যে আল্লাহর হুকুম হলে আমরা খাই, তাঁর হুকুমে আমরা

বিরত হয়ে যাই। অথচ খাওয়াও হারাম নয়, পান করাও হারাম নয়। কিন্তু রোজার মধ্যে আমরা এই মৌলিক প্রয়োজনগুলোকেও আল্লাহর আনুগত্যের কারণে আমাদের উপর হারাম বানিয়ে নেই। যা অন্য সময় পূরণ করা শুধু বৈধই নয় বরং কর্তব্যও বটে। এর মাধ্যমে আমরা এমন শক্তি অর্জন করি, যে শক্তির ফলে আমরা প্রয়োজন যতই কঠিন হউক না কেন এবং তা যতই সঠিক ও বৈধ মনে হউক না কেন আল্লাহ নিষেধ করেছেন, তাই আমরা সকল কাজ থেকে বিরত হয়ে যাই। আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল (সা.) যে সমস্ত গূঢ় সত্যের সন্ধান দিয়েছেন, রোজার মাধ্যমে সেগুলোর প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তি আরো সুদৃঢ় হয়। সে সত্যগুলো বস্তু নয় সেগুলো ধরাছোয়াও যায় না। ক্ষুধা-পিপাসা এবং জৈবিক চাহিদার মতো অতিপ্রয়োজনীয় বাস্তবতার চেয়েও সেই সত্যগুলো অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আমরা শুধুমাত্র খাবার জন্য বেঁচে থাকি না। উন্নত নৈতিকতা জীবনের জন্য অপরিহার্য এক্ষুণি যে চাহিদা পূরণ করা দরকার, যার স্বাদ আজ উপভোগ করা যায়, এমন পার্থিব বাসনাসমূহকে কুরবানি করার মাধ্যমে রোজা আমাদের জীবনে উন্নতর আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক শক্তি সৃষ্টি করে।

রোজা একথা আরো সুদৃঢ় করে দেয় যে, মূল বিষয় হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য। কোনো বিষয়ের সঠিক হওয়া বা ভুল হওয়ার শেষ সনদ হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ। নেকী ও সওয়াব খাওয়া-দাওয়া বা উপবাস থাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, জেগে থাকার মধ্যেও নয়, ঘুমিয়ে থাকার মধ্যেও নয়।

শুধুমাত্র আল্লাহর আনুগত্য আর নির্দেশ মানার মধ্যেই রয়েছে নেকি ও সওয়াব। রাত্রিতে দাঁড়ানোর মাধ্যমেও একই ধরনের শক্তি অর্জিত হয়। এ শক্তিসমূহ যখন এবং যতটুকু সৃষ্টি হয় তখন এবং ঠিক ততটুকুই আমরা ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে পুরো জাতি কুরআনের আমানতের বোঝা বহন করার যোগ্য হতে পারি। কেননা, বস্তুগত, নিত্যপ্রয়োজনীয় ও উপভোগ্য সামগ্রীর চাহিদাকে পদদলিত করে নিজেদের জীবনোদ্দেশ্য এবং কুরআনের দায়িত্ব ও মিশনের পূর্ণতাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি হতে পারে। এ যোগ্যতারই অপর নাম তাকওয়া।

বিষয়টিকে অপর একটি দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখুন। দৃশ্যত রোজার কোনো চেহারা বা অবয়ব নেই। নফস ও পেটের গভীরে উত্থিত ক্ষুধা, পিপাসা এবং যৌন চাহিদাকে অন্য কেউ দেখতে পারে না এবং অনুভব করতেও পারে না অথবা কেউ এ অনুভূতিতে অংশীদারও হতে পারে না। এ চাহিদাগুলোকে কুরবান করারও দৃশ্যত কোনো কাঠামো নেই। অতএব, এ চাহিদাগুলোকে ত্যাগ করার বিষয়টি কোনো সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড দিয়ে মাপা যাবে না। রোজা তো শুধু প্রভুর উপস্থিতির সুদৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তা এটাকেই মজবুত করে। এটাই এর জীবন। আল্লাহ সবসময় সাথে আছেন, যেখানেই থাকুন না কেন তিনি সর্বত্র উপস্থিত থাকেন। দু'ব্যক্তি এক স্থানে থাকলে সেখানে তৃতীয় জন থাকেন আল্লাহ। কেউ একা থাকলে দ্বিতীয় জন থাকেন তিনি। তিনি শাহরগের চেয়েও বেশি নিকটে। এটা সেই ঈমান, প্রতিটি মুহূর্ত নিজের প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত থাকার ঈমান, যা রোজার প্রকৃত ফল। এ জন্য হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে যে, রোজা শুধু আমার জন্য, তাই একমাত্র আমিই এর বিনিময় দিব। (বুখারি ও মুসলিম, আবু হুরায়রা রা.)

তাকওয়া ঈমানের এ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ঈমান থেকেই তাকওয়া খাদ্য গ্রহণ করে। এর উপরই দৃঢ়তা লাভ করে। আর এ পরিবেশেই ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়।

শেষে এবার আপনাদেরকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাই। বেহিসেব লাভবান হবার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্র ব্যবহার থেকে বিরত করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে শয়তান নতুন প্রচেষ্টা শুরু করে। যাতে করে অন্ততপক্ষে সীমাহীন লাভটাকে কমিয়ে সীমিত করে দেওয়া যায়। যেন আমরা সাগরের মধ্য থেকে কয়েক ফোটা পানি সংগ্রহ করেই সন্তুষ্ট হয়ে যাই।

রোজা আর কেয়ামে লাইলের মাধ্যমে সেই তাকওয়াও অর্জিত হতে পারে যা আপনারা দেখেছেন এবং এর দ্বারা এমন তাকওয়া অর্জিত হতে পারে, যার মাধ্যম্যে কিছু ছোট নেকীর কাজ করে আমাদেরকে সন্তুষ্ট করে দিতে পারে। এতে মোস্তাহাবের চিন্তা নফলের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়ে করা হয়। নফলের চিন্তা সুন্নাত থেকে বেশি করা হয়, সুন্নাতের গুরুত্ব ফরজের চেয়ে বেশি করা হয়।

কিন্তু আল্লাহ তায়ালা পবিত্র রামাদ্বান মাসে রোজা ফরজ করে যে তাকওয়া অর্জন করার শিক্ষা দিয়েছেন তা এর চেয়ে অনেক বড় জিনিস। এটা সেই তাকওয়া যার মাধ্যমে আমরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং সামষ্টিক পর্যায়ে এ রমযানে নাজিল হওয়া কুরআন মাজিদের মিশনকে পূর্ণ করার এবং এর হক আদায়কারী উত্তরসূরী হতে পারি। একথা এ জন্য জানা দরকার যে, এমনটি হয়েছে এবং হতে থাকে যে, রোজাদার রোজা রাখতে থাকে। রাত্রি জাগরণকারী রাত্রি জেগে থাকে। কিন্তু এক কদমও সেই পথে অগ্রসর হয় না, যে পথে রামাদ্বানের রোজা এবং তেলাওয়াতে কুরআন মাজিদ তাদেরকে নিয়ে যেতে চায়। অথচ ভালো কাজের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ ফরযের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফরয এবং লাভের দিক থেকে সবচেয়ে অধিক লাভ বহনকারী কাজ তো এটাই যে, আমরা কুরআনের হক আদায় করার জন্য এবং আল্লাহর অপরাপর বান্দাহদেরকে কুরআন প্রদর্শিত পথে পরিচালিত করার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত এবং বাস্তবে কিছু না কিছু কাজ অবশ্যই করবো।

এ ফরজকে আদায় করার চিন্তা আমরা শুধু তখন করতে পারি, যখন আমরা কুরআন মাজিদ, রামাদ্বানের রোজা এবং তাকওয়ার পারস্পরিক সম্পর্ককে ভালোভাবে বুঝতে পারবো। এ পর্যন্তকার আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য এটাই ছিল। আমাদেরকে এটা ভালোভাবে মনে রাখতে হবে যে, রামাদ্বান মাসে শুধুমাত্র আল্লাহর কালাম নাজিল হবার কারণেই এ মাসে রোজা রাখা ফরজ করা হয়েছে। এ মাসের সমস্ত বরকত, মহত্ত্ব শুধুমাত্র এই কারণে যে, এ মাসে আল্লাহ তার বান্দাহদেরকে পথ নির্দেশনার ইচ্ছা পোষণ করেছেন এবং নিজের মহত করুণায় নিজের পথনির্দেশনার শেষ বাণীটুকু নিজের শেষ নবি (সা.)-এর মাধ্যমে বিশ্ববাসীর নিকট হস্তান্তর করেছেন। এ মাসে রোজা ফরজ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমরা নিজেদের মধ্যে সেই তাকওয়া সৃষ্টি করি, যার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার দেওয়া পথনির্দেশকে কিতাবের হক আদায় করার শক্তি ও যোগ্যতা অর্জিত হয়।

(লেখাটি জনাব খুররম মুরাদ–এর 'খোশ আমদেদ মাহে রমযান' বই থেকে সগৃহীত। অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন জনাব সাইয়্যেদ রাফে সামনান।)

আসুন পবিত্র মাহে রামাদ্বানের

বরকতে সিক্ত হই

হামিদ হোসাইন আজাদ

আলহামদুলিল্লাহ, রহমত, বরকত, মাগফিরাতের মহিমায় উজ্জীবিত পবিত্র মাহে রামাদ্বান আমাদের দারপ্রান্তে সমুপস্থিত। এরই মধ্যে আমরা রামাদ্বান মাসের বরকতের সুগন্ধ আমাদের পানে এগিয়ে আসছে। বিশ্বাসী বান্দারা আনন্দিত ও উদ্বেলিত, কেননা অফুরন্ত নিয়ামত আর ক্ষমার বার্তা নিয়ে রামাদ্বান খুব জলদি আমাদের মাঝে আসতে যাচ্ছে। রামাদ্বান হলো সেই পবিত্রতম মাস– যা শান্তি, প্রশান্তি, স্বস্তি, সুসংবাদ এবং সব ধরনের কল্যাণ ও ইতিবাচকতায় পরিপূর্ণ। রাসুল (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ তায়ালা রামাদ্বান মাসে জান্নাতের সবগুলো দরজা খুলে দেন, জাহান্নামের সবগুলো দরোজা বন্ধ রাখেন এবং শয়তানকে শিকলবন্দী করে রাখেন" (বুখারি)। তাই পবিত্র এ মাসের শুরু থেকেই আমাদের উচ্ছ্বসিত ও আনন্দিত থাকা উচিত। এ মাসের প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগিয়ে এ মাসের সর্বোচ্চ পরিমাণ ফায়দা হাসিলেও আমাদের সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন।

রামাদ্বান মাসের প্রস্তুতি :

প্রখ্যাত সাহাবি হজরত আনাস বিন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। রামাদ্বান মাসের দু'মাস পূর্বে যখন রজব মাস উপনিত হতো তখন থেকেই রাসুল (সা.) নিম্নোক্ত দুয়াটি পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانْ

"হে আল্লাহ, আপনি আমাদের জন্য রজব ও শাবান মাসে বরকত দিন এবং আমাদের রমজান পর্যন্ত পৌঁছে দিন। (নাসাঈ : ৬৫৯)

এর অর্থ হলো, রামাদ্বানের প্রস্তুতি নেয়ার জন্যই রজব ও শাবান এ দুটো মাস আমাদের সামনে হাজির হয়। আল্লাহর মাস (রামাদ্বান) উপস্থিত হয় রহমত, বরকত ও নাজাতের বার্তা নিয়ে। আল্লাহ তায়ালা এ মাসটিকে সকল মাসের সেরা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এ মাসের প্রতিটি দিন বছরের অন্যান্য দিনগুলোর তুলনায় সেরা, প্রতিটি রাত অন্য সময়ের রাতের তুলনায় উত্তম আর রামাদ্বান মাসের প্রতিটি ঘণ্টা অন্য সব ঘণ্টার মধ্যে সর্বোত্তম।

রামাদ্বান মাস হলো কুরআনের মাস। এ মাসে আল্লাহ তায়ালা কুরআন নাজিলের প্রক্রিয়া শুরু করেন। আল কুরআনের মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় বান্দাদের সফলতার বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। আল্লাহ তায়ালা এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْٓ اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَ بَیِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰی وَالْفُرْقَانْۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ

রামাদ্বান মাসই হল সে মাস, যাতে নাজিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসে রোজা রাখবে।" (সুরা বাকারা : ১৮৫)

এ কারণে, এই পবিত্র মাসে আমাদের সকলেরই কুরআনের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের প্রচেষ্টা থাকা উচিত। আমরা যেন কুরআন তেলাওয়াত ও অনুধাবন করার মধ্য দিয়ে উপকৃত হতে পারি এবং একইসাথে, সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য নিরুপণ করার মতো প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারি। আমিন।

রামাদ্বান মাসে উপবাসের গুরুত্ব অনুধাবন করা :

আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, রামাদ্বান মাসের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো তাকওয়া অর্জন করা। রামাদ্বান মাস তাকওয়া উন্নত ও সমৃদ্ধ করার সুবর্ণ সুযোগ। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَۙ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন

ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার। (সুরা বাকারা : ১৮৩)

রামাদ্বান মাসের সর্বোত্তম ফায়দা হাসিলের উপায়গুলো জানা :

আমাদের প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মাদ (সা.) রামাদ্বান মাসের পূর্ববর্তী খুতবায় বলতেন– "আসন্ন মাসের সর্বোচ্চ ফায়দা যদি তোমরা হাসিল করতে চাও, মনে রাখবে, তোমাদের শরীর, মন ও নিয়তকে পরিশুদ্ধ ও সমৃদ্ধ করার এটিই উত্তম সময়। এমনটা করতে হলে, তোমাদেরকে নিজেদের উপবাস, ইবাদত এবং অভ্যাসকেস শৃঙ্খলার ভেতর আনতে হবে। নিজেকে আধ্যাত্মিক ও শারীরিকভাবে রামাদ্বানের জন্য প্রস্তুত করতে চেষ্টা করো। ব্যক্তিগত উন্নয়ন ঘটানোর নিয়ত কর।

রামাদ্বান এমন একটি মাস যে মাসে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বেশি বেশি ইবাদত ও রোজা পালন করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমরা যে নিঃশ্বাস নেই তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত। তোমার ঘুমও ইবাদত। এ মাসে তোমাদের নেক আমলগুলো কবুল করা হবে এবং দুয়াগুলোর প্রতিদান মিলবে।"

এ কারণে আমাদের সবারই আন্তরিকভাবে এবং পাপমুক্ত মনে আল্লাহর কাছে দুয়া করা উচিত যাতে তিনি আমাদেরকে রোজা পালনে এবং কুরআন তেলাওয়াতে সহায়তা করেন। সেই দুর্ভাগা যে এ মাসটি চলে যায় কিন্তু আল্লাহর ক্ষমা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়।

জিকির : আল্লাহ তায়ালা তাঁকে স্মরণ করার বিষয়ে যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং তাঁর কাছে যেভাবে ক্ষমা চাইতে বলেছেন সেগুলো স্মরণ করুন।

وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَٰفِلِينَ

আর স্মরণ করতে থাক নিজের রবকে আপন মনে ক্রন্দনরত, ভয়ে এবং বিনম্র অবস্থায় এবং এমন স্বরে যা চিৎকার করে বলা অপেক্ষা কম; সকালে ও সন্ধ্যায়। আর বেখবর থেকো না। (সুরা আরাফ : ২০৫)

এই আয়াতে খুবই চমৎকারভাবে জিকিরের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। যেমন :

- আপন মনে : আমাদের নিয়ত থেকে এবং রূহ থেকে
- বিনম্র অবস্থায় : অর্থাৎ বিনয়ী ও মার্জিতভাবে
- ভয়ে : জিকিরটি যেন সঠিকভাবে হয় সেই ভয়ে থাকা
- এমন স্বরে যা চিৎকার করে বলার তুলনায় কম : শান্তভাবে। যাতে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।
- সকাল-সন্ধায় : উত্তম সময়।
- বেখবর ও অসচেতন থেকো না : জিকির এবং এর ফজিলত সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন হোন।

إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْقَٰنِتِينَ وَٱلْقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلْخَٰشِعِينَ وَٱلْخَٰشِعَٰتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّآئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ وَٱلْحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ ۙ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

নিশ্চয়ই মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী, বিনয়ী পুরুষ, বিনয়ী নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোজা পালনকারী পুরুষ, রোজা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী নারী, আল্লাহর অধিক জিকিরকারী পুরুষ ও যিকরকারী নারী-তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। (৩৩ : ৩৫)

অপরকে সহায়তা করা :

রামাদ্বান মাস আসার পূর্বে খুতবাগুলোতে রাসুল (সা.) বলতেন–

"রোজা রাখার সময় শেষ বিচারের দিনের ক্ষুধা ও পিপাসার কথা স্মরণ করবে। দরিদ্র ও অসহায় মানুষের জন্য দান-সদাকা বাড়িয়ে দেবে। বড়োদের সম্মান করবে। ছোটদের জন্য সহানুভূতি লালন করবে। আত্মীয় ও প্রতিবেশিদের জন্য দয়ালু হবে। অসংলগ্ন ও অশ্লীল কথা বার্তা থেকে নিজের জিহবাকে সংযত রাখবে। হারাম জিনিস দেখা থেকে চোখকে বিরত রাখবে। কানগুলোকেও এমন শব্দ শোনা থেকে হেফাজতে রাখবে যেগুলো শোনা উচিত নয়। এতিমদের প্রতি দরদি থাকবে যাতে আপনার সন্তানেরাও কখনো এতিম হয়ে গেলে তারাও অপরের ভালোবাসা ও দয়া পায়।"

- মুত্তাকী হওয়ার মাপকাঠির বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশনা স্মরণে রাখুন : আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ

"সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিমদিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎকাজ হল এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর কেয়ামত দিবসের ওপর, ফেরেশতাদের ওপর এবং সমস্ত নবী-রাসুলগণের ওপর, আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম-মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে। আর যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, জাকাত দান করে এবং যারা নিজেদের দেয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য ধারণকারী তারাই হল সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই পরহেযগার।" (কুরআন ২ : ১৭৭)

- **তাওবাহ হলো ক্ষমা পাওয়ার দরজা :**

আমাদের প্রিয় রাসুল (সা.) বলেছেন, "তোমরা নিজেদের পাপের জন্য আল্লাহর কাছে তাওবাহ করো এবং নামাজের সময় দু'হাত তুলে আল্লাহর কাছে দুয়া করো কারণ এটিই দুয়া করার উত্তম সময়। এ সময়টাতেই আল্লাহ তাঁর বান্দার দিকে করুণাভরে দৃষ্টি দেন। যদি বান্দা দুয়া করে তাহলে আল্লাহ তা কবুল করেন, যদি তারা ডাকে আল্লাহ তাতে সাড়া দেন, বান্দা যদি কিছু চায় আল্লাহ তা দিয়ে দেন এবং যদি তারা কিছু কামনা করে তাহলে তা কবুল করেন। এক্ষেত্রে যারা তাওবাহ করে তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা যে সুসংবাদ দিয়েছেন, তা স্মরণে রাখবে:

إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَٰلِحًا فَأُو۟لَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَٰتٍ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٧٠

কিন্তু যারা তওবা করে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গুনাহকে নেকি দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সুরা ফুরকান : ৭০)

■ রাসুল (সা.) উম্মাহকে রামাদ্বান মাসের পূর্ণ ফায়দা হাসিল করার তাগিদ দিয়েছেন এবং এ সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন : "হে মানবসকল, তোমরা তোমাদের বিবেককে নিজেদের ইচ্ছার দাস বানিয়ে নিয়েছ। আল্লাহর কাছে ক্ষমা কামনা করে এই প্রবণতা থেকে নিজেকে মুক্ত করো। পাপের ভারী বোঝার কারণে তোমাদের পিঠ ভেঙে যেতে পারে, তাই দীর্ঘ সময় আল্লাহকে সিজদা করে এ বোঝা হালকা করে নাও। অনুধাবন করো যে, মহামহিম আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, যারা নামাজ ও সিজদা করে তারা বিচারের দিন জাহান্নামের আগুন থেকে সুরক্ষিত থাকবে।

হে মানবগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোনো মুমিনের জন্য ইফতারের আয়োজন করে, আল্লাহ তাকে এমন প্রতিদান দেবেন যেন সে একজন দাসকে মুক্ত করেছে এবং আল্লাহ তার গুনাহও মাফ করে দেবেন।" একজন সাহাবি বললেন, কিন্তু আমাদের সকলের তো অপরকে ইফতার করানোর সামর্থ্য নেই। নবিজি (সা.) এর প্রতিক্রিয়ায় বললেন, "যদি আর কিছুই না থাকে তাহলে অন্তত অর্ধেক খেজুর বা সামান্য পানি দিয়েও ইফতার করানোর সুযোগ নাও, তাহলে জাহান্নামের আগুন থেকে তোমরা নিজেদের নিরাপদে রাখতে পারবে।" তাই আসুন, এখন থেকেই একে অন্যকে সাহায্য করার অভ্যাস শুরু করি। এই অভ্যাসটি গড়ে তোলার চেষ্টা করি। ফিলিস্তিন এবং অন্যান্য জায়গায় যেখানে আমাদের ভাই ও বোনেরা নিপীড়ন, দারিদ্র্য এবং জীবন ও সম্পদের অভূতপূর্ব ক্ষতির শিকার হচ্ছেন সেখানে অভাবী ভাই ও বোনদের সাহায্য করার মাধ্যমে প্রচুর পুরস্কার পাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

> তোমরা নিজেদের পাপের জন্য আল্লাহর কাছে তাওবাহ করো এবং নামাজের সময় দু'হাত তুলে আল্লাহর কাছে দুয়া করো কারণ এটিই দুয়া করার উত্তম সময়।

রাসুল (সা.) আরও বলেন, "হে লোকসকল! যে কেউ এ মাসে উত্তম আচার-আচরণ গড়ে তুলবে সে কেয়ামতের দিনে সুবিধা পাবে। ভয়ংকর সেদিনে যখন পা ক্রমাগত পিছলে যেতে চাইবে সেদিন এই উত্তম শিষ্টাচারসম্পন্ন ব্যক্তি সীরাতের (জান্নাতের সেতু) ওপর দিয়ে সহজে হেঁটে যাবে। যে ব্যক্তি এই মাসে তার বান্দাদের কাজের চাপ কমিয়ে দেয়, আল্লাহ তার হিসাব সহজ করে দেন এবং যে এ মাসে অপরকে কষ্ট দেয় না, আল্লাহ তাকে বিচারের দিন তাঁর গজব থেকে রক্ষা করবেন। যে ব্যক্তি এ মাসে কোনো এতিমের প্রতি সদয় আচরণ করবে, আল্লাহ সেদিন তার প্রতি সদয় দৃষ্টি দেবেন। যে ব্যক্তি এ মাসে তার আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে, আল্লাহ সেদিন তার প্রতি রহমত বর্ষণ করবেন, আর যে ব্যক্তি এ মাসে তার আত্মীয়দের সাথে খারাপ ব্যবহার করবে, আল্লাহ তাকে তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত করবেন।

যে ব্যক্তি এই মাসে বেশি বেশি নামাজ আদায় করবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন এবং যে ব্যক্তি এই মাসে তার ফরজ পালন করবে, তার সওয়াব অন্যান্য মাসের তুলনায় সত্তর গুণ বেশি হবে। যে ব্যক্তি বারবার আমার উপর আল্লাহর রহমত প্রার্থনা করবে, সালাম ও দুরুদ পেশ করবে, আল্লাহ তার নেক আমলের পাল্লা ভারী রাখবেন। যে ব্যক্তি এই মাসে কুরআনের একটি আয়াত তিলাওয়াত করবে, সে অন্যান্য মাসে পুরো কুরআন তেলাওয়াতের সমান সওয়াব পাবে।

হে লোকসকল! এ মাসে জান্নাতের দরজা খোলা থাকে। তোমাদের রবের কাছে প্রার্থনা করো, যে এ দরোজাটি তোমাদের জন্য বন্ধ না হয়ে যায়। এ মাসে যখন জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ থাকে, দোয়া করবে যাতে তোমাদের কারো জন্য এ দরোজাগুলো খুলে না যায়। শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়েছে, তাই তোমরা রবের দরবারে দোয়া বাড়িয়ে দাও যাতে শয়তান তোমাদের ওপর কর্তৃত্ব খাটাতে না পারে।"

উপসংহার :

আসুন আমরা আন্তরিকতা ও পবিত্রতার সাথে বরকতময় এ মাসটিকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত হই। আসুন, আমরা নিজেদেরকে নিয়ে আত্মপর্যালোচনা করি। নিজেদের গুনাহগুলো চিহ্নিত করি এবং সেই গুনাহের জন্য আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হই। আসুন আমরা আমাদের দুর্বলতা ও বদ অভ্যাসগুলো সনাক্ত করি এবং এই রামাদ্বান শেষ হওয়ার আগেই ঐসকল বদ অভ্যাস ও দুর্বলতাগুলো থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কার্যকর পরিকল্পনা করি। আসুন, আমরা অন্যকে ক্ষমা করি এবং নিজেরা যদি কাউকে কষ্ট দিয়ে ফেলি, তাহলে রামাদ্বান মাস আসার পূর্বেই তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেই।

আমরা আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আসুন আমরা প্রজ্ঞার পরিচয় দেই। নিজেরা বেশ কিছু দুয়া সংকলন করি। দুয়াগুলো কখন কবুল হয় সে সম্পর্কেও সচেতন হই। বিশেষ করে, ইফতারের সময়, ফজরের আগ দিয়ে রাতের শেষভাগ এবং সিজদার সময়গুলোকে কাজে লাগাই। কেননা এ সময়গুলোতে যে দুয়া করা হয়, আল্লাহ তায়ালা তা ফিরিয়ে দেন না।

আমাদের সবসময়ই ভাবা উচিত যে, এই রামাদ্বানটিই আমাদের জীবনের শেষ রামাদ্বান হতে পারে। তাই এ রামাদ্বানের সর্বোচ্চ ফায়দা হাসিল করার জন্য আমাদের কার্যকর একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। রামাদ্বানের অর্জিত কল্যাণ থেকে আমরা সারা বছর যাতে উপকৃত হতে পারি তা নিশ্চিতে আমাদের আরো বেশি আন্তরিকতা ও প্রজ্ঞার পরিচয় দেয়া উচিত।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের ওপর রহম করুন। আমরা যেন সুস্বাস্থ্য এবং বলিষ্ঠ ঈমানের মধ্য দিয়ে রামাদ্বান অতিবাহিত করতে পারি, আল্লাহ পাক সেই তাওফিক আমাদের দান করুন। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সেই সব সৌভাগ্যবান বান্দার তালিকায় শামিল করুন যারা নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করতে পারবেন এবং গুনাহ থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে রামাদ্বানের ফজিলতে সমৃদ্ধ করুন। আমিন।

লেখক : কেন্দ্রীয় সভাপতি, মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন।

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় নব্য-ঔপনিবেশিক

আঘাতগুলোকে চ্যালেঞ্জ করতেই হবে

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল বারী

ভূমিকা

রেনেসাঁ পরবর্তী ইউরোপীয় শাসকগোষ্ঠী বিশ্বের অনেকের কাছেই মানব ইতিহাসের ধ্বংসাত্মক, বেদনাদায়ক এবং অবমাননাকর নৃশংসতার অন্যতম জঘন্য অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হয়। মুসলমান ও প্রাচ্য থেকে ধার নেওয়া বস্তুগত জ্ঞানে তারা সমৃদ্ধ হলেও নীতি-নৈতিকতা থেকে রয়ে গেছে একদমই বিচ্ছিন্ন। ইউরোপের এই শাসক মহলই একটা সময়ে নতুন বিশ্ব আবিষ্কারের জন্য তাদের নতুন শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিল। এর ফলে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসতি স্থাপনের মোড়কে দুটো বর্বর ঔপনিবেশিক উদ্যোগের উত্থান হয়। ঔপনিবেশিকেরা তাদের পছন্দসই রাষ্ট্র নির্মাণের অংশ হিসেবে স্থানীয় আদিবাসীদের নৃশংসভাবে নির্মুল করে। একইভাবে, বলপ্রয়োগ এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিভাজন তৈরি করে জয় হাসিল করার কৌশল অবলম্বন করে এশিয়া ও আফ্রিকার আরও বেশ কিছু দুর্বল রাষ্ট্রে উপনিবেশ স্থাপন করা হয়।

বেশ কয়েকটি দেশের নানা জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে আগে থেকেই কিছু সংঘাত তো ছিলই; এর মধ্যে ইউরোপীয়রা আবার নিজেদের অপকৌশল ব্যবহার করে। ফলে বিংশ শতকের প্রথমার্ধেই দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করতে হয় বিশ্বকে। এই দুই যুদ্ধে কোটি কোটি মানুষের প্রাণহানি ঘটে। বিপুল এ রক্তপাতের পর প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিকতার আকাঙ্ক্ষা ও সক্ষমতার অবসান ঘটে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক শক্তি অর্জনের মাধ্যমে ইউরোপকে ছাপিয়ে নতুন পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং এরও এক দশক পরে যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরেই নাইন এলিভেনের মতো ভয়াবহ ঘটনা আমেরিকার সামনে গোটা বিশ্বের ভাগ্য নিরূপনের অপার সুযোগ তৈরি করে দেয়। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে মার্কিন মিডিয়া এবং সেখানকার বুদ্ধিবৃত্তিক সম্প্রদায় পুরোদমে মুসলিম বিদ্বেষী মানসিকতার চাষাবাদ করে। এরপর থেকে আজ অবধি নব্য উদারবাদী হস্তক্ষেপবাদী এজেন্ডার একমাত্র ক্ষমতাধর দেশ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরব ও মুসলিম বিশ্বকে বরাবরই তোপের মুখে রেখেছে।

পশ্চিমের বসতি স্থাপনকারী ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র হিসেবে ইসরাইল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটেন ও ইউরোপের শক্তি কমে যাওয়ার প্রেক্ষিতে সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ইসরাইল ঐতিহাসিক ফিলিস্তিন রাষ্ট্র দখলের চূড়ান্ত লক্ষ্য বাস্তবায়নের পথে আমেরিকার মতো একটি উগ্র এবং শক্তিশালী মিত্র খুঁজে পায়। ইসরাইল রাষ্ট্র সৃষ্টির প্রেক্ষাপট ও প্রক্রিয়া যেন পূর্ববর্তী ইউরোপীয় বসতি স্থাপনকারী অভিযানের বৈশিষ্ট্যগুলোই স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৯ শতকের শেষের দিকে এবং ২০ শতকের প্রথম দিকে অটোমান সাম্রাজ্য যখন ক্রমাগতভাবে আরব প্রদেশগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছিল, ঠিক সে মুহূর্তেই ইউরোপের বিভিন্ন স্থান থেকে ইহুদি অভিবাসীরা ধীরে ধীরে ফিলিস্তিনে আসতে শুরু করে। এভাবে ইহুদিদের উপস্থিতি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলেও তখনও পর্যন্ত সংখ্যাটি ছিল খুবই নগণ্য। কিন্তু ১৯১৬ সালে সাক্ষরিত 'সাইকস-পিকট চুক্তি' এবং এক বছর পর ১৯১৭ সালে প্রনীত 'বেলফোর ঘোষণাপত্র' পুরো পরিস্থিতিই আমূল পাল্টে দেয়। পূর্ব ইউরোপ থেকে অসংখ্য ইহুদি চলে আসে ফিলিস্তিনে। ১৯২৪ সালে ফিলিস্তিনে ইহুদি জনসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৬ শতাংশ; তবে তাদের মালিকানায় ছিল মাত্র ৪ শতাংশ ভূখণ্ড। এ পরিস্থিতিতে, স্থানীয় আদিবাসী আরবেরা নিজেদের অবস্থান নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। কালক্রমে এ দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে উত্তেজনা ও সংঘাত বাড়তে থাকে। বৃটেন এ সংঘাতের হেতু বের করার জন্য প্যালেস্টাইন রয়াল কমিশন নামে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করে যা পিল কমিশন নামেও পরিচিত। এ কমিশন ১৯৩৭ সালে বাধ্যতামূলকভাবে দেশটিকে

ভাগ করার সুপারিশ করে যেখানে দেশটির ৩৩ শতাংশ ভূখণ্ড নিয়ে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।

স্থানীয় আরবেরা এ পরিকল্পনার তীব্র প্রতিবাদ করে। কিন্তু ম্যান্ডেট ক্ষমতা যেহেতু বৃটেনের হাতে ছিল তাই তারা এ সুযোগটি কাজে লাগিয়ে ফিলিস্তিনের সকল রাজনৈতিক দল ও সংস্থাগুলোকে বিলুপ্ত করে দেয়। ফিলিস্তিনের রাজনীতিবীদদের অনেককেই দেশ থেকে বের করে দেয়া হয় এবং বিদ্রোহী ফিলিস্তিনিদের দমন করার জন্য সামরিক আদালত চালু করা হয়। আদিবাসী ফিলিস্তিনিদের নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে ইসরাইলের প্রতিষ্ঠা প্রক্রিয়া ছিল আরব বিশ্বের মাঝখানে একটি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র জিইয়ে রাখার সর্বশেষ পদক্ষেপ। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ইলান প্যাপ তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'দ্য এথনিক ক্লিনজিং অব প্যালেস্টাইন' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,'১৯৪৮ সালের ফিলিস্তিন-ইসরাইল যুদ্ধটি ইসরাইলীদের কাছে স্বাধীনতার যুদ্ধ হিসেবে বিবেচিত হয়। অন্যদিকে, ফিলিস্তিনিদের জন্য এটি ছিল নাকবা, তথা মহাবিপর্যয়। এ যুদ্ধের পরিণতিতে ইসরাইল নামক রাষ্ট্র যেমন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, পাশাপাশি আধুনিক মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ও ব্যাপক বাস্তুচ্ছেদের ঘটনাও ঘটেছিল। বন্দুকের নলের মুখে প্রায় ১০ লাখ মানুষকে তাদের বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ করা হয়, অসংখ্য সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হয় এবং ইচ্ছাকৃতভাবে শত শত ফিলিস্তিনি গ্রামকে ধ্বংস করা হয়। যদিও বিপুল সংখ্যক মানুষকে উচ্ছেদের এ সত্য বয়ানকে পরবর্তী সময়ে পদ্ধতিগতভাবে বিকৃত করা হয় এবং আড়াল করার চেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু এত বড়ো বাস্তুচ্ছেদের ঘটনা একবিংশ শতকে ঘটলে নিঃসন্দেহে একে জাতিগত নিশ্চিহ্নকরণের প্রক্রিয়া (এনিক ক্লিনজিং) হিসেবেই গণ্য করা হতো।

কয়েকশ বছর আগে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় ইউরোপীয়রা স্থানীয় বাসিন্দাদের বর্বরভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে যেভাবে নিজেদের রাষ্ট্র কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছিল, ঠিক একই ধরনের বর্বর ও নৃশংস পন্থায় ফিলিস্তিনি গ্রামগুলোকে নির্মূল করে দেয়া হয় এবং ফিলিস্তিনি ভূখন্ডের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় বসবাসকারী ইহুদিদেরকে সেখানে নিয়ে আসা হয়। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে আদি ফিলিস্তিনিদের আবাসস্থলে এসব উড়ে আসা ইহুদিদের বসবাস করার সুযোগ তৈরি করে দেয়া হয়।

প্রায় এক হাজার বছর ধরেই মুসলিম স্পেন এবং অটোম্যান সাম্রাজ্যের অধীনে ইহুদিরা মুসলিমদের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করেছিল। অথচ এই ইহুদিদেরকেই খৃষ্টান ইউরোপে থাকাকালীন সময়ে বারবার জুলুম নিপীড়নের মুখে পড়তে হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত ইসরাইল রাষ্ট্রে ইউরোপীয় সেক্যুলার ঘরানার জায়নবাদীরা মুসলিমদের ঐতিহাসিক সহায়তার কথা ভুলে যায়। সহাবস্থানের পরিবর্তে তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে নির্মম দখলদারিত্ব এবং নির্যাতন শুরু করে। খ্যাতনামা মানবাধিকার সংগঠনগুলো এমনকী ইসরাইলী মানবাধিকার সংস্থাগুলোও বহুবার ইসরাইলকে একটি জোরপূর্বক বসতি স্থাপনকারী, ঔপনিবেসিক এবং বর্ণবাদী রাষ্ট্র হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। চলমান গাজা সংকট সৃষ্টির বহু আগে থেকেই তারা ইসরাইলের ব্যাপারে এ ধরনের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিই লালন করে আসছে।

ফিলিস্তিনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা

রাজনৈতিক, সামরিক, আর্থিক ও মিডিয়াতে শ্রেষ্ঠতর মার্কিন নেতৃত্বাধীন শাসকশ্রেণি বিশ্বকে বরাবরই এনটাইটেলমেন্টের আয়না দিয়ে দেখে।

সবখানে, সর্বত্র মানুষকে শিক্ষিত, ক্ষমতাবান এবং শক্তিশালী করা জরুরি। গ্লোবাল সাউথের দেশীগুলোর এবং বিশ্বজুড়ে নাগরিক সংগঠনগুলোর দায়িত্ব হলো সামাজিক, রাজনৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সেক্টরে নেতৃত্ব তৈরি করা যেন নিকট ভবিষ্যতে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে সমৃদ্ধ একটি প্রজন্মের আবির্ভাব নিশ্চিত করা যায়।

পক্ষান্তরে, পৃথিবীর অন্যান্য অংশ এমনকী গ্লোবাল সাউথ এবং পশ্চিমা বিশ্বে বসবাসরত সাধারণ মানুষেরাও বিষয়গুলোকে একদমই ভিন্নভাবে বিবেচনা করে। মানবতা এখন স্পষ্টতই দুভাগে বিভক্ত। একটি পক্ষে আছে শক্তিশালী, ক্ষমতাধর এবং অহংকারী কিন্তু সংখ্যালঘু দেশ। আর বিপরীত পক্ষে আছে ক্ষমতাহীন এবং কণ্ঠস্বরহীন অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ। তবে, দ্বিতীয় পক্ষটি সাম্প্রতিক সময়ে ক্রমাগত অভিজাত শ্রেণি এবং তাদের পালিত মিডিয়াকে চ্যালেঞ্জ করার মতো আস্থাবান হয়ে উঠছে।

গ্লোবাল নর্থ ইসরাইলের মতো ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গড়ে যা অর্জন করতে চেয়েছিল তা নিঃসন্দেহে ব্যর্থ হবে। কারণ এটি অবধারিত যে দখলদারিত্ব একটি সময়ে অপরিহার্য প্রতিরোধের মুখে পড়বেই। সাধারণ নাগরিক, নৈতিকভাবে সমৃদ্ধ পৃথিবীর সিংহভাগ মানুষ, তাদের স্ব স্ব ভূমিকা পালন করে এবং নিজেদের প্রভাব বিকশিত করার মাধ্যমে বিভিন্ন ধাপে এই চ্যালেঞ্জিং প্রক্রিয়ায় সহায়তা করতে পারে। সবখানে, সর্বত্র মানুষকে শিক্ষিত, ক্ষমতাবান এবং শক্তিশালী করা জরুরি। গ্লোবাল সাউথের দেশীগুলোর এবং বিশ্বজুড়ে নাগরিক সংগঠনগুলোর দায়িত্ব হলো সামাজিক, রাজনৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সেক্টরে নেতৃত্ব তৈরি করা যেন নিকট ভবিষ্যতে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে সমৃদ্ধ একটি প্রজন্মের আবির্ভাব নিশ্চিত করা যায়। উচ্চশিক্ষিত স্বল্প সংখ্যক লোকের মাধ্যমেও অনেক সময় পরিবর্তনের সূচনা হয় যা অন্যদেরকেও ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করতে পারে।

প্রত্যাশিত পরিবর্তন নিশ্চিতে সম্ভাব্য পদক্ষেপসমূহ

স্বল্পমেয়াদী

১.শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ : শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের আয়োজন করা যাতে জুলুম ও অনাচারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। এসব কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার জন্য লোকজনের সমাগম বা বেশি সংখ্যক মানুষ প্রদর্শন করাও জরুরি। এক্ষেত্রে সমৃদ্ধ জনগণ এবং সামাজিক নেতৃত্বের উপর ভর করে প্রবাসী জনগোষ্ঠীও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

২.শিক্ষা ও সচেতনতা : জনগুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলো সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা। মানুষকে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী এবং এর প্রভাব সম্পর্কে অবহিত করা।

৩.সুসংগঠিত করা : জন মানুষের জন্য কল্যাণকর হয় এমন ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন সাধনে বিভিন্ন গ্রুপ তৈরি করা কিংবা এ ধরনের ইস্যুতে কাজ করছে এমন সংস্থা, সংগঠনে ও আন্দোলনে যোগ দেয়া।

৪.এডভোকেসি বা লবিং : শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ, পিটিশন এবং নীতি নির্ধারকদের সাথে লবিং করার মাধ্যমে ইতিবাচক বিষয়ে প্রণোদনা প্রদান করা।

৫.জন সম্পৃক্ততা : সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, বিভিন্ন সামাজিক ঘটনাবলী এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে আলোচনায় অংশ নেয়ার মাধ্যমে মানুষের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া।

৬.ভোট ও নির্বাচন : অন্যদেরকে নির্বাচনে অংশ নিতে উৎসাহিত করা। নিজে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অথবা মানুষের কল্যাণে কাজ করতে চান এরকম প্রার্থীর প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করা।

৭.জোট গঠন করুন : একই ধরনের উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে এরকম সংস্থা ও ব্যক্তির সাথে সমন্বয় ও সংহতি প্রকাশ করা।

দীর্ঘমেয়াদী

১.দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য : জনগণের জন্য একটি স্বচ্ছ ও প্রেরণাদায়ক দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য নির্ধারণ করা এবং কীভাবে এ বিষয়টি মানুষের জীবনমান উন্নত করবে সে সম্পর্কেও ধারণা দেয়া।

২.ধৈর্য ও অধ্যবসায় : সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য অনেকটা সময় লাগতে পারে। তাই এক্ষেত্রে ধৈর্য থাকাটা জরুরি।

৩.নেতৃত্ব ও রোলমডেল : স্থানীয় যোগ্য নেতাদের চিহ্নিত করে সামনে নিয়ে আসা, যারা অন্যদেরও সক্রিয় ও সম্পৃক্ত হতে উৎসাহিত করবে।

৪.জনসম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা : বিভিন্ন গ্রুপ ও জন সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য সুযোগ তৈরি করা যাতে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং পরিবর্তন সাধনে অংশগ্রহণ করতে পারে।

৫.যোগাযোগ : একটি উন্মুক্ত ও কার্যকরী যোগাযোগ চ্যানেল বজায় রাখা যাতে উন্নতি ও অগ্রগতি সম্পর্কে মানুষকে অবহিত রাখা যায়।

৬.ক্ষমতায়ন : প্রয়োজনীয় সহায়তা, সম্পদ এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানুষকে ক্ষমতায়ন করা, যাতে তারা উদ্যোগী হতে পারে এবং পরিবর্তনের যে কোনো প্রয়াসে নেতৃত্ব দিতে পারে।

৭.অংশীদারিত্ব : এমন সব স্থানীয় সংগঠন, এনজিও এবং সরকারী সংস্থার সাথে সমন্বয় করা যারা মানুষকে সমর্থন, সহযোগিতা, সম্পদ ও বিশেষজ্ঞ মতামত দিয়ে সহায়তা করতে পারে।

৮.নজরদারি ও মূল্যায়ন : এমন একটি পদ্ধতি বা পন্থা বের করা যাতে করে কাজের অগ্রগতি যাচাই করা যায় এবং পরিবর্তনের প্রক্রিয়া কতটুকু বাস্তবায়িত হলো তাও পরিমাপ করা যায়।

লেখক : শিক্ষাবিদ, প্যারেন্টিং বিশেষজ্ঞ, সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল, মুসলিম কাউন্সিল অফ ব্রিটেন।

ইসলামে দাওয়াহ'র মধ্যমপন্থী পদ্ধতি

মোসলেহ ফারাদী

সূচনা

এই কলাম রচনার উদ্দেশ্য ইসলামিক দাওয়াহ'র এমন একটি পদ্ধতি খুঁজে পাওয়া যা ইসলামের মধ্যমপন্থী বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ লক্ষ্য অর্জনে, লেখক ইসলামের মধ্যমপন্থী ধারণা বিশ্লেষণ করবেন, দাওয়াহ সংক্রান্ত ধারণা পর্যালোচনা করবেন এবং পরিশেষে দাওয়াতি কাজের ক্ষেত্রে এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরবেন যা ইসলামের মধ্যমপন্থী ধারণার সাথে মানানসই। এক্ষেত্রে লেখক তার বসবাসস্থল, তথা বৃটিশ সমাজকে উপজীব্য করে কলামটি লিখেছেন কেননা তিনি সেখানেই বসবাস করেন এবং প্রবন্ধটি ইংরেজি থেকে অনূদিত।

মধ্যমপথ কেন?

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মুসলমানদেরকে মধ্যমপন্থী জাতি হিসেবে বাছাই করেছেন। মধ্যমপন্থী জাতি হওয়ার অর্থ হলো– মুসলিমরা তাদের বিশ্বাস ও কাজের মধ্যে ভারসাম্য করবে। সব ধরনের চরমপন্থা এড়িয়ে যাবে। এই ভারসাম্যবোধটি ইবাদত থেকে শুরু করে অপরাপর মানুষের সাথে আচরণ এমনকি ব্যক্তিগত জীবনসহ সবকিছুতেই মধ্যমপন্থা অবলম্বনের তাগিদ দেয়। মুসলিমদের আরেকটি দায়িত্ব হলো এই ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য সবাইকে উৎসাহিত করা। এটি একটি বড়ো দায়িত্ব। কারণ, বিষয়টি কেবলমাত্র নিজেদের মধ্যপন্থী হওয়ার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয় বরং একইসাথে অন্যকেও বোঝানো যে, কেন মধ্যমপন্থী হওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ। যদি মুসলিমরা মধ্যমপন্থার সাথে শক্তভাবে যুক্ত না থাকে, তাহলে তারা অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারবে না। মধ্যমপন্থা ও সংযমের ধারণাটি মুসলমানদের জন্য সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। এটি নিছক একটি পরামর্শ নয়, বরং মুসলিম কারা আর কেনই বা তারা পৃথিবীতে এসেছে– এ প্রশ্নের উত্তরের সাথেও বিষয়টি জড়িত। মধ্যমপন্থার প্রতি মনোযোগ ধরে রাখতে পারলে এর মাধ্যমে মুসলিমদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক কর্মকাণ্ডও প্রভাবিত হয়। এ কারণে, মধ্যমপন্থা সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট রাখা এবং অনুশীলন করা মুসলিমদের অন্যতম মৌলিক একটি কর্তব্য।

মধ্যমপন্থী ধারণা প্রসঙ্গে

কুরআনের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো, অন্তর্নিহিত তাৎপর্য প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কুরআনের একটি আয়াত অপর আয়াতের সাথে ভীষণভাবে সম্পৃক্ত; বলা যায় একটি আয়াত অপরটির সম্পূরক। এ নীতিমালার আলোকে, আমি তিনটি ধাপে এমন কিছু আয়াত এখানে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি যার মাধ্যমে মুসলিমের বৈশিষ্ট্য ও দায়িত্বগুলো অনুধাবন করা যায়। মধ্যমপন্থী জাতি সংক্রান্ত ধারণাটি সামনে রেখে আমি কুরআনের এ আয়াতগুলো বাছাই করেছি। এই আয়াতগুলো হলো, সুরা বাকারার ১৪৩ নং আয়াত, সুরা আলে ইমরানের ১১০-১১২ নং আয়াত এবং সুরা আল হাদিদের ২৫ নং আয়াত। আলোচনার পরবর্তী অংশে এই আয়াতগুলোকে তিনটি শিরোনামের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হবে। এগুলো হলো– উম্মাহ আল ওয়াসাত, উম্মাহ আল খায়ের এবং উম্মাহ আল আদল।

উম্মাহ আল ওয়াসাত (মধ্যমপন্থী জাতি)

আল কুরআনে 'উম্মাহ' এবং এ সংক্রান্ত শব্দগুলো ৭৩ বার আলোচনায় এসেছে। এর মধ্যে সুরা বাকারার ১৪৩ নং আয়াত এবং সুরা আলে ইমরানের ১১০ নং আয়াতটি বিশেষভাবে বিবেচ্য। এ দুটো আয়াতে মুসলিমদেরকে 'উম্মাহ ওয়াসাত' এবং 'খায়ের উম্মাহ' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এরকম সম্বোধনের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাও সেখানে উল্লেখ করেছেন। এই আয়াত দুটো এবং এর আনুষাঙ্গিক আয়াতগুলো মুসলিমদের ঐতিহাসিক কিছু বার্তা প্রদান করে। সুরা বাকারার ৩০ নং

আয়াতে বলা হয়েছে যে, সকল মানুষকেই আল্লাহর খলিফা হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে। তবে, সুরা বাকারার ১৪৩ নং আয়াত এবং সুরা ইমরানের ১১০ নং আয়াতে মুসলিমদের উপর বাড়তি কিছু দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। মুসলিম হিসেবে আমাদেরকে অবশ্যই এই দায়িত্বগুলো জানতে ও পালন করতে হবে। হাদিসে বলা হয়েছে, মুসলিমরা অন্যান্য জাতির উপর তাদের পার্থিব দায়িত্বগুলো পালন করেছিল কিনা সে বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করবে।

"এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্যে এবং যাতে রাসুল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য। আপনি যে কেবলার উপর ছিলেন, তাকে আমি এজন্যই করেছিলাম, যাতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, কে রাসুলের অনুসারী থাকে আর কে পিঠটান দেয়। নিশ্চিতভাবেই এটি কঠিনতম বিষয়, কিন্তু তাদের জন্যে নয়, যাদেরকে আল্লাহ পথপ্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদের ঈমান নষ্ট করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ, মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, করুনাময়।" (সুরা বাকারা : ১৪৩)

সুরা বাকারার ১৪৩ নং আয়াতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহর দ্বীনের কেন্দ্রস্থল জেরুজালেম থেকে সরিয়ে মক্কায় নিয়ে স্থাপন করা হয়। এর মধ্য দিয়ে রাসুল (সা.) এবং তার অনুসারীদের জন্য নতুন এক দিগন্তের সূচনা হয়। জেরুজালেম থেকে মক্কায় কিবলা নির্ধারণের বিষয়টি ঈমানের একটি পরীক্ষাও ছিল। কেননা এর মাধ্যমেই প্রকৃত ঈমানদার ও মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ করা যায়। এই ঈমানী পরীক্ষায় যারা সফল হতে পারেন তাদেরকেই উম্মাহ ওয়াসাত হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ এই উম্মাহ আল ওয়াসাত সমগ্র মানবজাতির জন্য সাক্ষী হবেন, ঠিক যেমনটা হজরত মুহাম্মাদ (সা.) হয়েছিলেন।

কিবলা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বৈশ্বিক নেতৃত্বের পরিবর্তনের বার্তাও পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে বনি ইসরাইলের কাছ থেকে নেতৃত্ব উম্মতে মুহাম্মাদীর কাছে চলে আসে। এ পরিবর্তন থেকে আরো বুঝা যায় যে, জেরুজালেম আল্লাহর দ্বীনের প্রকৃত উদ্দেশ্য পূরণ করেনি; ফলে অবধারিতভাবেই কিবলা পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। মুসলিমদের মূল কাজ হলো, আল্লাহর হক আদায় করা। যারা ঈসা (আ.) এবং মুসা (আ.) কে অনুসরণ করার দাবি করে কিন্তু বাস্তবে ব্যর্থ হয়েছে তাদের পরিবর্তে আল্লাহ মুসলিমদেরকে এ দায়িত্ব প্রদান করেছেন। এই প্রেক্ষাপটে মুসলিমদের মূল দায়িত্ব হলো উম্মাতে ওয়াসাতের পরিচয় বহন করা এবং সাক্ষ্য প্রদান করা।

আল্লাহর বাছাইকৃত নবির অনুসরণ করা ছাড়া কেউ পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর আনুগত্য করার দাবি করতে পারে না। ইহুদি ও খৃষ্টানেরা একটা সময়ে নিজেদের আল্লাহর পছন্দসই জাতি হিসেবে দাবি করেছিল। কিন্তু যখন তাদের এ দাবির অকাট্যতা ভুল প্রমাণিত হয়, তখন আল্লাহ তায়ালা একই দায়িত্ব দিয়ে রাসুল (সা.) কে প্রেরণ করেন। মুসলিমদেরকে বারবার রাসুল (সা.) কে অনুসরণ করার তাগিদ দেওয়া হয়েছে যাতে তারা অপরের জন্য সাক্ষী হতে পারেন যেমনটা নবিজি (সা.) তাদের উপর সাক্ষী হয়েছেন।

আরবিতে 'মধ্যমপন্থী জাতি' বলতে একটি ন্যায়নিষ্ঠ, সমতাপূর্ণ, ভারসাম্যপূর্ণ এবং নমনীয় সম্প্রদায়কে বোঝায়। মধ্যমপন্থী জাতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের মাঝেও একটি কেন্দ্রীভূত ভূমিকা পালন করতে পারে। এই মধ্যপন্থী জাতির সদস্যরা নেককারদের সাথে বন্ধুত্ব করে, অন্যায় ও জুলুমকে সমর্থন করা থেকেও বিরত থাকে। আর কুরআন বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, মধ্যমপন্থী জাতিকে গোটা মানব সম্প্রদায়ের জন্য সাক্ষী হতে হবে যাতে করে রাসুল (সা.) তাদের জন্য সাক্ষী হতে পারেন।

মানবজাতির জন্য সাক্ষী হয়ে ওঠার বিষয়টি খুবই সম্মানজনক ও গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব। এই দায়িত্বটিই মুসলিমদেরকে বৈশ্বিক নেতৃত্বের আসনে স্থাপন করে। রাসুল (সা.) যেভাবে ধর্মপরায়ণতা এবং নৈতিকতার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে গেছেন মুসলিমরাও একইভাবে গোটা বিশ্বে সেই দৃষ্টান্ত রাখবে বলেই আশা করা হয়েছিল। রাসুল (সা.) যেমন ঐশ্বরিক বার্তা মুসলিমদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সময়ে মুসলিমদের কাজ হলো সে বার্তাগুলোকেই বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া। এ কাজে ব্যর্থ হওয়ার অর্থই হলো মুসলিমরা তাদের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান থেকে ফের পতনের দিকে যাত্রা শুরু করবে। বিশেষ করে, তারা যখন নেতৃত্বে ছিল সে সময়গুলোতে মানুষ যেভাবে বিভ্রান্তিকর বিশ্বাস লালন করেছে এবং সীমালংঘন করেছে তার জন্য মুসলিমদের জবাবদিহি করতে হবে।

উম্মাহ আল খায়ের (সর্বোত্তম জাতি)

"তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। আর আহলে-কিতাবরা যদি ঈমান আনতো, তাহলে তা তাদের জন্য মঙ্গলকর হতো। তাদের মধ্যে অল্প কিছু ঈমানদার আর অধিকাংশই হলো পাপাচারী। যৎসামান্য কষ্ট দেওয়া ছাড়া তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তারা তোমাদের সাথে লড়াই করে, তাহলে তারা পিছু হটবে। অতঃপর তাদের আর সাহায্য করা হবে না। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কিংবা মানুষের প্রতিশ্রুতি ছাড়া ওরা যেখানেই অবস্থান করেছে সেখানেই তাদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর ওরা উপার্জন করেছে আল্লাহর গজব। ওদের উপর চাপানো হয়েছে নানাবিধ দুর্বলতা। আর এমনটা হয়েছে এজন্যে যে, ওরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অনবরত অস্বীকার করেছে এবং নবিগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। তার কারণ, ওরা নাফরমানী করেছে এবং সীমালঙ্ঘন করেছে।" (সুরা ইমরান : ১১০-১১২)

সুরা বাকারার ১৪৩ নং আয়াতে মুসলিমদের উম্মাহ ওয়াসাত হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। মুসলিমদেরকে মানবজাতির সাক্ষী হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। অন্যদিকে, সুরা ইমরানের ১১০ নং আয়াতে মুসলিমদেরকে খায়ের উম্মাহ হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে। এ আয়াতে মুসলিমদেরকে ভালো কাজের প্রচার করার এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। একই ধরনের বার্তা পাওয়া যায় সুরা ইমরানের ১০৪ নং আয়াতে। এই আয়াতে আহলে কিতাবদের (ইহুদি ও খৃষ্টান) নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। এই সম্প্রদায়গুলো একটা সময়ে আল্লাহর পছন্দনীয় জাতি ছিল। কিন্তু মুহাম্মাদ (সা.) সহ তাদের জন্য প্রেরিত নবি-রাসুলগণকে অস্বীকার করায় এবং যথাযথ ভাবে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় তারা সেই সম্মানজনক অবস্থানটি হারিয়ে ফেলে।

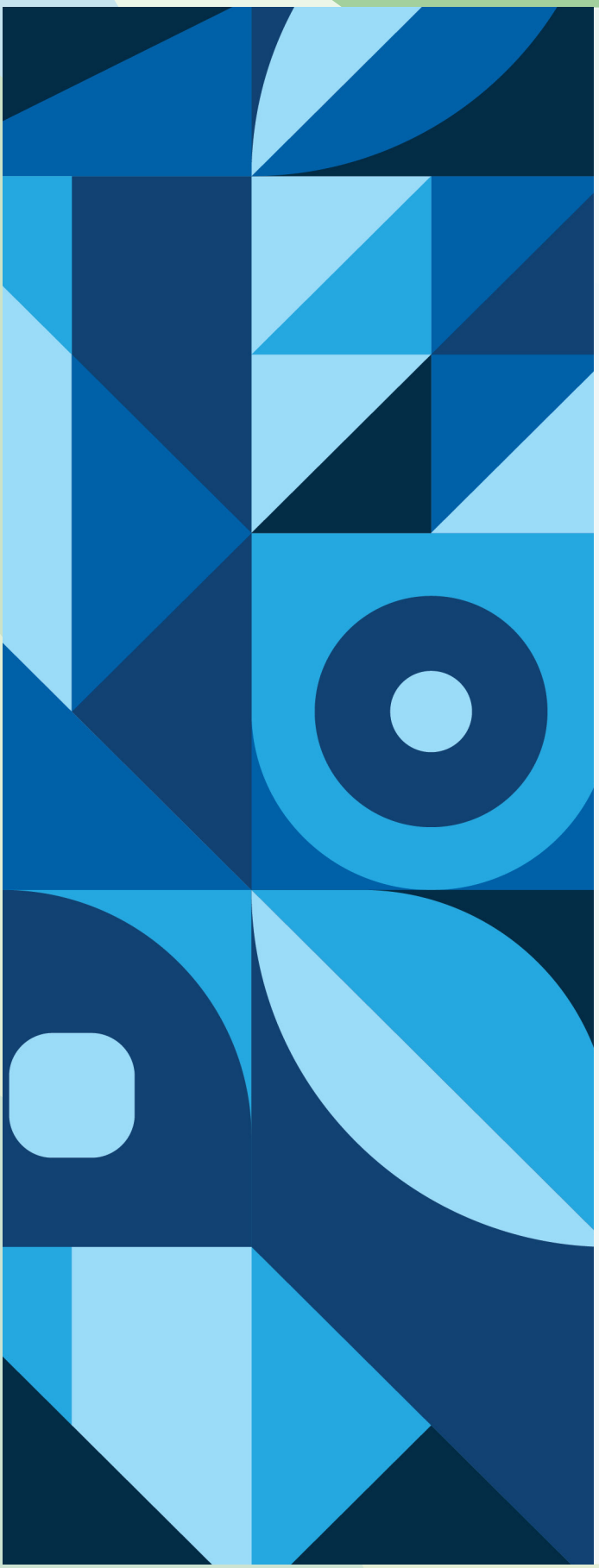

মুসলিমদেরকে আল্লাহ তায়ালা যে সম্মানজনক অবস্থান দিয়েছেন তা ধরে রাখার একমাত্র উপায় হলো রাসুল (সা.) এর শিক্ষাগুলো অনুসরণ করা। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদে পূর্ববর্তী অনেক জাতির পতনের কারণগুলো বর্ণনা করেছেন; আমাদেরকেও সেগুলো স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তাদের পতনের নেপথ্যে যে কারণগুলো ছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, আইনলঙ্ঘন, নবিদের অযাচিতভাবে হত্যা এবং ক্রমাগত অবাধ্যতা।

এই আয়াতগুলোতে আহলে কিতাবদের সম্মানজনক অবস্থান থেকে পতনের বা বিবর্তনের দৃষ্টান্তগুলো আলোচিত হয়েছে। একইসঙ্গে, যারা ইসলামের বার্তাগুলো প্রত্যাখান করে তাদের পরিণাম, তাদের দুর্বলতা, ক্রোধ এবং অসহায়ত্বগুলো তুলে ধরা হয়েছে। তবে এ দুর্বলতাগুলোকে শারীরিক সংকটের চেয়ে বরং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংকট হিসেবেই উপস্থাপন করা হয়েছে। সামগ্রিক এই আলোচনার মাধ্যমে আসমানী ইনসাফ এবং ইসলামী শিক্ষা ও চেতনার মূল উপকরণগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

এই বাস্তবতায়, উন্নত চরিত্র ও নৈতিকতা লালনের দায়িত্ব এখন অর্পিত হয়েছে মুসলিমদের উপর। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকভাবে মুসলিমদের পক্ষে এমন কিছু অপরিহার্য গুণাবলি অর্জন করা সম্ভব যার ওপর ভিত্তি করে তারা একটি ন্যায়নিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে, সততার প্রসার ঘটাতে পারে, অন্যায় ও জুলুমকে প্রতিহত করতে পারে এবং আল্লাহকে একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস হিসেবে স্বীকৃতি দিতে পারে। এ ধরনের তাৎপর্যপূর্ণ সব ভূমিকার বিষয়ে মুসলিমদের সচেতন হওয়া উচিত; পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর ভুল ত্রুটি সম্বন্ধে জানা উচিত যাতে তারা একই ধরনের ভুল এড়িয়ে যেতে পারে।

উম্মাহ আল আদল (ন্যায়নিষ্ঠ জাতি)

“আমি আমার রাসুলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাজিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ জেনে নিবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রাসুলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।” (সুরা হাদিদ : ২৫)

যত নবি-রাসুল পৃথিবীতে এসেছেন তাদের সবারই স্পষ্ট নিদর্শন ছিল। যার একটি হলো আসমানী কিতাব আর অন্যটি হলো ভারসাম্য– এ জন্য যাতে মানুষজন পৃথিবীতে নিজেদের সাথে এবং অন্য সবার সাথে ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ করে। এই নবিগণ পৃথিবীতে এসেছিলেন মানুষকে তাদের অধিকার এবং একইসাথে আল্লাহর অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য। অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়ার অর্থ হলো ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে সামাজিক ক্ষেত্র পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছ এবং দায়িত্ববান হওয়া, সমাজ থেকে অন্যায় ও অনাচার উচ্ছেদ করা, চরমপন্থা যেকোনো অবস্থান থেকে দূরে থাকা এবং সমাজের সর্বত্র ভারসাম্য ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। অর্থাৎ সকলেই তাদের প্রাপ্য অধিকার পাবে এবং যথাযথভাবে পাবে।

এই আয়াতে লৌহ নাজিলের কথাও বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, লোহায় আছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং আরও বহুবিধ উপকারিতা। এখানে নবি প্রেরণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করার পরপরই লোহার শক্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় নবিরা শুধু ন্যায়বিচারের কথা বলতেই

আসেননি বরং কাজেও প্রতিফলিত করতে এসেছিলেন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য তাদেরও ক্ষমতার দরকার হয়েছিল। কেননা, যারা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় কিংবা বিরোধিতা করে তাদেরকে মোকাবেলা করাও নবিদের অন্যতম দায়িত্ব ছিল। অর্থাৎ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হলে শুধু কথা বলাই যথেষ্ট নয়, বরং বাস্তবায়নে কাজ করাও জরুরি।

সুরা হাদিদের ২৭ নং আয়াতে কিছু মানুষের চর্চিত বৈরাগ্যবাদের বিষয়টিও উঠে এসেছে। খৃষ্টানেরা যেভাবে ধর্মকে বিবেচনা করে এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তার সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। এই আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোনো স্থান নেই এবং ঈমানদার কোনো মানুষ বৈরাগ্যবাদের চর্চা করতে পারে না। রাসুল (সা.) নিজেও বলেছেন, 'ইসলামে কোনো বৈরাগ্যবাদ নেই' (মুসনাদে আহমাদ)। আরেকটি হাদিসে রাসুল (সা.) বলেছেন, "ধার্মিকতার মানে সবকিছু ছেড়ে জঙ্গলে বসবাস করা নয়। বরং ধার্মিক হওয়ার অর্থ হলো আল্লাহর পথে জিহাদ করা।"

অর্থাৎ মোহবিষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মুসলিমদের জঙ্গলে বা পাহাড়ে যাওয়ার দরকার নেই। বরং মুসলিমদের উচিত আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা, প্রয়াস চালানো। এ আয়াতের উপর ভিত্তি করে বলা যায়, আল্লাহর পথে সংগ্রাম করার অন্যতম উদ্দেশ্যই হলো পৃথিবীতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। এটি একদিকে যেমন ব্যক্তিগত দায়িত্ব আবার অন্যদিকে সামষ্টিক দায়িত্বও বটে। প্রতিটি মুসলিমেরই দায়িত্ব হলো নিজেদের আচরণ ও কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ইনসাফ করা এবং সম্মিলিত ক্ষেত্রেও একই ধরনের চেষ্টা করা। মুসলিমদের দায়িত্ব হলো এমন একটি সামষ্টিক কাঠামো গঠন করা যারা ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করবে আর এই সামষ্টিক কাঠামোটিই হলো উম্মাহ আল আদল।

বার্তাগুলো অনুধাবন করা এ পর্যন্ত আলোচনায় সুরা বাকারার ৩০, ১৪৩ নং আয়াত, সুরা ইমরানের ১১০-১১২ নং আয়াত এবং সুরা হাদিদের ২৫-২৭ নং আয়াতগুলোতে মানুষের, বিশেষ করে মুসলিমদের দায়িত্বসমূহ আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদে বলে দিয়েছেন যে, অন্য সব কিছুর মতো তিনি মানুষকেও বিশেষ একটি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ হিসেবে, মুসলিমদেরকে আল্লাহর খলিফা হিসেবে পৃথিবীতে দায়িত্ব পালন করতে হবে। পাশাপাশি, মুসলিম হিসেবে তাদেরকে উম্মাহ ওয়াসাতাহ (ভারসাম্যপূর্ণ জাতি), খায়ের উম্মাহ (সর্বোত্তম জাতি) এবং উম্মাহ আল আদল (ন্যায়নিষ্ঠ জাতি) এর ধারণাও লালন করতে হবে। এ জাতিগুলোর সদস্য হিসেবে বেশ কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয় আর এ সবগুলো দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে মুসলিম উম্মতের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। বিশেষ করে, উম্মাহ আল ওয়াসাত মুসলিমদের সামষ্টিক দায়িত্বসমূহের প্রতিনিধিত্ব করে।

আল কুরআনে 'খায়ের' শব্দটি নানাভাবে মোট ৩৯২ বার এসেছে। মানুষ যে বিষয়গুলোকে ভালো বলে জানে কিংবা আল্লাহ পাক যে বিষয়গুলোকে ভালো হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন– এর সবটাই 'খায়ের' শব্দের আওতাভুক্ত। খায়ের শব্দটি দিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের ভালোও বোঝানো হয় যেমন: ভালো, উত্তম বা উৎকৃষ্ট। সম্পদ, সন্তান, গৃহপালিত প্রাণীসহ নানা ধরনের বিষয় বোঝাতেও খায়ের শব্দের ব্যবহার হয়। তাই যখন আল্লাহ খায়ের উম্মাহ'র কথা বলেন, তা দিয়ে অবশ্যই সবকিছুকেই বোঝানো হয়। আবার 'খায়ের' এর দিকে আহ্বানের অর্থ হলো পার্থিব ও পরকালীন জীবনের ভালো, ইতিবাচক ও কল্যাণকর বিষয়াবলীর দিকে আহ্বান করা। আর কাউকে যখন ভালো কাজ করার কথা বলা হয়, এর অর্থ হলো তিনি নিজের জন্য এবং অপরের জন্য কল্যাণকর কাজ করবেন এবং ইতিবাচকভাবেই করবেন। রাসুল (সা.) বলেছেন, "মানুষের মধ্যে তারাই সর্বোত্তম যারা অপরের জন্য উপকারী" (তাবারানি)। তাই খায়ের উম্মাহ বলতে এমন একটি জাতি বা সম্প্রদায়কে বোঝানো হয় যারা মানবতার কল্যাণ সাধন করেন।

খায়ের উম্মাহ'র আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো উম্মাহ ওয়াসাত বা মধ্যমপন্থী জাতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করা। নিষ্ক্রিয়তা এবং অতিমাত্রায় সক্রিয়তার মাঝামাঝি একটি অবস্থানে থাকলে কল্যাণ অর্জন করা সম্ভব হয়। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত কিছু করে ফেললে হীতে বিপরীত হয়। এ কারণে আল্লাহ অতিরিক্ত যে কোনো কিছু করা থেকেই বিরত থাকার তাগিদ দিয়েছেন। তাই মুসলিমদেরকে যদি খায়ের উম্মাহ হতে হয় তাহলে অবশ্যই তাদেরকে মধ্যপন্থা অনুসরণ করতে হবে। ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা না থাকলে প্রকৃত খায়ের উম্মাহ হয়ে ওঠা যাবে না। আর কেউ যদি যথাযথভাবে খায়ের না হতে পারেন তাহলে তিনি উম্মাহ ওয়াসাতও হতে পারবেন না।

আয়াত ৫১:৫৬ এ আল্লাহ তায়ালা যে বার্তা দিয়েছেন–"আমি অবশ্যই মানব ও জ্বীন জাতিকে আমার দাসত্ব করার জন্য সৃষ্টি করেছি" তার অর্থ দাঁড়ায় যে মানুষ আল্লাহর নির্দেশ পালন করে তার প্রতিনিধি হিসেবে উম্মাহ আল আদল, উম্মাহ আল খায়র এবং উম্মাহ আল ওয়াসাতের দায়িত্ব পালন করবে। নিজেদেরকে এসব মানে উন্নীত করবে। আর এটাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও মুসলিম হওয়ার মমার্থ।

পরিশেষে বলা যায়, খায়েরের (ভালো) সর্বোচ্চ স্তর হলো ন্যায়বিচার বা আদল। মুসলিমদেরকে ভালো ভালো কাজ করার মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং মধ্যমপন্থা অনুসরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সত্যনিষ্ঠ মুসলিমরা কখনো প্রান্তিক হতে পারেন না, নিষ্ক্রিয় হতে পারেন না এবং চরমপন্থী কোনো কৌশলও অবলম্বন করতে পারেন না।

লেখক : সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন।

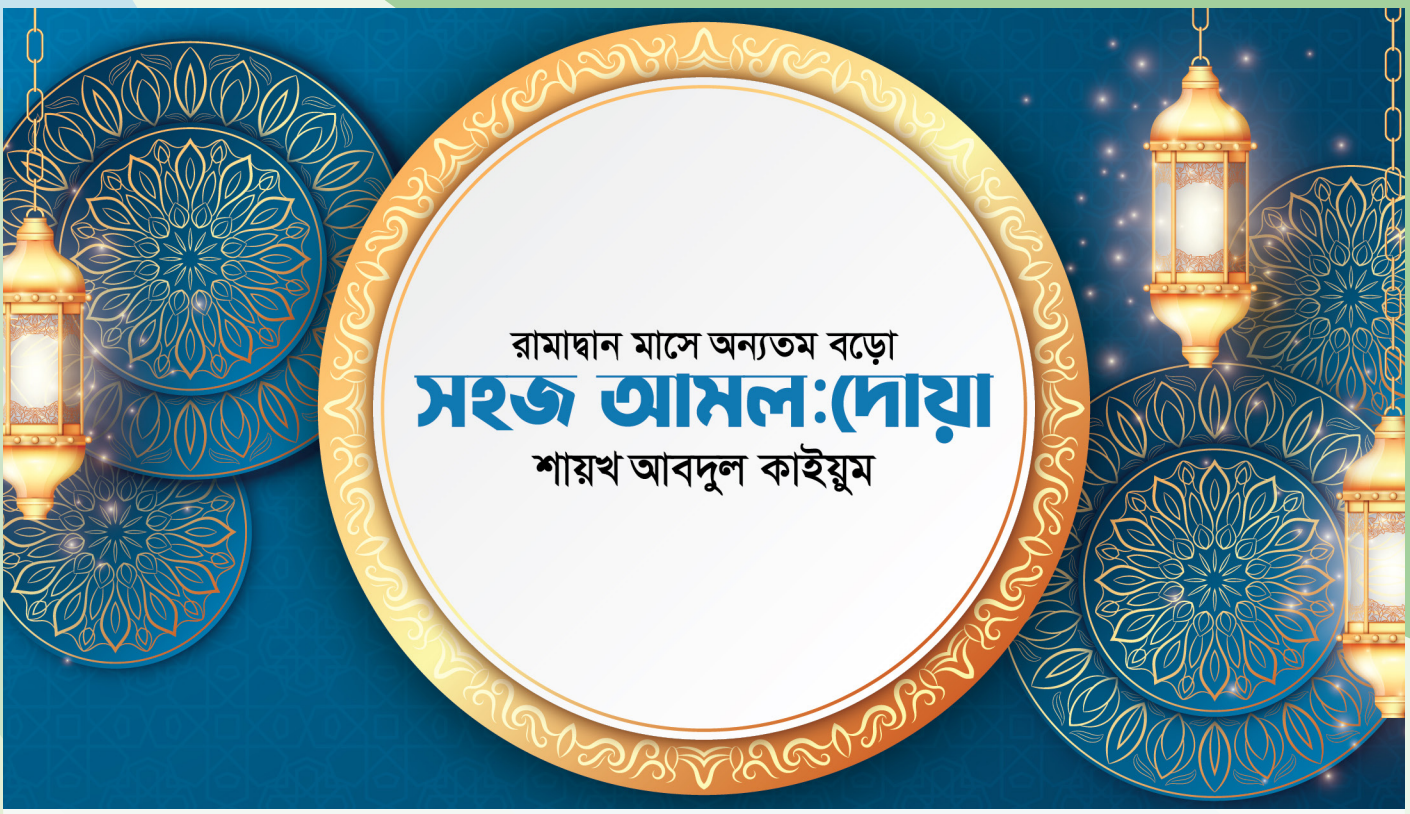

রামাদ্বান মাসে অন্যতম বড়ো

সহজ আমল:দোয়া

শায়খ আবদুল কাইয়ুম

আল্লাহর কাছে দোয়া করা একটি অন্যতম বড় ইবাদত। সাহাবী নু'মান বিন বাশীর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন–

إن الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

অর্থ : নিশ্চয়ই দোয়া হচ্ছে আসল ইবাদত।

অতঃপর তিনি পাঠ করলেন–

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ) غافر / مؤمن

অর্থ : তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো অর্থাৎ (তোমরা আমার কাছে দোয়া কর)। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয়ই যারা অহংকার করে আমার ইবাদত হতে বিরত থাকে, অচিরেই তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সুরা মু'মিন : ৬০)

আল্লাহ তায়ালা চান, আমরা যেন সব সময় তার কাছে দোয়া করি। আমরা দোয়া করলেই তিনি কবুল করেন। তবে কিছু সময় ও ক্ষণ আছে, যখন দোয়া করলে আল্লাহ অনেক বেশি করে কবুল করেন। তন্মধ্যে অন্যতম সময় হচ্ছে রামাদ্বান মাসে এবং রোজার সময়ে দোয়া করা। রামাদ্বানের অন্যতম ইবাদত হিসেবে রোজার সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার মাঝখানে সুরা বাকারার ১৮৬ নং আয়াতে তিনি বলেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ البقرة / ١٨٦

(হে নবী) আমার বান্দারা যখন আপনাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে আপনি বলে দিন। আমি একান্ত কাছেই আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনায় সাড়া দেই যখন সে আমাকে ডাকে। অতএব, তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার উপর ঈমান আনে, আশা করা যায় তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে। (সুরা বাকারা : ১৮৬)

রামাদ্বান সংক্রান্ত আলোচনার মাঝখানে দোয়ার বিষয় উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা এ মাসে দোয়ার আমলের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। দোয়া হচ্ছে অন্যতম বড় ইবাদত। যেমনটি রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

অর্থ : দোয়াই হচ্ছে আসল ইবাদত। (আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন্ মাজাহ)

আরেকটি হাদিসে এসেছে,

أفضل العبادة الدعاء

সর্বোত্তম ইবাদত হচ্ছে দোয়া। (হাকিম)

অন্য একটি হাদিসে এসেছে,

ليسَ شيءٌ أكرمَ علَى اللهِ من الدُّعاءِ

আল্লাহর কাছে দোয়ার চেয়ে বেশি মর্যাদার আর কিছু নেই। (আহ্মদ, আদবুল মুফরাদ)

আরেকটি হাদিসে এসেছে:

إنَّ أبخلَ الناسِ من بخلَ بالسلامِ ، و أعجزُ الناسِ من عجز عن الدعاءِ.

সবচেয়ে বেশি কৃপণ হচ্ছে ঐ লোক, যে সালাম দিতেও কৃপণতা করে। আর সবচেয়ে বড় ব্যর্থ হচ্ছে ঐ লোক, যে দোয়া করতেও ব্যর্থ। (আহ্মাদ, আদবুল মুফরাদ)

আরেকটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ্ (সা.) দোয়ার গুরুত্ব বুঝাতে বলেন :

الدعاءَ ينفعُ مما نَزَل ومما لم يَنْزِلْ ، فعليكم عبادَ اللهِ بالدعاءِ.

দোয়া অতীব প্রয়োজনীয়, যখন বিপদ মুসিবত জাতীয় কিছু নাজিল অথবা যা এখনো নাজিল হয়নি উভয় অবস্থায়ই।

কাজেই আল্লাহর বান্দাগণ দোয়া অব্যাহত রাখো। (হাকিম, হাসান)

আরেকটি হাদিসে তিনি বলেন :

لا يردُّ القضاءَ إلَّا الدُّعاءُ ، ولا يزيدُ في العمرِ إلَّا البرُّ.

দোয়া ছাড়া আর কিছু তাকদীরকে ঠেকাতে পারে না। আর দোয়া জীবনে কল্যাণ ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করে না। (হাকিম, হাসান)

আরেকটি হাদিসে তিনি বলেন:

إنَّ اللهَ حيِيٌّ كريمٌ يستحي إذا رفعَ الرَّجلُ إليْهِ يديْهِ أن يردَّهما صفرًا خائبتينِ.

আল্লাহ অত্যন্ত লাজুক ও মহৎ। যখন কেউ তাঁর কাছে হাত উঠিয়ে দোয়া করতে থাকে, তিনি সে দুটো হাতকে হতাশ ও শূন্যাবস্থায় ফেরত দিতে লজ্জাবোধ করেন। (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

আরেকটি হাদিসে এসেছে:

مَا عَلى الأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللهَ تَعالى بِدَعْوَةٍ إلاَّ آتَاهُ اللهُ إيَّاهَا، أَوْ صَرَفَ عنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، مَا لَم يدْعُ بإثْمٍ، أَوْ قَطِيعَةِ رحِمٍ مَا لَم يعْجلْ: يقُولُ قَد دَعوتُ رَبِّي، فَلم يسْتَجبْ لِي

পৃথিবীতে যখনই কোন মুসলিম আল্লাহর কাছে কোন কিছুর আর্জি পেশ করে, আল্লাহ্ তার আর্জি অবশ্যই পূরণ করে তাকে তা দান করবেন, অথবা সমপরিমাণের কোন বিপদ আপদ তা থেকে সরিয়ে নিবেন। যতক্ষণ না সে কোন গুনাহ জাতীয় কিছুর জন্যে বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার জন্যে দোয়া না করে। আর যদি সে তাড়াহুড়া করে না বলে: আমি কত দোয়া করলাম, কত দোয়া করলাম, কিন্তু আমার দোয়া কবুল হলো না। (তিরমিযী, হাসান)

রাসুলুল্লাহ্ (সা.) দোয়া করতে উৎসাহিত করে বলেন–

و ليسأل أحدُكم ربَّه حاجته كلَّها، حتى يسأله الملح، وحتى يسأله شسع نعله إذا انقطع (الترمذي : حسن

তোমাদের যার যত প্রয়োজন আছে সবগুলোর জন্যেই যেন সে তার রবের কাছে প্রার্থনা করে। এমন কি লবনের প্রায়োজন হলেও। এমন কি কারো জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলে সেটার জন্যেও (তাঁরই কাছে) প্রার্থনা করুক। (তিরমিযী, হাসান)

তবে শুধু বিপদে পড়লেই দোয়া না করে, ভালো থাকাবস্থায়ও দোয়ার আমল করতে থাকা উচিত। এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

من سرَّهُ أن يستجيبَ اللَّهُ لهُ عندَ الشَّدائدِ والكُرَبِ فليُكثِر الدُّعاءَ في الرَّخاءِ (الترمذي : حسن

যে চায় যে কঠিন পরিস্থিতি ও কষ্টের সময় আল্লাহ তার দোয়া কবুল করুন, সে যেন ভালো থাকাবস্থায় বেশি বেশি দোয়ার আমলে লিপ্ত থাকে। (তিরমিযী, হাসান)

আল্লাহর কাছে দোয়া না করা অনেক বড় অপরাধ। রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেন–

من لم يدع الله يغضب عليه (الترمذي : حسن

যে আল্লাহর কাছে দোয়া করে না, তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। (তিরমিযী, হাসান)

রোযাবস্থায় বান্দার দোয়া আল্লাহ্ কবুল করতে থাকেন। এ বিষয়ে একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم ودعوة المسافر.

তিন ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়ে যায়: রোজাদারের দোয়া, মযলুমের দোয়া এবং মুসাফিরের দোয়া।

আরেকটি হাদিসে তিনি বলেন, তিন ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়ে যায়। সন্তানের প্রতি পিতামাতার দোয়া, রোজাদারের দোয়া এবং মুসাফিরের দোয়া।

দোয়া কবুল হওয়ার জন্য কিছু শর্ত ও মাসনূন আদাব রয়েছে। তা অনুসরণ করে দোয়া করলে সে দোয়া কবুল হয়। অন্যতম প্রধান শর্তে হচ্ছে: হারাম বর্জন করে হালাল তরীকায় জীবন চালানো। এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন–

إنَّ اللهَ تعالى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إلَّا طَيِّبًا، وَإنَّ اللهَ تعالى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ تعالى: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم:

নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা পাক পবিত্র। তিনি পাক পবিত্রতা ছাড়া কিছুই কবুল করেন না। আর আল্লাহ তায়ালা মু'মিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যা তিনি রাসুলদেরকে নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেন, হে রাসুলগণ পাক পবিত্র (হালাল) থেকে খাবার গ্রহণ করুন, আর নেক আমল করুন। আপনারা যা কিছু করেন, সে সম্পর্কে আমি অবগত। (মুমিনুন : ৫১)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

হে মুমিনগণ, আমি তোমাদেরকে যে পাক পবিত্র (হালাল) রিজিক দান করেছি, তা থেকে তোমরা খাবার গ্রহণ কর, আর আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; যদি তোমরা একান্তই তাঁরই ইবাদত করে থাকো। (বাকারা : ১৭২) অতঃপর তিনি ঐ লোকের কথা বলেন, যে অনেক লম্বা সফর করে এলোমেলো চুল, ধুলিমণ্ডিত এবং ক্লান্তিকর শরীরে আকাশের দিকে হাত তুলে (আর্জি পেশ করছে) হে রব, হে রব! অথচ তার খাবার হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোষাক হারাম, যে হারাম (সূত্র) থেকে নিজের রক্ত মাংস বর্ধিত করেছে, কীভাবে তার ফরিয়াদ কবুল করা হবে?

দোয়া কবুল করাতে হলে যাবতীয় হারাম চর্চা থেকে সরে আসতে হবে তাওবা করতে হবে। তাহলে আশাকরা যায় আল্লাহ আমাদের দোয়া কবুল করবেন।

লেখক : ইসলামী স্কলার, ইমাম ও খতিব, ইস্ট লন্ডন মসজিদ।

রোজার আদব ও হাকিকত

ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ গাজালী (রহ.)

প্রকৃত রোজার জন্য যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ গুনাহ হতে বিরত রাখতে পারে সেসব নিম্নোক্ত ছয়টি বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে খেয়াল রাখতে হবে।

১. চোখের রোজা :

চোখের দৃষ্টি অবনত রাখা। মন্দ বিষয় বা কুদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করা এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন করে, এমন বিষয়বস্তু দেখা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা। হুযুরে পাক (সা.) এরশাদ করেছেন, খারাপ বিষয়ের দিকে নজর করা শয়তানের বিষাক্ত একটি তির সদৃশ। যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে এ কাজ পরিত্যাগ করে, আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ ঈমানের বদৌলতে সে অন্তরে এক অবর্ণনীয় স্বাদ অনুভব করে।

হযরত জাবের রা. বলেন, হুযুরে পাক (সা.) এরশাদ করেছেন: পাঁচটি ব্যাপার রোজাদারের রোজা বরবাদ করে দেয় যথা : (১) মিথ্যে বলা (২) চোগলখুরি বা কূটনামি করা (৩) পেছনে নিন্দে করা (৪) মিথ্যে কসম করা এবং (৫) কামভাব নিয়ে (অবস্থানে) দৃষ্টিপাত করা।

২. রসনার রোজা :

বাজে কথা, মিথ্যে বা অসত্য কথা, পরনিন্দে, চোগলখুরি, গীবত, অশ্রাব্য অশ্লীল কথা, যুলম, কলহ-বিবাদমূলক এবং রুক্ষ ও কর্কশ কথা বলা থেকে রসনা সংযত রাখা এবং চুপ করে থাকা বা কুরআন তেলাওয়াত ও তাসবীহ-তাহলীলে রত থাকা, যিকির করা প্রভৃতির নাম রসনার রোজা। হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহ. বলেন যে, পরদোষ চর্চা রোজা বিনষ্ট করে। মুজাহিদ (রহ.) বলেন যে, দুটো কাজ রোজা বরবাদ করে, একটি পরদোষ চর্চা, অন্যটি অসত্য কথা বলা। হুযুর পাক (সা.) বলেছেন, রোজা ঢাল সদৃশ। তোমরা রোজা রাখলে কেউ যেনো অনর্থক এবং অশ্লীল কথা না বলো। কেউ তোমাদের সাথে ঝগড়া করতে এলে বা তোমাদেরকে গালি দিলে বলবে, আমরা রোজা রেখেছি। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, হুযুরে পাক (সা.)-এর যামানায় দুজন মহিলা রোজা রেখে রোজার শেষদিকে তাদের ক্ষুধা ও পিপাসা প্রচণ্ড আকার ধারণ করলো যে তাদের প্রাণ বিয়োগের অবস্থা হয়ে দাঁড়ালো। এ অবস্থায় তাদের রোজা ভঙ্গের অনুমতির জন্য হুযুর (সা.)-এর দরবারে একজন লোক পাঠানো হলো। হুযুরে পাক (সা.) লোকটির কাছে একটি পেয়ালা দিয়ে বলে পাঠালেন, তোমরা যা খেয়ে রোজা রেখেছিলে তা এই পেয়ালায় বমি করে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। অতঃপর একজন মহিলা টাটকা রক্ত এবং তাজা মাংস বমি করল। অন্যজনও সে একই বস্তু বমি করলো। পেয়ালাটি রক্ত ও মাংসে পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। লোকগণ তা দেখে বিস্ময়াপন্ন হলো। হুযুরে পাক (সা.) দেখে বললেন, এরা দুজনেই হালাল মাল খেয়ে রোজা রেখেছে কিন্তু হারামকৃত বিষয় দ্বারা রোজা নষ্ট করেছে। এই দু'মহিলা একে অপরের কাছে বসে গীবত ও পরনিন্দে চর্চা করেছে। এদের সেই পরনিন্দেই পেয়ালায় গোশত ও রক্তের রূপ ধারণ করেছে।

৩. কানের রোজা :

কু-কথা ও অশ্রাব্য বিষয় থেকে কানকে বিরত রাখা। কেননা যে বিষয়গুলো বলা নিষিদ্ধ, তা শ্রবণ করাও নিষিদ্ধ। এজন্যই আল্লাহ মিথ্যে শ্রবণকারী ও হারামখোরদের কথা একসাথে উল্লেখ করেছেন। যথা : এরশাদ হয়েছে

سَمّٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكّٰلُونَ لِلسُّحْتِ .

"তারা মিথ্যে শ্রবণকারী ও হারাম ভক্ষণকারী।" (সুরা আল মায়েদা : ৪২)

আরও এরশাদ হয়েছে:

لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ .

"তাদের সাধু দরবেশ পুরোহিতগণ তাদেরকে পাপের কথা বলতে এবং হারাম খেতে বিরত রাখে না কেন?" (সুরা আল মায়েদা : ৬৩)

অতএব পরনিন্দে শুনে চুপ থাকা নিষিদ্ধ বলা যাচ্ছে। এরশাদ হয়েছে যে, "তোমরা তাদেরই অনুরূপ।" (সুরা নিসা : ১৪০)

৪. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রোজা :

হুযুরে পাক (সা.) এরশাদ করেছেন, গীবতকারী ও গীবত শ্রবণকারী উভয়েই গুনায় অংশীদার।

إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ .

হাত-পা এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে মন্দ বিষয়বস্তু থেকে বিরত রাখা ও উদরকে সন্দেহযুক্ত খাদ্য থেকে পবিত্র রাখা। কেননা দিনভর হালাল থেকে বিরত থাকার পর হারাম দ্বারা ইফতার করার দ্বারা তার রোজা কিছুই হলো না। এটা ঠিক সেই ব্যক্তির কাজের মতো হলো, যে একটি ভবন তৈরি করলো কিন্তু একটি নগরীকে বিধ্বস্ত করে দিল। বুঝতে হবে যে, হালাল খাদ্যের আধিক্যও ক্ষতির কারণ আর তা হ্রাস করার জন্য রোজার বিধান হয়েছে। বেশি ঔষধ সেবনের ক্ষতি থেকে বাঁচতে গিয়ে যে বিষপান করে, তার মতো নির্বোধ নেই। দৃষ্টান্তটা বুঝে নাও, হারাম খাদ্য বিষ সদৃশ যা দীনকে বরবাদ করে দেয়, আর হালাল দ্রব্য ঔষধ যা স্বাভাবিক পরিমাণ খেতে হবে। বেশি সেবন করলে ক্ষতি হতে পারে। রোজার লক্ষ্য হলো সেই হালালের আধিক্যের ক্ষতি প্রতিরোধ। হুযুরে পাক (সা.) এরশাদ করেছেন যে, বহু রোজাদারেরই রোজার দ্বারা শুধু তৃষ্ণার ক্লেশ বরণ করা ছাড়া আর কোনো লাভ হয় না। কারো করো মতে এ হাদিসে যারা হারাম দ্বারা ইফতার করে তাদের কথা বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, হাদিসে তাঁদের কথা বলা হয়েছে, যারা রোজা রেখে হালাল খাদ্য থেকেও বিরত থাকে সত্যি কিন্তু মানুষের রক্ত মাংস তথা গীবত দ্বারা ইফতার করে, যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আবার কারো কারো অভিমত হলো যারা নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়গুলোকে গোনাহর কার্য থেকে বিরত রাখে না, এ হাদিসে তাদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৫. হালাল রিস্ক :

ইফতারকালে পেট ভর্তি করে হালাল খাদ্য ভক্ষণ না করা। কারণ আল্লাহর দরবারে হালাল বস্তু দ্বারা বোঝাই উদর অপেক্ষা অধিক মন্দ পাত্র দ্বিতীয়টি নেই। তাছাড়া সারাদিন উপবাস থেকে সন্ধ্যায় ইফতারকালে অতি ভোজন দ্বারা তা পূরণ করে নিলে এ ধরনের রোজা দ্বারা সে শয়তানকে কিভাবে জব্দ করবে আর কাম-রিপুকেই বা কিভাবে দমিয়ে রাখবে? অনেক স্থানেই দেখা যায় রোজার সময়ে নানা ধরনের খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের ধুম পড়ে যায়। মানুষের এটা স্বভাবে পরিণত হয়েছে। রোজার সময়ে নানাবিধ খাদ্য দ্রব্যের আয়োজন করা ও অত্যধিক পরিমাণ পানাহার করা। রোজার এক মাসে যা তারা খাদ্যখাদক বাবদ খরচ করে, অন্য সময়ে কয়েক মাসেও তা খরচ হয় না। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রোজার উদ্দেশ্য হলো উদর খালি রেখে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাগুলোকে নিস্তেজ ও দুর্বল করে ফেলা, যাতে তাকওয়া সবল হয়; কিন্তু ভার থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস থাকার পর খাবার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি প্রাপ্ত অবস্থায় নানাবিধ উপাদেয় ও সুস্বাদু খাদ্য অতিরিক্ত খাবার ফলে কু-রিপুর শক্তি ও আনন্দ অনেকগুণে বেড়ে যায় এবং পূর্বাপেক্ষা বেশি করে কু-বাসনা জাগ্রত হয়।

মোটকথা মানুষকে মন্দ কাজের দিকে যে অপশক্তিগুলো টেনে নেয়, সেগুলোকে করার লক্ষ্যে যে রোজার ব্যবস্থা, তার মূল কথাই হলো অল্প পানাহার। তাছাড়া রোজার কোনো সার্থকতা থাকে না। রোজা রেখে দিনের খাদ্যও পুরোপুরিভাবে রাতের খাদ্যের সাথে খেয়ে নিলে বা তদপেক্ষাও বেশি এবং ভালো পানাহার করলে সে রোজার কোনো উপকার হবে না। রোজার বৈশিষ্ট্য ক্ষুধা-তৃষ্ণা অনুভব করা ও কিছুটা দৈহিক দুর্বলতা উপলব্ধি করার জন্য রোজার সময়ে দিবানিদ্রা পরিত্যাগ করা মুস্তাহাবে গণ্য। এমনকি রাতের বেলায়ও কিছু দৌর্বল্য বজায় থাকলে রাতের ইবাদাত-তারাবিহ-তাহাজ্জুদ প্রভৃতি আদায় করা অধিকতর সহজসাধ্য হয়, শয়তান অন্তরের কাছে আসতে পারে না। তার ফলে যদি মানুষের দৃষ্টিতে অবিনশ্বর জগতের দৃশ্যাবলী আত্মপ্রকাশ করে, তবে আশ্চর্যের কিছু নেই। শবেকদরে এমন ঘটনা-ই ঘটে থাকে, তবে যে ব্যক্তি উদর-বক্ষ ও অন্তরের মাঝে ভোজনাধিক্যের দ্বারা প্রাচীর দাঁড় করে দেয়, তার অন্তরদৃষ্টির সামনে ঊর্ধ জগতের দৃশ্য উন্মোচিত হতে ঐ প্রাচীর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়।

৬. ভয় ও আশা :

ইফতারের পর অন্তরে একাধারে আশা, নিরাশা, দ্বিধা-সন্দেহের দ্বন্দ্ব বলবৎ থাকা। কেননা একথা নিশ্চিতরূপে জানা নেই যে, রোজা আল্লাহর মকবুলিয়তের দরজায় পৌঁছেছে কিনা ও রোজাদার তাঁর খাছ বান্দাদের দলভুক্ত হতে পেরেছে কিনা! যে কোনো ইবাদাতের ক্ষেত্রে এমনি অবস্থা থাকা উত্তম। হযরত হাসান বছরী (রহ.) একবার ঈদের দিন কোথাও গমনকালে একদল হাস্য-কৌতুক রত লোক দেখে বললেন, আল্লাহ তায়ালা রামাদ্বান মাসকে একটা দৌড় প্রতিযোগিতার ময়দানস্বরূপ করেছেন। কিছু লোক এ মাঠে দৌড়ে যেদিন তাদের গন্তব্য স্থলে পৌঁছেছে, আর কিছু লোক পৌছতে পারেনি বরং পেছনে পড়ে আছে, এমনি দিনটিতে যারা এভাবে হাস্য-কৌতুক রত, তাঁদের প্রতি সত্যি অবাক লাগে। আল্লাহর কসম একথা সত্যি যে, প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পেলে সফল লোকগণ আনন্দাধিক্যবশতঃ ক্রন্দন করবে, ক্রীড়া-কৌতুক পরিহার করবে এবং ব্যর্থ লোকেরা বঞ্চনা ও দুঃখের প্রাবল্যে হাস্য-কৌতুক ভুলে যাবে। কেউ আহনাফ ইবনে কায়েস (রহ.)-কে বললো, জনাব! আপনি বৃদ্ধ মানুষ, রোজায় আপনার দেহ দুর্বল হয়ে গড়ে, অতএব এ ব্যাপারে আপনার কোনো ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। তিনি জবাবে বললেন, এক সুদীর্ঘ সফরের জন্য আমি রোজাকে পাথেয় করেছি। সত্যি বলতে কী, আল্লাহর আযাবে ধৈর্য রক্ষা করা অপেক্ষা তাঁর আনুগত্যের ক্লেশে ধৈর্যাবলম্বন করা অনেক সহজ।

আমি দোয়া করছি যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে পবিত্র রমযান মাসে সেই তাকওয়া অর্জন করার তাওফিক দান করুন, যার মাধ্যমে আমরা কুরআনের হেদায়াত গ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করবো, কুরআনের জ্ঞান অর্জন করবো, তার ওপর আমল করবো, আল্লাহ আমাদেরকে কুরআনের বাণী নিয়ে দাঁড়ানোর এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জিহাদ করার সাহস, উদ্যম, দৃঢ়তা এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা দান করুন। আমিন।

(লেখাটি জনাব খুররম মুরাদ–এর 'খোশ আমদেদ মাহে রমযান' বই থেকে সগৃহীত। অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন জনাব সাইয়্যেদ রাফে সামনান।)

ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গঠনে

রামাদ্বান ও কুরআন

নুরুল মতিন চৌধুরী

রামাদ্বান হচ্ছে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি। রামাদ্বান মাস হচ্ছে কুরআন ও সিয়াম সাধনের মাস। এই মাসকে কুরআনের মাস বলা হয় এই জন্য যে, এই মাসেই আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.) এর উপর কুরআন নাজিল করেছেন। এই মাসে আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর সাওম পালন করাকে ফরজ করে দিয়েছেন। রামাদ্বান মাস আমাদের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

সিয়ামের উদ্দেশ্য কী?

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনের সুরা বাক্বারা এর ১৮৩ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর সাওম ফরজ করা হয়েছে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হতে পার।”

রামাদ্বান মাসে সাওম পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আনুগত্য করা, তার নিকটবর্তী হওয়া, আমাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় তৈরি করা এবং আধ্যাত্মিকভাবে নিজেকে শক্তিশালী করা।

তাক্বওয়া অর্জনের মাস রামাদ্বান

রামাদ্বান হলো তাক্বওয়া অর্জনের মাস। তাক্বওয়া কী? তাক্বওয়া হলো নিজের মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকা অথবা আল্লাহর ভয়ে সকল ধরনের খারাপ ও অনৈতিক কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা এবং সমগ্র ভালো কাজের সমাবেশ ঘটানো। বিশেষ করে রামাদ্বান মাস হলো তাক্বওয়া অর্জনের মাস।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনের সুরা আল-ইমরান এর ১০২ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেন–

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٠٢

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যেভাবে তাকে ভয় করা উচিত এবং তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।”

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) উপড়িক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন– “আল্লাহর অনুগত হওয়া এবং তাঁর অবাধ্য না হওয়া। তাকে সর্বদা স্মরণ করা এবং ভুলে না যাওয়া। সবসময় তাঁর প্রতি কৃ অজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং অকৃতজ্ঞ না হওয়া।”

হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) বলেন, “তাক্বওয়া হলো আল্লাহকে ভয় করা, কুরআন ও হাদিস অনুযায়ী আমল করা, অল্পতে সন্তুষ্ট থাকা এবংবিচার দিবসের জন্য প্রস্তুত থাকা।”

عَنْ أَبِي ذَرٍّ جُنْدَبِ بْنِ جُنَادَةَ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ: "اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ" . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তুমি যেখানেই থাকো না কেন আল্লাহকে ভয় কর এবং কোন কারণে খারাপ কাজ হয়ে গেলে সাথে সাথে একটি ভালো কাজ করে ফেল, এতে তোমার খারাপ কাজটি মুছে যাবে এবং মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার কর। তিরমিযি

ইমাম ইবনে রজব (র.) বলেন, “তাক্বওয়ার মানে হল একজন ব্যক্তি নিজের এবং খারাপ জিনিসের মধ্যে একটি দেয়াল তৈরি করবে। সে ব্যক্তি ভালো কাজ করা এবং আল্লাহর নির্দেশ পালন করার মাধ্যমে আল্লাহর শাস্তি, ক্রোধ এবং অসন্তুষ্টির মধ্যখানে একটি দেয়াল তৈরি

করবে এবং সকল নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকবে।" জামে আল-উলুম ওয়াল হিকাম

ইমাম হাসান আল- বসরী (রা.) বলেন, "তাক্বওয়াবান সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর নিষেধ ধেকে বিরত থাকে এবং শুধু ভালো কাজ করে থাকে।"

আমরা কীভাবে তাক্বওয়া অর্জন করতে পারি?

তাক্বওয়া অর্জনের বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে। নিচে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হলো:

১.বারবার আল্লাহকে স্মরণ করা
২.আল্লাহকে বেশি করে জানা
৩.নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করা
৪.নিয়মিত তাওবাহ ও ইস্তেগফার করা
৫.সকল কাজ শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা
৬.নিয়মিত মৃত্যুর কথা স্মরণ করা

সিয়াম কীভাবে আমাদের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখে?

সিয়াম এবং কুরআন আমাদের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গঠনে বিশেষ ভূমিকা রেখে থাকে। নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় আমাদের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে:

ব্যক্তি জীবনে সাওম

সিয়াম আমাদের নাফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখায়। আমাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আমাদেরকে দিনের বেলা খাদ্য, পানীয় এবং শারীরিক প্রয়োজন থেকে বিরত রাখে।

পারিবারিক জীবনে সিয়াম

সিয়াম একটি পারিবারিক একটিভিটি এবং এটা সম্মিলিতভাবে পারিবারিকভাবে করা যেতে পারে। আমরা জামায়াতের সাথে পরিবারের সকলকে নিয়ে সালাত আদায় করতে পারি। পরিবারের সবাইকে নিয়ে সেহেরি ও ইফতার করতে পারি।

সামাজিক জীবনে সিয়াম

সিয়াম আমাদের সামাজিক জীবনে আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। এই মাসে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই মাসে শয়তানকে বন্ধি করার মাধ্যমে আমাদেরকে আল্লাহর ইবাদাত করার সুযোগ করে দিয়েছেন। সিয়াম আমাদের চরিত্রের বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করতে শিখায় এবং একটি সুন্দর ইসলামী সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِين

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, যে মহানবী (সা.) বলেছেন, রামাদ্বান মাস শুরু হলে জান্নাতের দরজা সমুহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদেরকে শৃঙ্খলিত করা হয়।

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতেসাবের সাথে সাওম পালন করে, আল্লাহ তায়ালা তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতেসাবের সাথে কদরের রাতে সালাতে দাঁড়াবে, তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন।

কুরআন নাজিলের উদ্দেশ্য

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনের সুরা বাক্বারা এর ১৮৫ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেন–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

"রামাদ্বান মাস হলো সেই মাস যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা মানবজাতির জন্য হেদায়াত এবং হেদায়াত এবং হেদায়াতের সুস্পষ্ট প্রমান ও মাপকাঠি।"

কুরআন আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি তা শিখতে শিখায়। কুরআন আমাদেরকে কিয়ামাতের দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই জীবনের পর আরেকটি জীবন আছে এবং সেখানে আমাদেরকে জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে। কুরআন আমাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে এবং ঈমান বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

কুরআন কীভাবে আমাদের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখে?

কুরআন আমাদের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গঠনে বিশেষ ভূমিকা রেখে থাকে। নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় আমাদের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে:

কুরআন মুসলিম মা-বাবাকে সন্তানদের জন্য এমন একটি ঘর তৈরি করতে শিখায় যা নিরাপদ এবং সন্তানদের মানসিক, শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক ভাবে লালন-পালন করে।

আমাদেরকে পিতা-মাতার সাথে ভালো আচরণ করতে শেখায়।

- আমাদেরকে প্রেমময় জীবনসঙ্গী হতে উৎসাহিত করে। ধৈর্যশীল, সদয়, স্নেহময় এবং ন্যায়পরায়ণ হতে উৎসাহিত করে।
- আমাদেরকে পরস্পরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে শিখায়।
- হিংসা, বিদ্বেষ ও চোগলখুরী থেকে বেঁচে থাকতে নির্দেশ দেয়।
- আমাদেরকে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা শিখায়।
- উম্মাহর মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলতে নির্দেশ দেয়।
- সংঘাত এড়াতে এবং শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার নির্দেশ দেয়।
- হালাল উপার্জন করতে এবং হারাম বর্জন করতে শিক্ষা দেয়।
- আমাদেরকে সত্যবাদী হতে এবং মিথ্যা থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দেয়।
- আমাদেরকে পবিত্র হতে শিক্ষা দেয়।
- আমাদেরকে একটি সুন্দর পরকালীন পুরস্কারের আশা দেয়।
- সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করতে শিখায়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনের সুরা আল-ইমরান এর ১৬৪ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেন–

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ ١٦٤

"আল্লাহ প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের উপর একটি বড় অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের কাছে তাদের মধ্য থেকে একজন সম্মানিত রাসূল (নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াত তিলাওয়াত করেন, তাদের পবিত্র করেন এবং তাদের শিক্ষা দেন। বই এবং জ্ঞান; এবং এর আগে তারা প্রকাশ্য

ভ্রান্তিতে ছিল।"
সুরা আত-তাহরিম এর ৬ নাম্বার আয়াতে উল্লেখ করেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦ التحريم:

"ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের নিজেদের ও তোমাদের পরিবার-পরিজনদের রক্ষা করো। সেই আগুন থেকে যার জ্বালানি হচ্ছে মানুষ ও পাথরগুলো, তার উপরে রয়েছে ফিরিশতারা– অনমনীয়, কঠোর, তারা আল্লাহকে অমান্য করে না যা তিনি তাদের আদেশ করে থাকেন, আর তারা তাই করে যা তাদের আদেশ করা হয়।
সুরা আল- ইমরান এর ১০৪ নাম্বার আয়াতে উল্লেখ করেন–

وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٠٤

"আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি জাতি থাকা উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করবে এবং তারাই সফলকাম।"
পবিত্র কুরআন অধ্যয়নের সময় নিম্নোক্ত ছয়টি বিষয় মনে রাখতে হবে
১.পরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকা

لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ ٧٩

"যারা পবিত্র তারা ছাড়া অন্য কেউ তা স্পর্শ করবে না।" সুরা ওয়াকিয়াহ: ৭৯
২.তাউজ দিয়ে তেলাওয়াত শুরু করা
৩.তারতিলের সাথে ধীর স্থির ভাবে তেলাওয়াত করা

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوۡلَا نُزِّلَ عَلَيۡهِ ٱلۡقُرۡءَانُ جُمۡلَةٗ وَٰحِدَةٗۚ كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِۦ فُؤَادَكَۖ وَرَتَّلۡنَٰهُ تَرۡتِيلٗا

"কাফিররা বলে, 'সমগ্র কুরআন তার নিকট একবার অবতীর্ণ হল না কেন? এইভাবেই আমি অবতীর্ণ করেছি তোমার হৃদয়কে এর দ্বারা মযবুত করার জন্য এবং তা ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি।"
সুরা ফুরকান : ৩২
৪.সঠিক উচ্চারণ এর সাথে তেলাওয়াত করা

أَوۡ زِدۡ عَلَيۡهِ وَرَتِّلِ ٱلۡقُرۡءَانَ تَرۡتِيلًا

"অথবা তদপেক্ষা বেশি। আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাব।" সুরা মুযাম্মিল : ৪

৫.সুন্দরভাবে তেলাওয়াত করা

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ

৬.আল-বারা ইবনে আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কণ্ঠস্বর দ্বারা কুরআনকে সুন্দর কর।" সুনান আবু দাউদ

৭.কুরআনের আয়াত সমূহ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা

كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ مُبَٰرَكٞ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ

"এক কল্যাণময় কিতাব, ইহা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহাতে মানুষ ইহার আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগ্রহণ করে উপদেশ।" সুরা ছোয়াদ: ২৯

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ أَمۡ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقۡفَالُهَآ

"তবে কী তারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকার চিন্তা করে না? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ।" সুরা মুহাম্মদ: ২৪
পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছে ১৪০০ বছর আগে এবং ঐ একই কুরআন আজও আমাদের কাছে রয়েছে। কুরআনের লক্ষ লক্ষ কপি আজ বিভিন্নভাবে প্রচার হচ্ছে। রাত-দিন বিরামহীনভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে কুরআন তিলাওয়াত হচ্ছে এবং এর অর্থ বুঝার জন্য বিপুল পরিমাণ তাফসির গ্রন্থ লিখা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও আমাদের জীবনে কতটুকু পরিবর্তন এসেছে?
ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন–
১)যে কুরআন পড়ে না সে তা প্রত্যাখ্যান করেছে।
২)যে ব্যক্তি কুরআন পড়েছে কিন্তু এর অর্থ বোঝেনি সে কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করেছে।
৩)যে ব্যক্তি কুরআন পড়ল এবং বুঝল কিন্তু আমল করল না সেও কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করল।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে কুরআন পড়ার, অধ্যয়ন করার এবং কুরআনের হুকুম মেনে চলার তাওফিক দান করুন। আমাদেরকে কুরআনের মহান বাণী মানুষের কাছে পৌছিয়ে দেয়ার তাওফিক দান করুন। এই সিয়াম সাধনার এবং কুরআন নাযিলের মাসে আমাদেরকে কুরআনের সাথে বেশি করে সম্পর্ক গড়ার এবং সে অনুযায়ী জীবন যাপন করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

লেখক : জেনারেল সেক্রেটারি, মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন।

মাহে রামাদ্বান ও রাসুলুল্লাহ (স.) এর

সিয়াম সাধনা

অধ্যাপক মফিজুর রহমান

সূচনা

সমস্ত বিষয়ে মুমিনগণ মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন হতে শিক্ষা গ্রহণ করবে। দ্বীনের কোনো বিষয় ছোট বা বড়, ব্যক্তিগত বা সামাজিক, সালাত, সিয়াম বিষয়ে বা যুদ্ধ- সন্ধি, বিষয়ে ব্যক্তিগত চিন্তা-চেতনা বা পৃথিবীর কোনো জাতি কীভাবে করে সে আদলে করবার কোনো অনুমতি নেই। বান্দাহ সে ব্যক্তিকে বলে, যার আজাদী নেই। বান্দাহকে সকল অবস্থায় বান্দাহ হিসেবে থাকতে হবে- মনিরের হুকুম পালন করাই তার দায়িত্ব। আল্লাহর বান্দাহদেরকে জীবনের কোনো সময়ে বন্দেগী আর কোনো সময় আজাদীর কোনো সুযোগ মুমিনদের জন্যে রাখা হয়নি।

পৃথিবীর প্রলয় দিন অবধি যত আল্লাহর বান্দাহ-বান্দি পৃথিবীতে আছে ও আসবে তারা পৃথিবীর বা কোনো গ্রহের মানব অধিবাসী তারা যে ভাষায়, যে বর্ণের, যে পেশার হোক- জাত, গোত্র, ধর্ম, ভাষা, বর্ণ ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের জন্যে মুহাম্মদ (সা.) রাসুল হিসেবে এসেছেন। যে সকল জনপদে পূর্বের নবীদের অনুসারী আছেন রাসুল (সা.)-এর আগমনে তাদের নবুয়ত ও রিসালতের চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তাদের আনীত সকল কিতাবের কার্যকারিতা চিরতরে মানসূখ হয়ে গেছে। সকলকে সকল কিছু পরিহার করে আখেরী রাসুলের ওপর ঈমান আনতে হবে-

..... قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

“বলে দাও, হে মানবমণ্ডলী আমি তোমাদের সকলের জন্যে রাসুল হয়ে এসেছি।” সুরা আরাফ : ১৫৮

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন, তোমাদের জন্যে চূড়ান্ত পূর্ণাঙ্গ আদর্শ- মুহাম্মদ। রেসালতের মধ্যে যেমন তিনি এক, লা-শরিক অর্থাৎ তার যারা আছে তারাও থাকতে পারবে না। কারণ মুহাম্মদ (সা.) সকলের নবুয়ত রিসালত ও কিতাবের ‘নাসেখ’- রহিতকারী।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

“তোমাদের সকলের জন্যে মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ।” সুরা আহযাব : ২১

আর কোনো মানুষ এমন কি পূর্বের নবী রাসুলগণও রাসুলুল্লাহর সামনে আদর্শ নয়। কুরআন আরও বলছে, মুহাম্মদ (সা.) খুলুকে আযিমে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন।

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

“নিঃসন্দেহে তুমি মহান চরিত্রের ওপর রয়েছে” সুরা কালাম : ৪।

আমরা আলোচনায় যাব, মুহাম্মদ (সা.) রামাদ্বান কীভাবে কাটাতেন। রমাদানের ওপর সব বিশুদ্ধ হাদিসে যা বর্ণনা করা হয়েছে- তার বাস্তব নজির রাসুল (সা.)-এর জীবনে সিয়াম সাধনা। তার একটিও ঘাটতি নেই এখানে।

রাসুল (সা.) কীভাবে কাটাতেন শাহারু রামাদ্বান

১. সিয়ামের মাস আসার আগে প্রস্তুতি নিতেন

রাসুল (সা.) রমাদানের পূর্বে শাবানের আগে রজব মাস থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। রজবের চাঁদ উদয় হলে দোয়া করতেন। আল্লাহ যেন রামাদ্বান পর্যন্ত হায়াত লম্বা করে দেন। দুই মাস পূর্ব হতে এ মাসের জন্যে প্রস্তুতি নেয়া থেকে বুঝা যায় আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কতবড় মেহমান কত গুরুত্বপূর্ণ রাহমাত ও নাজাতের মাসের আগমন হচ্ছে।

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

“হে আল্লাহ, রজব ও শাবান মাসকে আমাদের জন্যে বরকতময় কর ও রমাদানের নাজাতের নিকট পৌছে দাও।” বায়হাকী : ৩৫৩৪

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ

আবার শাবানের চাঁদ উদয় হলে নবীজি (সা.) বলতেন, এখন থেকে দিন দিন করে রামাদ্বানকে গণনা কর।" তিরমিযী : ৬৮৭

রমাদানের চাঁদ দেখার সাথে যেন সিয়াম শুরু করা যায়। এখন কেউ একদিন/দুদিন আগে সৌদি আরবের সাথে মিল করে সিয়ামের মাস আসার আগেই সিয়াম শুরু করে। আবার শাওয়ালের চাঁদ আসার আগে সিয়াম ভেঙে ঈদ করার ফিৎনা চালু করার চেষ্টা শুরু করেছে। কোরআন বলছে,

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"তোমাদের মধ্যে যে সিয়ামের মাস যখন পাবে সে তখনই সিয়াম পালন শুরু করবে।"

যে মাসের গণনা শাবান থেকে রাসুল (সা.) শুরু করতে বলছেন। যেন যখন যাদের সামনে সে মাস হাজির হয়, সিয়াম গণনায় কোনো পরিবর্তন বা হেরফের না হয়।

আবার রামাদ্বান শরীফের আগমনের কারণে রাসুল (সা.) শা'বানের চাঁদে লাগতার সিয়াম করতেন। যেন রমাদানের মহড়া। সাহাবিরা বলেন, রাসুল (সা.) রামাদ্বান ছাড়া বেশি সিয়াম পালন করতেন রমাদানের আগের মাস শা'বানে।

وَقَالَتِ عَائِشَةُ (رض) مَا رَأَيْتَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ متفق عليه

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, "রাসুল (সা.)-কে শাবান মাসের মতো এত অধিক ও লাগাতার নফল রোজা রাখতে আমি আর কোনো মাসে দেখি নাই।" বুখারি : ১৯৬৯

আর শাবানের চাঁদে বেশি সিয়াম বিশেষ করে অর্ধ শাবান প্রথম দিকে বেশি রোজা ও শেষে কম করা। রমাদানের চাঁদ দেখে সিয়াম শুরু করা ও শেষ করা।

২. এ মাসে নবীজি (সা.) দিন কাটাতেন সিয়াম সাধনায়

আল্লাহ তায়ালা এ মাসের দিনে সিয়াম ফরজ করেছেন। এমন কোনো জাতি নাই যাদের ওপর কোনো না কোনো ভাবে সিয়াম ফরজ ছিল না। কুরআন বলছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ওপর সিয়ামকে ফরজ করা হয়েছে, তোমাদের পূর্ববর্তী, নবীগণের শরিয়তেও ফরজ করা হয়েছিল- যেন এর মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি হয়।" সুরা বাকারা : ১৮৩

সুবহে সাদেক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় পানাহার ও স্ত্রী সংগম থেকে বিরত থাকাটা সিয়ামের 'দেহ', আর ঈমান ও ইহতেসাব হচ্ছে এর 'রূহ'। রাসুল (সা.)-এর সিয়াম কত সুন্দর ও প্রাণসমৃদ্ধ ছিল এর বর্ণনা করা এক কঠিন বিষয়। সিয়ামের সৌন্দর্য, করণীয় ও বর্জনীয় বিষয় যত হাদিস বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে, সকল কিছু সিয়ামে নববীতে ষোল কলায় বিদ্যমান ছিল। যেমন-

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"যে ব্যক্তি রমাদানের রোজা পালন করবে ঈমান ও চেতনাসহ তার সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।" বুখারি : ২০১৪

রাসুল (সা.)-এর সিয়াম ছিল "ঈমানে কামিল ও কঠোর ইহ্তিসাব সহকারে" এটিকে বুঝাবার ভাষা নেই। তাঁর ঈমান কত পরিপূর্ণ এবং প্রতিটি মুহূর্ত ছিল হিসাব ও নিকাশের তীব্র চেতনা সহকারে। এক মুহূর্ত সময়ও অবচেতন ও গাফলতিতে কাটেনি, সিয়ামের কঠোর সাধনায় কটেছে–

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَبَهُ

"যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা, অন্যায় আমল থেকে বিরত থাকেনি তার পানাহার বর্জন আল্লাহর কী প্রয়োজন?" বুখারি : ৬০৫৭

হাদিসে-রাসুলই নবীজির মানদণ্ড। তাঁর জিহ্বা কতটুকু সংযত ছিল ও প্রত্যেকটি অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ সিয়ামরত অবস্থায় নিয়ন্ত্রিত ছিল- কেমনভাবে তার বর্ণনা দেব, কীভাবে দেব জানিনা। মা আয়েশা এক হাদিসে বলেন যা তিরমিযী গ্রহণ করেছে, নবী (সা.) সাধারণত "বেশি সময় চুপ থাকতেন না।" কিন্তু রমাদানে রাসুল (সা.) একান্তভাবে নীরব থাকতেন, বেশি প্রয়োজন নাহলে বাক্যব্যয় করতেন না। যিকির ও ফিকিরে তাঁর সময় কাটত। তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ থাকতো কঠোর নিয়ন্ত্রণে। এটা যে সংযমের মাস তা নবী (সা.)-এর প্রতিটি আচরণে ও পদক্ষেপে প্রকাশ পেতো। সিয়ামকে যে উদ্দেশ্যে ফরজ করা হয়েছে,

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

"তাক্বওয়ার গুণ অর্জন করার জন্যে।" সুরা বাকারা : ১৮৩

রাসুল (সা.)-এর সিয়ামের প্রতিটি মুহূর্ত যেন কঠিন তাক্বওয়ার প্রশিক্ষণ। এমনিতে তিনি মুত্তাক্বীদের ইমাম। কিন্তু রমাদানে রাসুলে জীন্দেগী যেন পরিণত হতো জীবন্ত এক চলমান তাক্বওয়ার ঝর্ণাধারায়। তার চলনে-বলনে, চাহনিতে ঝরে পড়ে খোদা- ভীতির কম্পন। সিয়ামে যেহেতু নফসের দাবীকে বারবার প্রত্যাখ্যান করতে হয়, সে খেতে চায়, আরাম করতে চায় ও স্ত্রীর কাছে যেতে চায়। কিন্তু সিয়াম বাধা দেয়। তাই নফসের সাথে এক যুদ্ধ লেগেই থাকে। অনেকে আবার নফসের কাছে পরাজিতও হয়। কিন্তু রাসুল (সা.)-এর সিয়াম সাধনায় আমরা দেখব: الصِّيَامُ جُنَّةٌ নবীর একথার বাস্তব উদাহরণ। তাঁর সিয়াম যেন কঠিন বর্ম। মন্দ কোনো কিছু তাকে আঘাত করলে সিয়ামেরই কঠিন বর্মই বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তিনি যেন শুধু বলেন, اِنِّىْ صَائِم আমি রোজাদার, বুখারি : ২০১৪।

রাসুলে সাথে অবস্থান করার কারণে একমাত্র তার 'নাফসুল আম্মারা' নিষিদ্ধ বিষয়ে তাকে জ্বালাতন করে না। সর্বাবস্থায় আল্লাহর বিধান পালনে অনুগত থাকে। কুরআন যেমন বলে,

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً

"হে প্রশান্ত নফসুল মুত্মায়িন্নাহ। তুমি তোমার প্রভুর দিকে এমনভাবে ফিরে যাও, যেন তুমি তার ওপর সন্তুষ্ট আর তিনিও তোমারও পর সন্তুষ্ট।" সুরা ফজর : ২৭

৩. রাসুল (সা.) রাত কাটাতেন কিয়ামুল্লাইলে

সারাজীবন রাতের শেষে তিনি জাগ্রত থাকতেন। তাহাজ্জুদ ছিল তাঁর ওপর অতিরিক্ত সালাত। কুরআন বলছে,

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا

ঘুম হতে উঠে রাতে সালাত পড়বে, এটি তোমার জন্য অতিরিক্ত সালাত আশা করা যায় এটির মাধ্যমে তোমার জন্য 'মকামে মহমুদ' প্রতিষ্ঠিত করবেন।" সুরা ইসরা : ৭৯

হযরত আয়েশো (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, রাসুল (সা.) রাতে কখন

উঠতেন?

قَالَتْ عَائِشَةَ (رض) كَانَ يَقُوْمُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخِ

তিনি বলেন, "মোরগের প্রথম ডাকের সাথে রাসুল (সা.) রাতে উঠে যেতেন' ৮ রাকাত সালাতে এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াতেন যে, তার পা মুবারক ফুলে যেতো- যদিও আল্লাহ তায়ালা তার সামনের পিছনের গুনাহ মাফ করার ঘোষণা দিয়েছেন।" বুখারি : ৬৮৬১

হাদিস শরীফে রয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَرَمَ قَدْ مَاهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ : قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلَا كُوْنَ عَبْدًا شَكُورًا

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন শেষরাতে দাঁড়াতে গিয়ে নবী (সা.)-এর পা মুবারক ফুলে যেতো। এত কেন কষ্ট করেন, আপনার সামনের ও পিছনের গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। এর জবাবে তিনি বলতেন, "আমি কি শোকরগুজার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবো না।" বুখারি : ২৮১৯

এ ছিল নবীজি (সা.)-এর দৈনন্দিন জীবনের কর্মসূচি। কিন্তু মাহে রমাদানের রাত কীভাবে কাটাতেন, সহজেই বুঝা যায়। হাদিসের বর্ণনায় দেখা যায়, রাসুল (সা.) রমাদানের রাতে সামান্যই ঘুমাতেন আর বলতেন, তোমরা সেহেরি খেয়ে রোজাকে সাহায্য কর, আর দুপুরের সামান্য ঘুম দিয়ে রাতে আনিদ্রাকে সাহায্য কর।" রাসুল (সা.) রাতের 'কিয়ামুল্লাইল'ও ছিল ঈমান ও তীব্র অনুভূতিসহ। এ তীব্র অনুভূতি ইহতেসাব ছাড়া রাতের জাগরণকে তিনি অর্থহীন রাত জাগরণ বলেছেন।

قَالَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذنبه

"পরিপূর্ণ ঈমান ও ইহতেসাবের অনুভূতিসহ যারা রমাদানের রাত জাগরণ করবে তাদের অতীত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।" বুখারি : ১৮০৫

অচেতন ও গাফেলদের সিয়ামকে নবীজি (সা.) বলেন, উপবাস ও অনাহারের কষ্ট আর অনুভূতিহীন রাত জাগরণকারী যেন অনিদ্রার কষ্ট করে।

قَالَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الظُّلْمَا وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِه إِلَّا الشَّهْر

"নবী (সা.) বলেন, অনেক সিয়াম পালনকারী সিয়ামের নামে উপবাস করে মাত্র, আর অনেকে কিয়ামুল্লালের নামে শুধু অনিদ্রার কষ্ট ভোগ করে।" ইবনে মাজাহ : ১৬৯০

ইশার সালাত শেষে তারাবিহর সালাত ৮, ২০ আরও বেশি পড়তেন। তবে নিজেই আদায় করতেন। রসুল (সা.) কোন বিষয় বির্তক মনে হলে, একাধিক হাদিসে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ মনে হলে ফকিহদের অভিমত হলো: এর সমাধানের জন্য সাহাবাদের আমল দেখতে হবে। রাসুল (সা.) বলেছেন, "আমার ও আমার খোলাফায়ে রাশেদগণকেও সুন্নাহর দলীল হিসেবে গ্রহণ করো।" তিরমিযী : ২৮৯১

সকল অবস্থায় নবীজি (সা.)-কে অনুসরণ, অনুকরণ করতে হবে। আবার কখনও ভিন্নতাও রয়েছে। যেমন রাসুল বিদায় হজ্বে কিরান হজ্ব করলেন, কিন্তু সাহাবিদের বলে দেন, "তোমরা হজ্বে তামাত্তু কর।" ইমাম আহমদ (র.) এ কারণে "তামাত্তুকে শ্রেষ্ঠ হজ্ব" বলেছেন। কওলী হাদিস ফেলীর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সওমে বেচাল থাকতেন কিন্তু উম্মতকে নিষেধ করেছেন। যাক, হযরত উমার (রা.) উবাই ইবনে কাবের ইমামতে ২০ রাকাত তারাবিহ পড়ার যে প্রচলন করেছেন, মক্কা ও মদীনার দুই হেরেমে তা অদ্যাবধি চলছে- এটিই সুন্নাহ। হযরত ওমর (রা.)-কে যে বেদায়তী বলে, সে ব্যক্তি যে বেদায়ত ও পথভ্রষ্ট তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

নবীজি (সা.) সামান্য নিদ্রার পর তাহাজ্জুদের আট রাকাত সালাত দীর্ঘ সুরা সহ পড়তেন। আম্মাজান আয়েশা (রা.) বলেন, রাসুলে তাহাজ্জুদের সালাত কতসুন্দর আমাকে প্রশ্ন করোনা- তা দীর্ঘ, দীর্ঘ এবং অতি দীর্ঘ 'তাওয়া'লাতান, তাওয়া'লাতান, তাওয়া'লাতান।' বুখারি : ৩৫৬৯

বলা যায়, সেহেরি পর্যন্ত সালাত আদায় করতেন। তবে উম্মাতের প্রতি তার নসিহত সাধ্যানুসারে অর্থাৎ বয়স্ক, অসুস্থ ও দুর্বলদের জন্য সাধ্যের অতিরিক্তি নয়, রাত জাগরণ করতে। হাদিস বলছে,

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِه

রাসুল (সা.) বলেন, "আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর সিয়ামুন্নাহার ফরজ করেছেন, আমি কিয়াসুল্লাইলকে তোমাদের জন্য সুন্নাহ হিসাবে সাব্যস্ত করেছি, যারা ঈমান ও তীব্র চেতনার সাথে দিনে সিয়াম ও রাতে কিয়াম করবে সে গুনাহ হতে এভাবে নিস্পাপ হবে যেমন এখনই সে জন্ম নিল।" নাসায়ী : ২২১০

প্রিয় পাঠক, সিয়ামকে আল্লাহ যেমন দিনে ফরজ করেছেন, রাসুল (সা.) কিয়াম তথা জাগরণকে উম্মতের জন্য জরুরী করেছেন। সুতরাং তিনি কীভাবে রাত জেগেছেন আদৌ রমাদানের রাতে ঘুমিয়েছেন কি না উম্মাহকে ভাবতে হবে। অনেককে দেখা যায় রমাদানে সংযমী না হয়ে অসংযমী হয়ে পড়ে। দিনে যা খায়নি রাতে তার দ্বিগুণ খায়। আর রাতে ও দিনে ঘুমায় শুধু ঘুমায়। এমনকি সালাতও ছুটে যায়। মাহে রমাদানের বরকতপূর্ণ সময়ে যখন একটি নফল ইবাদত ফরজ তুল্য সাওয়াব জেনেও যার অলসতার নিদ্রা ভাঙলো না, তার জাগবার সময় জীবনে কখন আসবে জানিনা। আগামী রামাদ্বান জীবনে আসবে এ কথার নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবে না। জীবন থেকে গুনাহ ও অপরাধের বিদায় না করে রামাদ্বানকে যে বিদায় দিল, রাসুল (সা.) ও জিব্রাঈলের অভিশাপ তার ওপর। আল্লাহ। আমাদেরকে রমাদানে রাত জাগরণকারী ও ক্রন্দনশীলদের মধ্যে শামিল করেন।

৪. রাসুল (সা.) এ মাসে সর্বাধিক কুরআন তিলাওয়াত করতেন

আল্লাহ তায়ালা এ মর্যাদাবান মাসটির পরিচয় দিয়েছেন কুরআনের মাস হিসেবে। এ মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنَ

"এই সে মাস, যে মাসে আল কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।" সুরা বাকারা : ১৮৬

ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে একটি হাদিস নিয়েছেন- যেখানে দেখা যায়, আল্লাহ তায়ালা বড় বড় আসমানী কিতাবসমূহ সবটি এ মাসে নাযিল করেছেন। ৬ রামাদ্বান 'তাওরাত' মুসা (আ.)-এর ওপর, ১২ রামাদ্বান 'ইঞ্জিল' ঈসা (আ.)-এর ওপর, ১৮ রামাদ্বান 'যবুর' দাউদ (আ.)-এর ওপর এবং ২৭ রামাদ্বান 'কুরআন' মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর নাযিল করেছেন।

রাসুল (সা.) রাত কাটতো কুরআন তিলাওয়াতে। দীর্ঘ তারাবির সালাতে তিলাওয়াতে কুরআন, এরপর কিয়ামুল্লাইলে অনেক বেশি কুরআন

তিলাওয়াত, এরপর তাহাজ্জুদের সালাতে অনেক তিলাওয়াত। বলতে গেলে সারা রাত শুধু কুরআন তিলাওয়াত। নবী (সা.) বলেন, কুরআন যার নিদ্রা হারাম করে দিয়েছে সে কুরআনই তার জন্যে কিয়ামাতে গ্রহণযোগ্য সুপারিশকারী হবে।

عَنْ بْنِ عُمَرِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُولُ الصِّيَامُ أَىْ رَبِّ إِنِّىْ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ

"ইবনে ওমর (রা.) রাসুল (সা.) হতে বর্ণনা করেন, কিয়ামাতের দিন 'সিয়াম ও কুরআন' আল্লাহর নিকট বান্দার জন্যে সুপারিশ করবে। সিয়াম বলবে, হে প্রভু! আমি এ বান্দাহকে দিনে পানাহার ও স্ত্রীগমন থেকে বিরত রেখেছিলাম। তারপক্ষে আমার সুপারিশ কবুল কর। আর কুরআন বলবে, হে প্রভু! আমি এ বান্দাহকে রাতে ঘুমাতে দিই নাই, তার পক্ষে আমার সুপারিশ মঞ্জুর কর, উভয় সুপারিশ গৃহিত হবে।" সুনানে আহমদ : ৬৬২৬

এ পবিত্র কুরআনের মাসে মুহাম্মদ (সা) সমস্ত কুরআন জিব্রাইল (আ.)-কে শুনাতেন এবং তাঁর থেকেও শুনতেন হাদিসে এমন বক্তব্য এসেছে। এ মাসে নবী (সা.) বেশি কুরআন তিলাওয়াত করতেন, আবার সালাতের মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ রাতই তিলাওয়াতে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এমনকি পা মুবারক ফুলে যেতো। এ মাসে কুরআন শুনতেন ও শুনাতেন। কুরআন রাসুল (সা.)-এর জীবনে এভাবে একাকার হয়ে গিয়েছিল যে, 'তিনিই যেন চলমান কুরআন'। হযরত আয়েশা (রা.)-কে নবীজি (সা.)-এর জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন,

حِينَ سُئِلَتْ كَيْفَ كَانَ خُلُقِهِ قَالَتْ عَائِشَةَ كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ

"কুরআনই মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন ও চরিত্র।" মুসলিম : ৭৮৬

সাহাবায়ে কিরাম পরবর্তী বুজুর্গ ব্যক্তিবর্গের জীবন আমরা আলোচনায় দেখি তারা রমাদানে কুরআন তিলাওয়াতকে বেশি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। ইমাম আবু হানিফা ফিকহার মজলিস বন্ধ করে তিলাওয়াতে মগ্ন হতেন। দিনে এক খতম, রাতে এক খতম ও তারাবিহতে এক খতম মোট ৬১ বার খতম করতেন।

ইমাম মালিক-এর জীবনে দেখেছি রামাদানে হাদিসের দরস বন্ধ থাকতো। ইমাম বুখারির জীবনে পড়েছি রমাদানে হাদিসের মজলিস বন্ধ করে দিতেন। অনুরূপভাবে সলফে সালেহীনরা রামাদ্বানকে দিনে ও রাতে তিলাওয়াতের মধ্যে মগ্ন থাকতেন। আমাদের জীবনে অনেকে হয়তো কুরআনকে সেভাবে গ্রহণ করতে পারবো না। কিন্তু অধিক ও যথাসাধ্য বেশি কুরআন তিলাওয়াত, কুরআন বুঝে অধ্যয়নের মধ্যে কাটানোর কঠোর সাধনায় মগ্ন হওয়া উচিত।

৫. এ মাসে নবীজি (সা.) উজাড় করে দান সাদাকা করতেন

রামাদ্বান মাসকে নবী (সা.) বলেন,

وهُوَ شَهْرُ الْمَوَاسَاةِ

"এটি সহানুভূতি প্রকাশের মাস।" বায়হাকী : ৩৩৩৬

এ মাসে উপবাস সবার জন্যে বাধ্যতামূলক। তাই অনাহারের কী যাতনা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন পড়ে না। সমাজের বেশির ভাগ মানুষ অভাবী। অর্ধাহারে, অনাহারে যাদের জীবন কাটে তাদের প্রতি রামাদ্বান নিয়ে এসেছে সাহায্য ও সহানুভূতির বার্তা। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "রাসুলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের মধ্যে বেশি দানশীল ছিলেন। তবে রমাদানে নবীজি (সা.)-কে দুহাত উজাড় করে দান করতে দেখেছি।" আহমদ

"এমনিতে এ মাসের এক নফল আমল ফরজের সমান আর এক ফরজ আমল সত্তর ফরজের সমান।" বুখারি : ৩২২০

তাই এ মাসের এক টাকা দান করা অন্য মাসের লাখ টাকা দানের চেয়েও বেশি সাওয়াব। যেহেতু লাখ লাখ নফল একত্র করলে এক ফরজের সমান হবে না। এ মাসের জাকাত সত্তরগুণ বেশি সাওয়াব। এ মাসের মধ্যে গরীবদের মধ্যে ফিতরা দিতে বলা হয়েছে। যাতে তারাও ঈদের আনন্দে অংশ নিতে পারে। নবী (সা.) বলেন,

قَالَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَوَاةِ الْفِطْرِ : طَهَارَة الصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَرَّفَتِ وطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ

"ফিতরা দাও, তা তোমাদের রোজার ত্রুটি বিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ এবং গরীবদের জন্যে রিজকের ব্যবস্থা।" আবু দাউদ : ১৬০৯

ইফতারি দান করার ফজিলাত বর্ণনা করে নবী (সা.) সামার্থ্যবানদেরকে এ ব্যাপারে সহানুভূতির হাত প্রসারিত করেছেন ও উম্মাহকে উপদেশ দিয়েছেন,

قَالَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَطَرَ فِيْهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوْبِه وَعِتْقُ رَقَبَتِه مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَه مِثْلُ أَجْرِه

"যে কেউ কোনো রোজাদারকে ইফতার দেবে ১) তার গুণাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে ২) জাহান্নাম থেকে মুক্ত করা হবে ৩) একটি পূর্ণ কবুল হওয়া রোজার সাওয়াব দেয়া হবে।" তিরমিযী : ৬৬৩

হাদিসে রাসুল (সা.) যে ফজিলত বর্ণনা করেছেন তাতে স্বাভাবিকভাবে বুঝা যায় এ মাসে জাকাত প্রদান বেশি কল্যাণপ্রদ। আবার দরিদ্র জনগোষ্ঠী ঈদকে উপভোগ করার সুযোগ করে দেয়ার সাওয়াবও লাভ হবে।

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةُ رَمَضَانَ

"দানের মধ্যে রমাদানের সাদাকা বেশি সাওয়াবের।" তিরমিযী : ৬৬৩

নবীজি (সা.) এ মাসকে দান সাদাকার মাস ঘোষণা করেছেন। নিজে দুই হাতে দান করেছেন উম্মার জন্যে রেখেছেন আদর্শ। আমরাও যেন রমাদানে বেশি দান সাদাকা করি। দরিদ্র ও অনাহারীকে সহানুভূতি দেখাই। চাকরদের প্রতি বেশি দয়া সহানুভূতি প্রদর্শন করি।

৬. রামাদ্বানের প্রতিটি মুহূর্ত তিনি ইবাদাতে কাটাতেন

যে রমাদানের জন্যে রাসুল (সা.) রজব মাস থেকে প্রস্তুত হতেন, সে রামাদ্বানকে কত Seriously তিনি গ্রহণ করতেন সহজেই বুঝা যায়। নবীজি (সা.) বলেন, "ইসলামী জিন্দেগীর সৌন্দর্য হলো অপ্রয়োজনীয় কথা ও কাজ বর্জন করা।" মুমিনদের বৈশিষ্ট্য :

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

"যারা অর্থহীন কথা-কাজ এড়িয়ে চলে।" সুরা মুমেনুন : ৩

রাসুলে জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্যসমূহের একটি তা। তার জীবনে অপ্রয়োজনীয় কিছু থাকাতো দূরের বিষয়, যার জীবনের প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি ইঙ্গিত, প্রতিটি পদক্ষেপ প্রতিটি নির্দেশ ইসলামের বিধান, শরীয়তের দলীল। কুরআন বলছে,

يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِينًا

"হে মানবমণ্ডলী, তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট দলীল মুহাম্মদ (সা.) এসে গেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি উজ্জ্বল জ্যোতি 'আল কুরআন'।" সুরা নিছা: ১৭৪

প্রায় সকল তাফসীরকারগণ মুহাম্মদ (সা.)-কে 'বুরহান' সুস্পষ্ট দলীল বলেছেন।

নবীজি (সা.)-এর হাদিস বলে দিয়েছেন- রমাদানের এক একটি মুহূর্তের মধ্যে বছরের পর বছর ঘুমিয়ে রয়েছে।

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَقَرَّبَ فِيْهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ اَدَّىٰ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ

"নবী (সা.) বলেন, "রামাদ্বান সে বরকতপূর্ণ মাস- যে মাসের একটি সাধারণ নফল ইবাদাতের মূল্য এক ফরজ ইবাদাতের মতো।" বায়হাকী : ৩৩৩৬

একবার 'সুবহানাল্লাহ'র যিকির করতে এক সেকেন্ড সময় লাগে। ধরুন, এ রকম কোটি কোটি নফল যিকিরের সাওয়াবের যোগফল একটি ফরজ ইবাদাতের চেয়ে অনেক কম। সুতরাং রমাদানে সময় এত দামী ও বরকতময় যে, নবীজি (সা.) এক মুহূর্ত সময় কাজে লাগাবেন না এটি কল্পনা করাও যায় না। রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতিটি সময়ের ক্ষণ আল্লাহর ইবাদাতে কাটতো। সাহাবিদের বর্ণনায় ও উম্মেহাতুল মুমিনদের থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রমাদানের সময় অস্থিরভাবে কাটাতেন- দাওয়াত, তিলাওয়াত, নফল সালাত, ফিকির ও যিকিরে, দান-সাদাকাতে এমনকি দ্বীন বিজয়ের যুদ্ধের জন্যেও রামাদ্বানকে রাসুল (সা.) গুরুত্বপূর্ণ সময় হিসেবে বিবেচনা করতেন। দিনের চাইতেও রমাদানে রাতে বেশি অস্থির ও বেশি নিবেদিত। কুরআনই নবীকে (সা.) বলে-

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ

"অতঃপর যখনই তুমি ব্যস্ততা হতে অবসর পাবে তখনই তুমি তোমার প্রভুর দিকে বন্দেগীতে নিবিষ্টভাবে লেগে যাও।" সুরা ইনশেরাহ: ৭-৮

আগেই বলেছি, নবীজি (সা.)-এর জীবনের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় কথা ও কাজের অস্তিত্ব নেই। তবে রমাদানের সময়ে ইবাদাতের প্রতি নবী (সা.)-এর অস্থিরতা এত বেশি থাকতো যা অন্য মাসে এমন দেখা যেতো না।

৭. রাসুল (সা.) ইফতারের সময় গুনাহ মাফ চাইতেন

সারাদিন রোজার উপবাস ও ইহতিসাবপূর্ণ সিয়াম সাধনা শেষে ইফতারের সময়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়তেন নবীজি (সা.)। রোজাদারের জন্যে এটি যেন একটি আনন্দঘন মুহূর্ত। নবী (সা.) বলেন,

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ

"নবী (সা.) বলেন, রোজাদারের জন্যে দুটি সময় বেশি আনন্দের। একটি ইফতারের মুহূর্তে অপরটি আল্লাহর সাক্ষাতে যখন রোজার বিনিময় গ্রহণ করবে।" মুসলীম: ১১৫১

রাসুল (সা.) সূর্য অস্তের সাথে ইফতার করতেন যখন অস্তের লালিমা দেখা যেতো। ইদানীং কেউ কেউ 'সহীহ্ তরিকা'য় ইফতারের নামে সূর্য পূর্ণভাবে অস্তমিত হওয়ার পূর্বে, কিছু বাকি থাকতে ইফতার চালু করতেছে শুনা যায়। এটি সম্পূর্ণ গলদ তরিকা। সূর্য পূর্ণভাবে অস্তমিত নাহলে রোজা ভাংবার কোনো অনুমতি হাদিসে নেই। এ বিষয়ে ইমামে আরবার এটিই রায়। ইসলামের সকল বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টির একটি দুঃখজনক প্রবণতা কিছু ভাইদের মধ্যে লক্ষ্যণীয়।

নবী (সা.) বিলম্ব করে ইফতার করা অপছন্দ করতেন বরং তা ইয়াহুদ ও নাসারাদের পদ্ধতি। হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন,

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ الدِّيْنُ ظَاهِرًا مَاعَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يُؤْخِرُونَ

"হযরত আবু হোরায়রা (রা.) রাসুল (সা.) হতে বলেন, দ্বীন ততদিন গালেব থাকবে, যতদিন উম্মতে মুসলিমা দ্রুত ইফতার করার সুন্নাত আমল করবে, ইয়াহুদ ও নাসারাগণ দেরিতে ইফতারকারী।" ইবনে মাজাহ: ১৬৯৮

এ বিষয়ে তাদের মধ্যে অনুভূতি আসা উচিত, যারা এ ব্যাপারে গাফেল ও বিলম্বে ইফতার একটু ভালো মনে করেন।

নবী (সা.) একাকী নয়, হয় পরিবারের সদস্যদের সাথে বা সাবাহীদের জামাতে ইফতার করতেন। ইফতার বিতরণের ব্যাপারে অন্যদেরও উপদেশ দিতেন ও নিজে অন্যদের ইফতারির ব্যবস্থা করতেন।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَطَّرَ فِيْهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لِذُنُوْبِهِ وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ

"নবী (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি এ মাসে কোনো রোজাদারকে ইফতার করাবে- তার সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে, তাকে জাহান্নাম হতে মুক্ত করা হবে তাকে একটি পূর্ণ মকবুল রোজার সাওয়াব দেয়া হবে।" ইবনে মাজাহ : ১৭৪৬

ইফতার সামনে নিয়ে রাসুল (সা.) আগেভাগে বসতেন নাড়াচাড়া করতে বলতেন, "ইয়া ওয়াসেয়াল মাগফিরাতু ইগফেরলী।" 'হে প্রশস্ত মার্জনাকারী, আমাকে মার্জনা করো।"

ইফতারের সময় বান্দার প্রার্থনা আল্লাহ তায়ালা শ্রবণ করেন, সে সময় আল্লাহ বান্দার প্রতি করুণা ও দয়ার্দ্র থাকেন। তাই নবীজি ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। আমাদেরকেও ক্ষমা প্রার্থনার হাত প্রসারিত করা প্রয়োজন।

নবী (সা.) ইফতার গ্রহণ করার সময় বলতেন,

عَنْ مُعَاذِرِ بْنِ ذَهْرَةَ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا أَفْطَرَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

"প্রভু, তোমার জন্যে সিয়াম করেছি, তোমার দেয়া রিজক থেকে ইফতার গ্রহণ করেছি।" আবু দাউদ: ২৩৫৭

ইফতারের পূর্ব হতে ইফতার শেষ পর্যন্ত এ মুবারক সময়টা রোজাদারদের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবেগঘন ও প্রভুর নৈকট্য লাভের সময় হিসেবে বিবেচিত। রাসুলের অনুসরণে আমরাও ইফতার পূর্ব ও ইফতার গ্রহণকে পূণ্যময় করে তুলতে পারি। আমীন।

ইফতার করার সময় খুরমা দিয়ে শুরু করা নবীর সুন্নাত।

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمَرٍ فَإِنَّه بَرَكَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمَرًا فَالْمَاءُ فَإِنَّهُ طَهُور

"তোমাদের মধ্যে রোজাদার ব্যক্তি যেন খুরমা দিয়ে ইফতার করে- তাতে রয়েছে বরকত, যদি না পায় তবে পানি দিয়ে ইফতার করবে। কারণ তা পবিত্র।" তিরমিযী: ৮৫৬

৮. রাসুল (সা.) সেহেরি গ্রহণ করতেন দেরি করে

সেহেরির সময়টি রাতের যখন আর তিন ভাগের এক অংশ বাকি থাকে তখন উত্তম। ২৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান সময় কোনটি? রাসুল (সা.)-কে প্রশ্ন করা হলো, তিনি বলেন, جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ "রাতের শেষাংশে"। সাহাবি আমর ইবনুল আবাসা (রা.) আবার জিজ্ঞাসা করেন, শেষ অংশ কখন হতে? নবীজি (সা.) বলেন, "চুলুচুল লাইলিল আখের"- "রাতের যখন আর তিন ভাগের এক ভাগ বাকি থাকে।" আহমদ

সব সময় বান্দারা আল্লাহকে ডাকে। কিন্তু এ সময়ে আল্লাহ তায়ালা

বান্দাহকে ডাকেন। আর বলেন, "আমার নিকট দোয়া করার কেউ আছ? আমি কবুল করতে প্রস্তুত, আমার নিকট কোনো কিছু চাওয়ার কেউ আছ? আমি ক্ষমা করতে এসেছি।" বুখারি : ১১৪৫

এ সময়ে জাগ্রত থেকে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করা রাসুলের (সা.) ছিল বাধ্যতামূলক। কুরআন বলছে,

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ، عَسى اَنْ يَّبْعَثَكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا

"রাতের শেষাংশে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় কর। এটি তোমার জন্যে অতিরিক্ত সালাত। আশা করা যায়, তোমার প্রভু এর দ্বারা তোমাকে প্রশংসিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবেন।" সুরা ইসরা : ৭৯

এ সময় রাসুল (সা.) সেহেরি গ্রহণ করতেন ও মুনাজাতের হাত উঁচু করে বক্ষ পর্যন্ত উঠাতেন। وَيَدَاهُ إِلَى صَدْرِهِ "ওয়া ইদাহু ইলা সাদরিহি" এবং ফজর পর্যন্ত ক্রন্দন করতেন। আল্লাহ প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় কুরআন বলছে,

الصّبرِيْنَ وَالصَّدِقِيْنَ وَالْقنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْأَسْحَارِ

"যারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, বিনয়ী, দানশীল ও শেষ রাতের ক্রন্দনশীল।" সুরা আলে ইমরান : ১৭

রমাদানের শেষ রাতের এ আহার, যাকে সেহেরি বলা হয়, এতে রয়েছে কল্যাণ।

قَالَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَةً

"তোমরা সেহেরি গ্রহণ কর, তাতে রয়েছে বরকাত।" বুখারি : ১৯২৩

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِين

নবী (সা.) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সেহেরি গ্রহণকারীদের ওপর রহম করেন এবং ফিরিশতাগণ তাদের জন্যে দোয়া করেন।" তিবরানী : ৬৪৩৪

নবীজি (সা.) বলেন, "সকল নবীর শরিয়তে সিয়ামের বিধান ছিল। কিন্তু সেহেরির বিধান ছিল না। এটি উম্মতে মুহাম্মদীর (সা.) জন্যে খাস পদ্ধতি।" উম্মাতকে সেহেরি গ্রহণ করার উপদেশ দিতে গিয়ে নবী (সা.) বলেন–

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَعِنْ بِطَعَامِ السِّحْرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ، وَبِقَيْلُوْلَةِ النَّهَارِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ

নবীজি (সা.) বলেন : "তোমরা সেহেরির মাধ্যমে দিনের সিয়ামকে আর কায়লুলার মাধ্যমে তাদের জাগরণকে সাহায্য কর।" ইবনে মাজাহ : ১৬৯৩

আমরা এ বরকাতপূর্ণ সেহেরির ইবাদত গ্রহণ করব। আর রাসুল সেহেরি করতেন দেরি করে। এরপর ফজরের সালাতের জন্যে অল্প সময়ের ব্যবধানে প্রস্তুতি নিতেন

قَالَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَنَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَّا عَجَّلُوا الْفِطْرَ وَآخَّرُ وَالسُّحُورَ

"যে পর্যন্ত আমার উম্মত দ্রুত ইফতারি গ্রহণ করবে ও বিলম্বে সেহেরি খাবে সে পর্যন্ত তারা কল্যাণের মধ্যে অবস্থান করবে।" তাবরানী : ২১৫১৩

৯. রমাদানের শেষ দশক রাসুল (সা.) এতেকাফ করতেন

রাসুল (সা.) সারা জীবন রমাদানের শেষ দশ দিন এতেকাফে থাকতেন। সাহাবিদের অনেকে ও উম্মেহাতুল মুমেনীনেরাও এতেকাফ করতেন। পুরুষদের ন্যায় নারীদেরও এ বরকতপূর্ণ ইবাদতে অংশ নেয়ার সুযোগ রয়েছে। নারীগণ গৃহের কোণে এতেকাফ করতে পারবেন পুরুষগণ জামে মসজিদের মধ্যে এতেকাফ করবেন।

২০ রামাদ্বান সূর্যাস্ত হওয়ার পূর্বে ইতেকাফকারীগণ প্রয়োজনীয় বিছানাপত্র, থালাবাটি, বইপুস্তকসহ মসজিদে ইতেকাফের নিয়াতে অবস্থান নেবে। প্রাকৃতিক প্রয়োজন ও খাওয়া-দাওয়ার প্রয়োজনে মসজিদের বাইরে গেলেও তাড়াতাড়ি কাজ সেরে চলে আসবে। বিনা জরুরতে মসজিদের সীমা অতিক্রম করলে ইতেকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। ইতেকাফকারীগণ সবকিছু মসজিদে থেকেই করতে হবে।

নবীজি (সা.) এতেকাফ করতেন বিশেষ করে লাইলাতুল কাদরের অন্বেষণে:

قَالَتْ عَائِشَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرُّوا لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي الْوَتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانِ

"তোমরা রমাদানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে লাইলাতুল কদর তালাশ কর।" বুখারি : ২০১৭

কেউ বলেন, তা একটি নির্দিষ্ট রজনী, অপরিবর্তনীয়। তবে রমাদানের শেষ দশকের ২১-২৯ রমাদানের বেজোড় রাতে রয়েছে। কোনো কোনো ফকিহ্ বলেন, বেজোড় রাতগুলোর মধ্যে তা আবর্তিত হয়। তবে এটি ২৭ রমাদানের রাত, যে ঐতিহাসিক রাতে কুরআন নাযিল হয়েছে।

إِنَّا أَنْزَلْنهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَكَ مَا لِيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

"আমি এ কিতাব নাজিল করেছি মর্যাদাপূর্ণ এক রাতে। তুমি কি জানো সেই রাতটি কি? সে মহান রজনী এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।" সুরা ক্বদর : ১-৩

হাদিসের ২১শের রাত, ২৩শের রাত আবার ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় নবীজি (সা.) বলেন, ২৫, ২৭, ২৯ এর মধ্যে ক্বদর রয়েছে। বুখারি : ২০২১

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এক বৃদ্ধ রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আমার পক্ষে প্রত্যেক বেজোড় রাত জাগরণ কঠিন। হে রাসুল (সা.) আমাকে কাদরের রাত সম্পর্কে বলুন।' তুমি ২৭ তারিখ রাতকে আঁকড়ে থাক। আবু দাউদ : ১৩৮৬

আমাদের উচিত এতেকাফের মাধ্যমে লাইলাতুল কদর পাওয়াকে নিশ্চিত করা। নিদেন পক্ষে শেষ দশকের বেজোড় রাতকে কদরের রাত হিসেবে জাগরণ করা জরুরী। নবীজি (সা.) বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"যারা পরিপূর্ণ ঈমান ও যথার্থ অনুভূতি সহ লাইলাতুল কদরের রাত জাগরণ করবে তাদের জীবনের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।" বুখারি : ১৯০১

সিয়াম সাধনা, কিয়ামুল্লাইল-এর মত ক্বদরের রাতেও শর্ত একটাই ঈমান ও ইহতেসাব। হিসাব নিকাশ ও তীব্র অনুভূতির দহন ছাড়া কোনো কল্যাণ লাভ সম্ভব নয়। ইতেকাফ বান্দাদেরকে জাহান্নাম থেকে অনেক দূর নিয়ে যাবে।

قَالَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ بَيْنَ النَّارَ ثَلاثَ خَنَادِقَ

"একদিনের এতেকাফ বান্দাকে জাহান্নাম থেকে তিন খন্দক দূরে নিয়ে যাবে।" তিবরানী : ৬৬২

এক খন্দক আসমান জমিনের দূরত্বের সমান। জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের জন্যে ইতেকাফ কত গুরুত্বপূর্ণ এক ইবাদত যা হতে হবে রমাদানের ভিতর। তাই নবী (সা.) কখনও শেষ দশকের ইতেকাফ ত্যাগ করেননি।

১০. রাসুল (সা.) এতেকাফ কীভাবে সময় কাটাতেন

আগেই আলোচনায় এসেছে, রাসুল (সা.) পরিকল্পিতভাবে ইবাদাতের কঠিন রিয়াজতের মধ্যে রমাদানের দিনের সিয়াম ও রাতের কিয়াম করতেন। কিন্তু শেষ দশক এসে গেলে নিজের ঘর ছেড়ে আল্লাহর ঘরে চলে আসতেন। স্ত্রী-পরিজনের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে শুধু আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি ও তারই ইবাদাতে সবচেয়ে বেশি নিবেদিত হয়ে পড়তেন।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ لاَ وَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِه

হযরত আয়েশা হতে বর্ণিত, রাসুল (সা.)-কে রমাদানের শেষ দশকে ইবাদাতে যত কঠোর ও নিবেদিত দেখেছি এমনটি অন্য কোনো সময় দেখিনি।" মুসলিম : ১১৭৫

"ইতিকাফ অবস্থায় বান্দারা গুনাহ হতে দূরে অবস্থান করে ও সকল প্রকার ইবাদাতের সাওয়াব ঘুমে ও জাগ্রত অবস্থায় লাভ করে।" ইবনে মাজাহ রাসুল (সা.) কত কঠোর ছিলেন মা আয়েশা (রা.) বলেন,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ شَدَّمِ ءْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَتَهُ وَأَيْقَظَ اقْلَه

"রমাদানের শেষ দশদিন রাসুল (সা.) কোমরকে শক্ত করে বেঁধে নিতেন। সমস্ত রাত নির্ঘুম ইবাদাতে থাকতেন ও পরিবারকেও ঘুমাতে দিতেন না।" বুখারি : ২০২৪

এ হাদিসটাই যথেষ্ট রাসুল (সা.) কীভাবে শেষ দশক এতেকাফে কাটাতেন সারা রাত দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করার জন্যে কোমরকে বেঁধে নিতেন, তিনি সুরা বাকারা, ইমরান ও নিসার মতো সুরা কিয়ামে পড়তেন। সমস্ত রাত নির্ঘুম কাটিয়ে দিতেন, আহলদেরকে জাগ্রত থ াকার ব্যাপারে কঠোর হতেন। যেহেতু শেষ দশকে ক্বদরের রাত চলে যাবে- যে এক রাতের ইবাদত এক হাজার মাসের অর্থাৎ প্রায় এক লাখ বছরের ইবাদাতের সমান। এই রাত যে হেলায় কাটাবে তাকে নবী (সা.) সবকিছু হতে বঞ্চিত বলেছেন।

قَالَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا اِلاكُلُّ مَحْرُوْم

নবী (সা.) বলেন, "কদরের এ অপরিসীম বরকত ও সাওয়াব হতে যে বঞ্চিত সে সকল কল্যাণ হতে বঞ্চিত। হতভাগ্য ছাড়া কেউ তা হতে মাহরুম হয়না।" ইবনে মাজাহ : ১৬৪৪

ক্বদরের মহা সম্মানিত রজনীতে রাসুল (সা.) আল্লাহ্ তায়ালার নিকট গুনাহ মাফ চাইতেন ও সে বিষয়ে উপদেশ দিতেন। হযরত আশেয়া (রা.) বলেন, "আমি নবী (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করি কদরের রাত পেলে আমি কি করব?"

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولِى : اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّا تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ

"তুমি বল, হে প্রভু, তুমি ক্ষমাকারী ও ক্ষমাকে পছন্দ কর আমাকে ক্ষমা করে দাও।" তিরমিযী : ৩৫১৩

হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারি রমাদানে আল্লাহর নিকট হতে ক্ষমা পাওয়া সবচেয়ে বড় পাওয়া। বান্দার চাওয়াতো একটাই, মনিব যেন গোলামকে মাফ করে দেয়। যাকে মাফ করা হবে তার চিন্তা নেই। সে নাজাত লাভ করবে। প্রভু, আমাদেরকে ক্ষমা করে ধন্য কর। বান্দাহ হিসেবে আমাদের অপরাধ সীমাহীন।

১১. রাসুল (সা.) এ মাসে বেশি গুনাহ মাফ চেয়েছেন ও কেঁদেছেন

হাদিস শরীফে নবীজি (সা.) বলেন, "আমি রাহমতের নবী, আমি বেশি তাওবাহকারী নবী, আমি যুদ্ধ করার নবী।" কুরআন বলছে,

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

"হে মুহাম্মদ, তুমি তোমার মালিকের তাসবীহ পড় ও প্রশংসা করো এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। অবশ্যই তিনি তাওবা কবুলকারী।" সুরা নসর : ৩

যদিও আল্লাহ তায়ালা তার সামনের ও পেছনের সকল গুনাহ মাফ করে কুরআনে অহি করে দিয়েছেন। সুরা ফাতাহর ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে:

لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا

"আল্লাহ তায়ালা তোমার সামনের ও পেছনের যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিতে পারেন, তোমার ওপর তাঁর অনুগ্রহ তিনি পূর্ণ করে দিতে পারেন, তোমাকে হিদায়াতের সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন।" সুরা ফাতাহ : ২

তারপরও রাতের সালাতে দাঁড়াতে গিয়ে তার পা মুবরাক ফুলে যেতো। সাহাবিরা যখন বলত, আল্লাহ আপনার পেছনের ও সামনের গুনাহও ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি বলতেন: আমি কি শোকর গুজার বান্দাহ হব না?'

قَالَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

"সকল বনি আদম গুনাহ করেছে, তবে গুনাহগারদের মধ্যে তাওবাকারীগণ উত্তম।" তিরমিযী : ২৪৯৯

ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, "আমি রাসুলের সাথে শেষ রাতের সালাতে ছিলাম। তাজাজ্জুদের পর ফজর পর্যন্ত রাসুলকে কাঁদতে দেখেছি। তিনি আরও বলেন, "আমি আরাফাতের মাঠে জবলে রাহমতের পাদদেশে হুজুর (সা.) উটের লাগাম হাতে ছিলাম। সূর্য হেলার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রাসুলের দুহাত নামেনি, আমি এমনভাবে কাঁদতে দেখেছি যে তার চোখের পানি আরাফাতের মাটি সিক্ত করছিল।' ইমাম মুসলিম মুনাজাতসহ বর্ণনা করেছেন।

রমাদানের সিয়াম ও কিয়ামের সাথে রয়েছে গুনাহ মাফের ঘোষণা :

قَالَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَبًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ ، كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

"ঈমান ও ইহতেসাবের সাথে যে দিনে সিয়াম ও রাতে কিয়াম করবে তার গুনাহ এমনভাবে মাফ হবে যেন নবজাতক শিশু।" ইবনে মাজাহ : ১১০৯

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"যে ব্যক্তি ক্বদরের রাতে জাগরণ করবে তারও গুনাহসমূহ মার্জনা করা হবে।" বুখারি : ১৯০১

অনুরূপভাবে ইফতারের সময় গুনাহ মাফের ঘোষণা, সেহেরির সময় মাফের ঘোষণা- প্রতিটি ইবাদাতের সাথে গুনাহ মাফ নিয়ে নাজাতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সময়। রাসুল (সা.)-এর জ্বলন্ত উদাহরণ। তাই তাঁর রামাদ্বান কেটেছে চোখের পানিতে তাওবা ও ক্রন্দনে। উম্মাতকেও বলে দিয়েছেন, এ মাসে যে নিষ্পাপ হতে পারবে না তার ওপর জিব্রাইলের ও রাসুল (সা.)-এর অভিশাপ রয়েছে। রাসুল (সা.) মিম্বারে বলেছিলেন,

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ جِبْرِيلَ عَرَضَ لِيْ فَقَالَ بَعدَ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَكَمْ يُغْفَرَ لَهُ قُلْتُ اٰمِيْنَ

"জিব্রাইল অভিশাপ দিয়ে বললঙযে রামাদ্বান পেল বিদায় করল কিন্তু জীবন হতে গুনাহ বিদায় করতে পারল না সে ধ্বংস হয়ে যাক। আমি বললাম আমীন।" হিব্বান : ২৬৭৬

জীবনের মধ্যে গুনাহ নেই তারপরও দিনে প্রায় ১০০ বার তাওবা করার দলীল হাদিস শরীফে রয়েছে। আল্লাহ ভয়' রাসুল (সা.)-এর ওপর গালেব হয়েছে, কীভাবে চোখের পানি তাঁর দাড়ি ভিজিয়ে জমিনকে সিক্ত করেছে তার বর্ণনা করার সাধ্য আমার নেই।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এমনও দেখেছি, একটি আয়াত পড়ে কাঁদতে কাঁদতে রাসুলের রাত ভোর হয়ে গেছে। তিনি বলতে ছিলেন:

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ

"প্রভু, তাদের গুনাহের জন্যে যদি তুমি শাস্তি দাও দিতে পার, তারাতো তোমারই বান্দাহ; আর যদি তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও, তাও তোমার ই"ছা। তুমিতো ক্ষমতাশালী ও প্রজ্ঞাময়।" সুরা মায়েদা : ১১৮

১২. মাহে রমাদানে রাসুল (সা.) কঠিন যিহাদে নেতৃত্ব দিয়েছেন

নবীদেরকে আল্লাহ তায়ালা পাঠিয়েছেন মানুষের গড়া আইন ও ব্যবস্থার ওপর আল্লাহর আইনকে বিজয়ী করার দায়িত্ব দিয়ে।

هُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكِينَ

"তিনি তাঁর রাসুলকে সঠিক হেদায়াত ও দ্বীনি বিধানসহ পাঠিয়েছেন, যেন সকল মানব রচিত বিধানের ওপর দ্বীনে হক্বকে বিজয় করে দিতে পারেন। তা মুশরিকের নিকট যতই অপছন্দ হোক।" সুরা সফ : ৯

ঈমান গ্রহণের পর শরিয়তের সকল হুকুমের মধ্যে একামতে দ্বীন বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এর সামনে সালাত, সিয়াম, হজ্বসহ সকল ফরজও মুলতবি রাখা হয়েছে। বিষয়টিকে নিয়ে বড় বড় কিতাব রচিত হয়েছে। এ ক্ষুদ্র পরিসরে সেদিকে যাওয়ার সুযোগ নেই। আমি শুধু বলতে চাই, রাসুল (সা.) রমাদানের ফরজ রোজা ভেঙে ১৭ই রামাদ্বান বদরের মাঠে ও ২১ রামাদ্বান মক্কা বিজয়ের ঐতিহাসিক যিহাদে নেতৃত্ব দেন। বদরের যুদ্ধে কোরাইশগণ বাধ্য করেছিল কিন্তু মক্কা বিজয়ের যুদ্ধে রাসুল (সা.) রামাদ্বানকে যুদ্ধের সময় হিসেবে গ্রহণ করেন। আবার তাবুকের সূচনা ও প্রস্তুতি শুরু হয় রমাদানে– যদিও যুদ্ধ হয় শাওয়ালে।

১৫ হিজরীতে ইরান সাম্রাজ্যের পতনের যুদ্ধ হয় কাদেসিয়ার মাঠে। ইরানী সেনাপতি রুস্তম নিহত হয় সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের বাহিনীর হাতে- যে বিজয়ের সংবাদ শুনার সাথে সাথে আমীরুল মুমেনিন হযরত ওমর (রা.) সিজদায় পড়ে কাঁদতে ছিলেন। তাঁরই খিলাফতকালে রোমানদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কঠিন যুদ্ধও হয়েছিল রমাদানে। ১৩

রামাদ্বান ১৫ হি. বায়তুল মাকদেস বিজয় হয়। সেনাপতি আবু ওবায়দার হাতে- তাও হযরত ওমরের খেলাফতকালে।

প্রিয় পাঠক, রমাদানের একটি ফরজ ৭০গুণ বেশি মর্যাদাবান। আবার একটি নফল ফরজের বরাবর। সে সিয়াম ভেঙে রাসুল (সা.) যিহাদের নেতৃত্ব দি"ছন। মক্কা বিজয়ের যুদ্ধে ১০ হাজার সাহাবি এক সাথে রোজা ভাঙেন রাসুলের সাথে।

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُذَا يَوْمُ الْقِتَالُ فَأَفْطَرُوا

নবীজি নির্দেশ দিয়ে বলেন, "সামনে যুদ্ধ, রোজা ভেঙে ফেলো।" তিবরানী

সিয়ামে ৭০ গুণ সাওয়াব আর যিহাদের মধ্যে রয়েছে হাজার হাজার গুণ।

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ امَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

"তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো ও বায়তুল্লাহর আবাদ করাকে আল্লাহ ও পরকালের ওপর ঈমান আনা ও যিহাদকে এক বরাবর মনে কর? আল্লাহর নিকট তা কখনও সমান নয়। তিনি যালেমদের হেদায়াত দেন না।" সুরা তাওবা : ১৯

যে কুরআন নাযিলের কারণে রামাদ্বান মাস, ক্বদরের রজনী এতো মর্যাদাবান সে কুরআন বিজয়ের 'যুদ্ধ-যিহাদ' আল্লাহর নিকট কত মর্যাদাবান।

হাজীদের আসা-যাওয়ার পথ নির্বিঘ্ন করতে হজ্বের মাসসমূহে যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম করা হয়েছে। 'যুলকাদাহ, যুলহাজ্জা ও মহররম'। সুরা তাওবা : ৩৬

কিন্তু রামাদ্বান মাসকে যেন যিহাদের মাস হিসেবে নেয়া হয়েছে। যিহাদ নিষেধ করার কোনো প্রশ্নই নেই। রাসুল (সা.)-এর জীবনে ও পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদার জীবনে রামাদ্বান মাসে দ্বীন বিজয়ের বড় বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। সকল সংগ্রামে ফরজ সিয়াম ভঙ্গ করে রোজাদার মুজাহীদরা যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। খোদ রাসুল (সা.) বদর যুদ্ধে ও মক্কা বিজয়ের লড়াইয়ে রোজা ভেঙেছেন ও সবাইকে রোজা খোলার নির্দেশ দিয়েছেন। উম্মতের নিকট আজ সিয়ামের গুরুত্ব যতটুকু আছে যিহাদের গুরুত্ব শূন্যের কোঠায় নেমেছে। উম্মতের Scholer-গণের কিছু সংখ্যক পণ্ডিত সালাতের মধ্যে হাত তোলা ও হাত রাখার জায়গা ঠিক করতে গলদঘর্ম হচ্ছেন, চৌদ্দশত বছর পর দ্বীন প্রতিষ্ঠার ফরিজা ও দ্বীনের দায়ীদের ওপর চলমান নির্যাতন ও ফাঁসি তাদের নিকট আজও আলোচনার Agenda হিসেবে বিবেচনায় আসেনি। যতদিন দ্বীনকে রাসুলুল্লাহর জীবন থেকে সরাসরি গ্রহণ করতে না শিখবে, সম্ভবত ততদিন উম্মাহ্ অন্ধকারে শুধু হাতড়াতে থাকবে। আর মাঝে মাঝে চিৎকার করবে সহীহ তরিকার সন্ধান পেয়েছি। রাসুলুল্লাহ্ (সা.) হচ্ছেন সহীহ তরিকা আর সাহাবিগণ হচ্ছেন সে সহীহ তরিকার সহীহ অনুসারী। সোয়া লাখ সাহাবির আয়নায় যে মুহাম্মদ (সা.) বিম্বিত হয়েছেন উম্মতদেরকে সেখান হতে তাঁকে নিখুঁতভাবে খুঁজে নিতে হবে রাসুল (সা.) মাহে রামাদ্বানকে কীভাবে গ্রহণ করেছেন' এ গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ আমি ১২টি শিরোনামে সমাপ্ত করছি। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সে মতে রামাদ্বানুল মুবারককে গ্রহণ ও পালনের শক্তি দাও।

উপসংহার

মাহে রামাদ্বান ও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সিয়াম সাধনা' নামে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করার ইচ্ছা অনেক আগেই হৃদয়ে পোষণ করেছিলাম। তা আজ সমাপ্ত হলো। কিন্তু লেখা শেষ করে মনে হলো 'শেষ হয়ে হইল না শেষ।' যা বলা হলো তা অনেক কম, যা বলা হলো না তার এর চেয়ে বেশি। জ্ঞান সাগরের কোনো কূল নেই, তল নেই, আছে শুধু অথৈ জ্ঞানরাশি। বয়সের চাপ যখন আমাকে কষ্ট দিচ্ছে ইলমের পিপাসা ততই যেন আমাকে পিপাসার্ত করছে। জ্ঞানীরা তাইত বলতেন, 'অতলান্ত জ্ঞান সমুদ্রের কিছুই দেখা হয়নি, সারা জীবন মহাসাগরের বেলাভূমিতে নুড়ি নিয়ে খেলছি।'

প্রিয় পাঠক, দুটি জিনিস আমার নিকট বিস্ময়ের মহা বিস্ময়। একটি আল্লাহর আখেরি কিতাব অপরটি তাঁর আখেরি রাসুল মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ (সা.)। একটি অপরটির সাথে এভাবে রয়েছে, 'নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা।' মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের প্রতিটি আচরণে, প্রতিটি শব্দের উচ্চারণে, দৃষ্টির প্রতিটি পলকে, চলার প্রতিটি পদক্ষেপে আল কুরআনের নূর বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আবার আল কুরআনে প্রতিটি আয়াতে ও শব্দে সম্পৃক্ত রয়েছে মুহাম্মদ (সা.)। একটি বর্ণও এমন নেই, যা মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন থেকে আলাদা করা যাবে। আবার মধ্যখানে রয়েছে আসমান ও জমিনের ব্যবধান। মুহাম্মদ (সা.) মাখলুক, আর কুরআন গাইরে মাখলুক। মাখলুক ও খালেকের মধ্যে রয়েছে কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরত্ব। 'মুতাযিলারা' কুরআনকে মাখলুক বলে যে ফিৎনার সৃষ্টি করেছিল ইমাম আহমদ (রাহ.) জীবন দিয়ে অতি কঠোরভাবে এ ফিৎনার শিকড় তুলে ফেলেছেন। সে বিষয়ে এখানে বলার অবকাশ নেই। ইমাম আহমদকে আল্লাহ তায়ালা জান্নাত দাও।

আসুন, আজ মাহে রামাদান রাহমাত, মাগফিরাত ও নাজাতের যে সওগাত নিয়ে সসলিম উম্মাহর সামনে

হাজির হয়েছে– যার প্রতিটি মুহূর্তের মধ্যে রয়েছে শতশত বছরের বারাকাহ আমরা তা গ্রহণে শপথ করি। অর্থসহ একপারা কোরআন একদিনে পড়ার সিদ্ধান্ত নেই; শির্ক মুক্ত ঈমান ও ইহতেসাবের মাসে দিনে সিয়াম ও রাতে কিয়াম করি ও অতীতের সকল গুনাহ হতে মুক্ত হবই। এ সাধনায় মগ্নহই, আমিন।

লেখক : প্রখ্যাত স্কলার, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাসসির।

রামাদ্বান এবং আমাদের করণীয়

মুহাম্মদ আবুল হুসাইন খান

প্রারম্ভিক কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আলহামদু লিল্লাহি হামদাশ শাকিরীন ও উসাল্লী ও উসাল্লিমু আ'লা নাবিইয়িহি ও রাসুলিহিল কারীম– আম্মাবা'দ। সংক্ষেপে রমাদ্বানে আমাদের করণীয় ও বর্জনীয় কী, তা কাগজের পাতায় ব্যক্ত করতে দীর্ঘ দিন থেকেই অপেক্ষায় ছিলাম, পরিশেষে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া যে, তিনি আমার জন্য এ কাজটি সহজ করে দিলেন-আলহামদুলিল্লাহ।

বছর ঘুরে রামাদ্বান মাস মেহমান হিসেবে আমাদের দুয়ারে হাজির হয় ক্ষমার মহা আয়োজন নিয়ে। বড়ো কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি কিছু ফ্রি বিতরণ করে তাহলে মানুষ জান কুরবান করে যেভাবেই হোক তা অর্জনের চেষ্টা করে। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে এককালীন ক্ষমা করার উদ্দেশ্যে এক মহা মৌসুমের আয়োজন করেন; আর তা হলো 'রামাদ্বান'। তাই তিনি (হাদিসে কুদসিতে) বলেছেন, "যারা আমার জন্যেই সাওম পালন করে আমি স্বয়ং তাদের বিনিময় দিবো।" আর নবী (সা.) এর বাণী তো আছেই যে, সত্যিকারের সাওম পালনকারীদেরকে আল্লাহ তাআলা পরকালে ডেকে নিয়ে 'রাইয়ান' নামক তোরণ দিয়ে জান্নাতে স্বাগত জানাবেন। তিনি আরও বললেন, 'যে ব্যক্তি পূর্ণ ঈমান সহকারে ও প্রচণ্ড সওয়াবের আশায় নিষ্ঠার সাথে সাওম পালনে ব্রতী হবে, আল্লাহ পাক তাঁর পূর্বেকার সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন" (বুখারি ও মুসলিম)। তাই নবী (সা.) রামাদ্বান আসতেই সাহাবিদের ডেকে নিয়ে করণীয় ও বর্জনীয় বলে দিতেন। এ প্রবন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত আকারে আমি এগুলোকে এক জায়গায় জমা করে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। তাই আসুন, এ মাসে আমাদের করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলো জেনে নিয়ে এর আলোকে রমাদ্বানে কেবল একে দশ নয়, বরং একটি আমলে কমপক্ষে সত্তরটি ছওয়াব অর্জনে সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করি।

সাওম দু'ধরনের : এক. বাহ্যিক, যেমন: পানাহার বন্ধ রেখে উপবাস থাকা এবং দিনের বেলায় যৌনাচার বন্ধ রাখা। দুই. অভ্যন্তরীণ, যেমন : আল্লাহর ভয়ে সকল হারাম আচরণ থেকে বিরত থাকা, হারাম কিছু না দেখা, কারো প্রতি দুর্ব্যবহার না করা, চোখ নিম্নগামী রেখে পথ-ঘাট চলা, মোবাইলের সকল হারামকে হারাম মনে করে বর্জন করা ইত্যাদি। এ কথা মনের গভীরে উপলব্দি করা যে, আমি আল্লাহকে না দেখলেও আল্লাহ আমাকে দেখছেন ও আমার দৈনন্দিন তৎপরতা পর্যবেক্ষণ করছেন। সাওম আমার পাপ থেকে বাঁচার জন্য ঢাল স্বরূপ, যুদ্ধে যেমন আত্মরক্ষার জন্য ঢাল ব্যবহার করা হয়, আমাকে সকল গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য সাওম এসেছে। তাই কোনো গোনাহ সামনে দেখলেই আমি যেন ঢাল ব্যবহার করে বাঁচতে পারি। আমি রোজা আছি, পাপ করতে পারবনা, এ কথা মনে লালন করা। তাই আসুন, আনুষ্ঠানিক রোজার পরিবর্তে আমরা যেন আসল রোজা রাখতে পারি, আল্লাহ আমাদের সে তৌফিক দিন। আমাদের মুসলিম মিল্লাত রোজা রাখেন বটে, কিন্তু অনেকেই সত্যিকার সাওম পালন করার উদ্দেশ্য, নিয়ম-কানুন এমনকি এর জরুরী মাসআলা-মাসায়েলও জানার প্রয়োজন বোধ করেন না; তাই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস থেকে মুসলিম উম্মাহ খানিকটা উপকৃত হলেও শ্রম স্বার্থক হয়েছে মনে করবো।

১. শাহরু রামাদ্বান : রামাদ্বান ও সাওমের অর্থ ও তার তার তাৎপর্য

কালের চক্রে রামাদ্বান আমাদের মধ্যে আসে আর যায়। চন্দ্র বর্ষের নবম মাসের নাম 'রামাদ্বান'। আর এ মাসের মূল কর্মসূচীর নাম সাওম। সাওম এক বচনে, বহু বচনে সিয়াম। যার মানে হলো সুবহে সাদিক (ভোর রাত) থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাসসহ আল্লাহর নিষিদ্ধ সব

কাজ থেকে বিরত থাকা, আমরা যাকে ফার্সীতে বলি রোজা। তাক্বওয়া বা আল্লাহ-ভীতি অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করাই সওমের প্রধান উদ্দেশ্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সাওম ফরজ করা হয়েছে, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল। আশা করা যায় তোমাদের মধ্যে তাক্বওয়া সৃষ্টি হবে"। (সুরা বাকারা: ১৮৩)। এবার রামাদ্বানের অর্থ। আরবী রমদুন শব্দ থেকে রামাদ্বান। রমদুন رمض অর্থ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নকল থেকে আসল পরখ করে বের করা। যে মাসে মানুষের কাম রিপু, লোভ, মোহ ও ভোগের মানসিকতা ও পানাহার থেকে বিরত রেখে ক্ষুধার আগুনে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে পরখ করার ব্যবস্থা রয়েছে, তারই নাম রামাদ্বান। যারা রমাদ্বানে আত্মসংশোধন করতে পারল, তারাই মূলত আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ, আর যারা পারলোনা তারা বড়োই দুর্ভাগা। তাদের সিয়াম সাধনা যেন কোনো কাজেই আসল না। এ মাসের পবিত্রতা রক্ষার স্বার্থে রমাদ্বানে গান-বাজনা, সিনেমা এমনকি রোজার জন্য ক্ষতিকর এমন সবকিছুই যথাসাধ্য বন্ধ রাখা জরুরী। পাশাপাশি বেপর্দা মহিলাদের অবাধ বিচরণ ও টিক-টকসহ সকল অশ্লীলতা থেকে নিজেকে পবিত্র রাখতে হবে। মহানবী (সা.) বলেছেন:

من
لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه

'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ এবং পাপাচার পরিত্যাগ করতে পারলোনা, তার পানাহার বর্জনে অর্থাৎ সাওম পালনে আল্লাহর (ছওয়াব দেওয়ার) কোনো প্রয়োজন নেই' (বুখারি)। আল্লাহ বলেন, "আমি মানুষের হেদায়েতের জন্য পথ নির্দেশনার বিস্তারিত বর্ণনাসহ সত্য মিথ্যার মাপকাঠি হিসাবে এই রামাদ্বান মাসেই কুরআন নাজিল করেছি। যাতে করে মানুষ আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ হওয়ার প্রশিক্ষণ সহজে পেতে পারে।

২. রামাদ্বানু শাহরুল কুরআন (আল-কুরআন নাজিল ও তিলাওয়াতের মাস)

এ মাস আল-কুরআন নাজিল ও তিলাওয়াতের মাস। সুরা আল-ক্বাদরে আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

"আমি এ-কে নাজিল করেছি লাইলাতুল-ক্বদরে" আর লাইলাতুল-ক্বদর হয়ে থাকে রমাদ্বানেই। অতএব সর্ব সম্মতভাবে এ মাসই হলো আল-কুরআন নাজিলের মাস। তাছাড়া এ মাসে রাসুল (সা.) জিবরীলে আমীনের সাথে কুরআন পাঠ/চর্চা করতেন। তাঁর সুন্নাত অনুসরণ করে প্রত্যেক মু'মিনের উচিত এ মাসে বেশি বেশি কুরআন চর্চা বা তেলাওয়াত করা, বুঝা এবং আমল করা। ইবনু আববাস (রা.) বলেন,

كَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ

"জিবরীল (আ.) রামাদ্বানের প্রতি রাতে এসে রাসুল (সা.) এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাকে নিয়ে কুরআন পাঠ/চর্চা করতেন" (বুখারি : ৩০৪৮)। এ হাদিস থেকে বুঝা গেল রামাদ্বান হলো 'শাহরু দুরুসিল কুরআন' বা অর্থ বুঝাসহ কুরআন চর্চার মাস। দারস অর্থ কেউ অপরকে বুঝিয়ে পড়ানো আর 'তাদারুস' অর্থ দু'জন মিলে পরস্পরে বুঝে বুঝে শেয়ার করা, যাকে আমরা 'পাঠচক্র' বলে থাকি। রাসুল (সা.) জিবরীলে আমীনের সাথে কুরআনের তাদারুস বা পাঠচক্র করতেন। যে প্রচেষ্টাকে 'তাফহীমুল কুরআন' ও বলা যায়। যা রামাদ্বানেই করা হত।

৩. রামাদ্বানু লিতাফহীমিল কুরআন (কুরআনের মর্ম উপলব্ধি করা বা বুঝার মাস এটি)

যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং সে অনুযায়ী আমল করে, তার ব্যাপারে আল্লাহ এ নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, সে দুনিয়ায় ভ্রষ্ট হবে না এবং আখিরাতে দুর্ভাগা বা হতভাগাদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ

"সুতরাং যে আমার দেয়া হিদায়াতের পথ অনুসরণ করবে, সে পথ ভ্রষ্ট হবে না এবং দুঃখ কষ্টে পতিত হবে না"। (সুরা ত্বা-হা: ১২৩) সালাফে সালেহীন এ মাসে নামাজে ও নামাজের বাইরে কুরআন খতম করতেন। রামাদ্বানের কিয়ামুল লাইলে তাদের কেউ সাতদিনে এবং কেউ দশদিনে কুরআন খতম করতেন। ইমাম মালিক এবং ইমাম যুহরী (রাহি.) রামাদ্বান এলেই হাদিস পাঠ ও ইলমের মজলিস ত্যাগ করে কুরআন পাঠে লেগে যেতেন। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন, কুরআন শুধু তিলাওয়াত করে খতম করার জন্যই নাজিল হয়নি। তাই কোনোরূপ অর্থ না বুঝে, চিন্তাভাবনা না করে অন্তরে আল্লাহ ভীতি ও বিনম্রভাব সৃষ্টি না করে কবিতার মত কুরআন আবৃত্তি করে যাওয়া সঠিক নয়।

كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَٰبِ

"এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে"। (সুরা সোয়াদ : ২৯) । তাই তিলাওয়াতের পাশাপাশি আমাদেরকে অর্থসহ বুঝে পড়ার গুরুত্ব কুরআন নিজেই আরও কয়েক জায়গায় বিবৃত করেছে যেমন– "এটি এমন একটি গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি। অতএব, তোমরা এর অনুসরণ করো যাতে তোমরা করুণাপ্রাপ্ত হও"। (সুরা আন'য়াম : ১৫৫)

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا

"আমি আপনার প্রতি একদম সঠিক কিতাব নাজিল করেছি মানুষের কল্যাণকল্পে। অতঃপর যে সৎপথে আসে, সে নিজের কল্যাণের জন্যেই আসে, আর যে পথভ্রষ্ট হয়, সে নিজেরই অনিষ্টের জন্যে পথভ্রষ্ট হয়। আপনি তাদের জন্যে মোটেই দায়ী নন"। (যুমার : ৪১)। তিনি অন্যত্র বলেন–

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍوَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ

"অতএব, আপনার প্রতি যে ওহি পাঠানো হয়, তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরুণ, নিঃসন্দেহে আপনি সরল পথে রয়েছেন, এটা (এ কিতাব) আপনার ও আপনার উম্মতের জন্যে পাঠিয়েছি এবং শীঘ্রই আপনারা জিজ্ঞাসিত হবেন" (সুরা যুখরুফ : ৪৩-৪৪)। অতএব এ কিতাব মূলত পথের দিশা দেয় মানুষকে। এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করবে এবং অন্যদের প্রতি এর দাওয়াত কবুল করতে আহ্বান জানাবে, সুতরাং আগে এর অর্থ নিজে বুঝে অপরকে বুঝানো এবং সকলে মিলে তা মেনে চলাই হচ্ছে মানুষের কাছে আল-কুরআনের আসল দাবি। কেউ যদি তা বুঝল না যে, আল-কুরআন কেন কার কাছে এবং কিজন্য এসেছে, তাহলে এর প্রেরণ অনেকটা ব্যর্থই থেকে যাবে; অতএব এ কুরআন নাজিলের উদ্দেশ্য নিজেই বলছে এভাবে যে,

النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ

"এটি একটি গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাজিল করেছি, যা দিয়ে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে নিয়ে আসেন" (সুরা ইবরাহীম : ১)। সুতরাং কুরআন কেবল তিলাওয়াত নয় বরং বুঝে পড়ার কিতাব।

৪. রামাদ্বানু শাহরুত তাক্বওয়া (তাক্বওয়া হাসিলের মাস)

আমাদেরকে তাক্বওয়া হাসিলের জন্য এ মাসে অতি মনোযোগী হতে হবে। তাক্বওয়ার অর্থ হলো, দিনের বেলা আল্লাহর ভয়ে পানাহার ও সকল যৌনাচার থেকে যেমন বিরত থাকা, এমনিভাবে সমগ্র মাসটিতে দিন-রাত সকল হারাম কাজ ও আচরণ থেকে আল্লাহকে ভয় করে বিরত থাকা। যেমন আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সাওম ফরজ করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা আল্লাহভীরুতা বা পরহেযগারী অর্জন করতে পার" (বাকারা : ১৮৩)। এভাবে এক মাসের দীর্ঘ প্রশিক্ষণ কোর্স পালন বা অপরিসীম ত্যাগ-সাধনার পর অন্তরের মনিকোঠায় যে ত্যাগ বা ভীরুতা সৃষ্ঠি হয় তারই নাম তাক্বওয়া। মানব চোখে যা অবলোকন করা যায়না বটে। কাজেই এক মাসের সাধনায় মানুষের মনের মধ্যে আল্লাহকে ভয় করার যে অনুভুতি তৈরী হয় তাকেই তাক্বওয়া বলে এবং এটাই সাওমের আসল উদ্যেশ্য।

৫. রামাদ্বানু শাহরুস সিয়াম (আল্লাহর জনই সিয়াম সাধনার মাস)

রামাদ্বান মাসে সাওম পালন করা পূর্ববর্তী রামাদ্বান থেকে কৃত গুনাহসমূহের কাফফারাহ লাভের কারণ। যদি বড়ো গুনাহ সমূহ (কবিরাহ গুনাহ সমূহ) থেকে বিরত থাকা হয়, যেমনটি প্রমাণিত হয়েছে 'সহিহ মুসলিম (২৩৩)-এ যে নবী (সা.) বলেছেন, "পাঁচ ওয়াক্বতের পাঁচবার সালাত, এক জুমু'আহ থেকে অপর জুমু'আহ, এক রামাদ্বান থেকে অপর রামাদ্বান এর মাঝে কৃত গুনাহসমূহের কাফফারাহ হয়ে যায়, যদি বড়ো গুনাহ সমূহ (কাবিরাহ) থেকে বিরত থাকা হয়।" এই মাসে সাওম পালন করা দশ মাস সাওম পালন করার সমতূল্য যা 'সহিহ মুসলিম' (১১৬৪)-এ প্রমাণিত আবু আইয়ূব আল-আনসারীর হাদিস থেকে পাওয়া যায় যেখানে তিনি বলেছেন, "যে রামাদ্বান মাসে সাওম পালন করল, এর পর শাউওয়ালের ছয়দিন, তবে তা তার সারা বছরের সাওম রাখার সমতূল্য।" কুরআনের সুরা আন'আমের ১৬০ নং আয়াতের মর্ম অনুসারে কোনো মু'মিন কোনো ভালো কাজ করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে দশ গুণ সাওয়াব দেন। সুবহানাল্লাহ! তাই রামাদ্বান মাসে ৩০ দিন সাওম পালনের অর্থ দাঁড়ায় (৩০*১০গুণ)=৩০০ দিন অর্থাৎ দশ মাস সাওম পালন করা; আর শাউওয়াল মাসের ছয় দিন সাওম পালন করার অর্থ দাঁড়ায় (৬*১০)=৬০ দিন অর্থাৎ দুই মাস সাওম পালন করা। সুতরাং রামাদ্বান ও এর পরবর্তী শাউওয়ালের ছয় দিন সাওম পালন করা (১০ মাস+২ মাস) = ১২ মাস অর্থাৎ গোটা বছরের সমতূল্য! তাই আল্লাহ বলেন,

لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ

"আল্লাহ তাদের উৎকৃষ্টতর কাজের প্রতিদান দেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও অধিক দেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিতভাবে ছওয়াব দান করেন"। (নূর-৩৮) রোজাদারের জন্য কুরআন ও রোজা শাফায়াত করবে।

الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ ـ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ

রাসুল (সা.) বলেছেন, "রোজা এবং কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য শাফায়াত করবে। রোজা বলবে, হে রব! আমি তাকে দিনের বেলায় পানাহার ও কামনা চারিতার্থ করা থেকে নিবৃত্ত রেখেছি। অতএব, তার ব্যাপারে আমার শাফায়াত কবুল করুন, আর কুরআন বলবে, হে আল্লাহ তোমার বান্দাকে রাতের বেলায় আমি ঘুমুতে দেইনি, সে আমাকে নামাজে পড়েছে, তিলাওয়াত করেছে, অধ্যয়ন করেছে, হালাল-হারাম জেনে আমল করেছে, অতএব আমার শাফায়াত কবুল করুন"। (মুসনাদ : ৬৬২৬, আল-মুস্তাদরাক : ২০৩৬)।

৬. রামাদ্বানু শাহরুল ক্বিয়াম (রাত জেগে নামাজ পড়ার মাস)

কিয়ামুল লাইল : তারাবি, তাহজ্জুদ এবং রাতের যে কোনো নফল নামাজ কিয়ামুল্লাইলের অন্তর্ভুক্ত। যে সকল আমলের মাধ্যমে মু'মিন ব্যক্তি রামাদ্বান মাসে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে, তন্মধ্যে কিয়ামুল্লাইল সবচেয়ে উত্তম। রাসুল (সা.) বলেন,

أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ

"ফরজ নামাজের পর সর্বোত্তম নামাজ হচ্ছে রাতের নামাজ"। (সহিহ মুসলিম : ২৮১২) রাতের নামাজের বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَٰمًا

"এবং যারা রাত্রিযাপন করে তাদের পালনকর্তার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে ও সেজদাবনত অবস্থায়"। (ফুরকান : ৬৩-৬৪) আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ١٧ وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

"রাতের কিয়দংশে তারা নিদ্রা যেত এবং রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত"। (সুরা আয-যারিয়াত : ১৭-১৮) মূলত: কিয়ামুল্লাইল ছিল নবী (সা.) ও তার সাহাবিদের নিয়মিত আমল।

আয়েশা (রা.) বলেন,

لَا تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدَعُهُ وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ كَسِلَ صَلَّى قَاعِدًا

"কিয়ামুল্লাইল ত্যাগ করো না। কেননা রাসুল (সা.) তা ত্যাগ করতেন না। অসুস্থ কিংবা ক্লান্তিবোধ করলে তিনি বসে নামাজ পড়তেন"। (মুসনাদ আহমাদ : ২৬১১৪ ও সুনান আবি দাউদ : ১৩০৭)।

রামাদানে কিয়ামুল্লাইলের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে, তাই নবী (সা.) বলেন,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"যে ব্যক্তি রামাদ্বান মাসে ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় (রাতের নামাজে) দাঁড়ায়, তার পূর্ববর্তী সকল গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়"। (সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৯০৫ ও সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৮১৫) সুনানের গ্রন্থসমূহে সহিহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, নবী (সা.) বলেছেন,

مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَة

"যে ব্যক্তি ইমাম নামাজ থেকে বিরত হওয়া পর্যন্ত ইমামের সাথে (কিয়ামুল্লাইলে) দাঁড়াবে, তাহলে তার এ আমল রাত্রিভর কিয়ামের

সমতুল্য হিসাবে লিখা হবে”। (তিরমিযী, হাদিস নং ৮০৬ ও নাসাঈ, হাদিস নং ১৬০৫)। আয়িশা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, রামাদানে রাসুল (সা.) -এর নামাজ কেমন ছিলো? তিনি বললেন,

مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

“রামাদানে এবং রামাদ্বান ব্যতীত অন্য সময়ে এগার রাকআতের বেশী (রাতের নামাজ) তিনি পড়তেন না”। (সহিহ বুখারি : ১০৯৬ ও সহিহ মুসলিম : ১৭৫৭)

কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, ‘হে বস্ত্রাবৃত! রাত্রিতে দন্ডায়মান হোন কিছু অংশ বাদ দিয়ে; অর্ধরাত্রি অথবা তদপেক্ষা কিছু কম, অথবা একটু বেশী এবং কুরআন আবৃত্তি করুন সুবিন্যস্ত ভাবে ও স্পষ্টভাবে। আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি গুরুত্বপূর্ণ বাণী। নিশ্চয় এবাদতের জন্যে রাত্রিতে উঠা প্রবৃত্তি দমনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল। নিশ্চয় দিনে রয়েছে আপনার দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে তাতে মগ্ন হোন’। (মুজ্জাম্মিল : ১-৮)

৭. রামাদ্বানু শাহরু লাইলাতিল ক্বাদর (লাইলাতুল ক্বাদরের মাস)

আরবি ‘ক্বদর’ বা ক্বাদর শব্দের অর্থ দু’টি :

১. তাক্বদীর অর্থাৎ আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করে হায়াত-মউতসহ তার জীবনের সবকিছু পরিকল্পনা করে তার নামে ভাল-মন্দ যা লিখে রেখেছেন, যা সে নিজে বা অন্য কেউই জানেনা (তবে মন্দ কিছু লিখা হয়ে থাকলে ব্যক্তির দোয়া ও বিশেষ আবেদনে পরিবর্তন হতে পারে)।

২. সমাদর করা, কাউকে সম্মান করা; আপনার প্রিয়জন হলে আপনি সবকিছু উজাড় করে তাকে দিয়ে দিতে ভালোবাসেন। এ আয়াতে ক্বাদরের অর্থ হলো, অতীত উম্মতের তুলনায় এ উম্মতকে আল্লাহ তায়ালা হায়াত কম দিলেও তাদেরকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সময় দিয়েছেন, যাতে করে সে এ সীমিত সময়ে গুণগত আমলের মধ্য দিয়ে তা পুষিয়ে নেয় এবং জান্নাত লাভে সক্ষম হয়। উম্মতে মুহাম্মদীর এ কম সময়ে অধিক ছওয়াবের সময়গুলোর একটি তালিকা দেওয়া হলো :

১. লাইলাতুল ক্বাদরের নিয়ত করে রামাদ্বানের শেষের দশকের ৫টি বেজোড় রাতে বিশেষ ইবাদত পালন

২. পুরো রামাদ্বান মাসটিকে অধিক ছওয়াবের আশায় খালেস ইবাদতের মধ্যে কাটানো (নবীর তরীক্বা অনুসরণে সিয়াম, ক্বিয়াম, তিলাওয়াত, দৈনিক আযকার, ইফতার-ছুহুর, দান-সাদাক্বাহ ইত্যাদি ইবাদত করে যাওয়া)

৩. রাসুল (সা.) এর সাথে হজ করার সৌভাগ্য হাসিলের নিয়তে সম্ভব হলে রমাদ্বানে উমরাহ পালন

৪. সাপ্তাহিক শ্রেষ্ট দিন জুমু’আর দিনটি খুবই সচেতনতার মধ্য দিয়ে পালন অর্থাৎ (ইবাদতে কাটিয়ে দেয়া)

৫. জুমুআর নামাজে মসজিদে পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং আগে গিয়ে ইমামের পাশে চুপচাপ বসে খুতবাহ শ্রবণ

৬. প্রতিদিন দু’রাকাত করে করে চার রাকাত সালাতুদ্দুহা আদায় করা (যা করলে মক্ববুল উমরার ছওয়াব মিলে)

৭. তাছাড়া জান্নাতে যাওয়ার ছোট ছোট বেশ কিছু সহজ আমল যেমন: (অজু সেরে দুয়া পাঠ, জুমাবারে দুরূদ পড়া, আযান শুনে জবাবদান ও শেষে দুয়া পাঠ, যথাসম্ভব কুরআন তিলাওয়াত, জিহাদের নিয়তে ইসলামী আন্দোলনে সময় দান, সালামের প্রচলন, খাবার খাওয়ায়ানো, আত্বীয়দের সুসম্পর্ক বজায়, রাতে তাহজুদ ইত্যাদি)

৮. হজ্জের সময়ের সকল আমল, বিশেষ করে আরাফার ময়দানের দোয়া (যেখানে দোয়া কবুলের গ্যারান্টি)

৯. স্ত্রী-সন্তান, কাজের কলিগ, বন্ধু-বান্ধব ও আপনজনসহ সবার সাথে হাসিমুখে সর্বোত্তম আচরণ এবং

১০. কুরআনের সাথে বন্ধুসুলভ সম্পর্ক স্থাপন অর্থাৎ প্রতিদিন এর তিলাওয়াত ও অধ্যয়নে সময়ক্ষেপন ইত্যাদি।

এ আমলগুলো করতে পারলে ক্বাদরকে ক্বাদর করা হবে। যে মাস হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। যেমনটি তিনি বলেছেন,

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

“আমি একে নাজিল করেছি কদরের রাতে। কদরের রাত সমন্ধে আপনি কি জানেন? কদরের রাত হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ একটি রাত”। (সুরাহ আল-ক্বাদর)। আল্লাহ তা’আলা রামাদ্বানকে লাইলাতুল ক্বাদর দিয়ে সম্মানিত করেছেন। অপর আয়াতে তিনি বলেছেন,

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

“নিশ্চিতভাবে আমি একে নাজিল করেছি এক বরকতময় রাতে, নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। এ রাতেই প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়”। (সুরা দুখান ৩-৪)। আল্লাহ এই মাসে সাওম পালন ও ক্বিয়াম করাকে গুনাহ মাফের কারণ বলেছেন। বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। মুসলিমদের মাঝে রামাদ্বানের রাতে ক্বিয়াম করা সুন্নাহ হওয়ার ব্যাপারে ইজমা‘ (ঐক্যমত) রয়েছে। ইমাম আন-নাবাভী উল্লেখ করেছেনঃ “রমাদ্বানে ক্বিয়াম করার অর্থ হল তারাবিহের সালাত আদায় করা”। তাছাড়া রামাদ্বানের শেষ দশ কে নবী (সা.) স্ত্রী-পরিবার সহ সারা রাত জেগে ইবাদত করতেন: উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ

“রামাদ্বানের শেষ দশক প্রবেশ করলে রাসুল (সা.) কোমর বেঁধে নিতেন, নিজে সারা রাত জাগতেন এবং পরিবারকেও জাগাতেন”। কোমর বাঁধার অর্থ হলো: পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে চেষ্টা-সাধনায় লিপ্ত হওয়া। কোনো কোনো আলেম এর ব্যাখ্যায় বলেন: স্ত্রী সহবাস থেকে দূরে থাকা। রাসুল (সা.) রামাযানে শেষ দশকে যত বেশি পরিশ্রম করতেন, তা অন্য মাসে কখনো করতেন না। আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَجْتَهِدُ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِى غَيْرِهِ

“রাসুল (সা.) রামাদ্বানের শেষ দশকে (ইবাদত-বন্দেগীতে) যে পরিমাণ পরিশ্রম করতেন অন্য কখনো করতেন না।” লাইলাতুল ক্বাদরে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল। আল্লাহ তায়ালা বলেন, “নিশ্চয় আমি একে (কুরআন) কে অবতীর্ণ করেছি একটি বরকতময় রাতে” (সুরা দুখান: ৩)। আর এ রাত হল লাইলাতুল ক্বাদর। লাইলাতুল ক্বাদরে রাত জেগে ইবাদত করলে পূর্বের সকল গুনাহ মোচন হয়ে যায়। লাইলাতুল ক্বাদর হবে রামাদ্বানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে। আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন,

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

“তোমরা রামাদ্বানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে লাইলাতুল ক্বাদর

অনুসন্ধান কর”। আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসুল (সা.) বলেন, “স্বপ্নে আমাকে লাইলাতুল ক্বদ্‌র দেখানো হল। কিন্তু আমার এক স্ত্রী আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয়ায় আমি তা ভুলে গিয়েছি। অতএব, তোমরা তা রামাদ্বানের শেষ দশকে অনুসন্ধান কর”। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, দু'ব্যক্তির বিবাদের কারণে রাসুল (সা.) তা ভুলে গেছেন। শবে কদর কি শুধু রামাদ্বানের সাতাইশ রাতের জন্য নির্দিষ্ট? আমাদের দেশে সাধারণত মানুষ শুধু রামাদ্বানের সাতাইশ তারিখের রাত জেগে ইবাদত বন্দেগী করে এবং ধারণা করে এ রাতেই লাইলাতুল কদর অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু এ ধারণা সুন্নতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তবে শেষ সাত দিনের বেজোড় রাতেই শবে কদর হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। যা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। সঠিক কথা হল, রামাদ্বানের শেষের দশকের যে কোনো বেজোড় রাতে ২১, ২৩, ২৫, ২৭ এবং ২৯ শবে কদর হতে পারে। বিশেষ করে আমাদের দেশে যেভাবে শুধু সাতাইশ তারিখ নির্দিষ্ট করে নেয়া হয়েছে, তা বর্জন করে সুন্নতী পন্থায় আমল করা সবার জন্য অপরিহার্য। শবে কদরের বিশেষ দোয়া। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমি যদি জানতে পারি যে, কোনো রাতটি লাইলাতুল কদর, তাহলে কোনো দুআটি পাঠ করব? তিনি বললেন, তুমি বল,

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى

“হে আল্লাহ, আপনি মহানুভব ক্ষমাশীল। আপনি ক্ষমা করা পছন্দ করেন। অত:এব আপনি আমাকে ক্ষমা করুন”। (তিরমিযী, সহিহ)।

৮. রামাদ্বানু শাহরু কিয়ামিল্লাইল : (সালাতু তারাবিহের মাস)

সালাতু তারাবিহ ও তার নিয়মাবলি : নবী (সা.) এর ইন্তেকালের পর আবু বকর (রা.) এর খিলাফতকালে তারাবি নামাজ জামাতবন্দী হয়ে পড়া হয়নি, এমন কী ওমর (রা.) শাসন কালের প্রথম দিকেও না। তবে ওমর ইবনে খাত্তাবের (রা.) খিলাফতের শেষের দিকে রামাদ্বান মাসের কোনো এক রাতে তিনি মসজিদে গিয়ে দেখলেন মুসল্লিরা একা একা যার যার মত একা অথবা ছোট্ট জামাতে কিয়াম আদায় করছেন। এতে কেউ দাঁড়ানো, কেউ সিজদায়, কেউ রুকুতে, মোট কথা হযবরল অবস্থা। এই বিশৃঙ্খলা দেখে তিনি জামাতবন্দী হয়ে তারাবি পড়তে সবচেয়ে অভিজ্ঞ হাফেযে কুরআন সাহাবি উবাই ইবনে কা'ব (রা.) কে ইমাম হবার জন্যে ডেকে পাঠালেন। এ নির্দেশনার আলোকে সে রাত থেকেই তারাবি সালাত জামায়াতে শুরু হয়ে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে আজ অবধি তা অব্যাহত আছে। পরের রাতে তা তিনি নিজ চোখে দেখে মন্তব্য করলেন ‘কত সুন্দরই না একটা নতুন ব্যবস্থা চালু হয়েছে’। যেহেতু রামাদ্বান মাসে কুরআন তেলাওয়াত করা এবং শোনায় সওয়াব অত্যন্ত বেশি, তাই হয়ত ঐ সময় কুরআনে হাফেযরা তারাবি নামাজে কুরআন খতম করতেন এবং মুসল্লিরা তা শুনে অশেষ সওয়াব হাসিল করতেন। কিন্তু এর বিনিময়ে হাফেয সাহেবরা কোনো আর্থিক সুযোগ-সুবিধা নিতেন না বা মুসল্লিরাও দিতেন না। তবে বর্তমান দুনিয়ায় হাফেযদের ইমাম হিসেবে একমাসের জন্য নিয়োগ দিয়ে প্রত্যেক মসজিদ কর্তৃপক্ষ মাসোহারা বেতনের মতো হাফেযদের জায়েয তরিকায় সর্ব সম্মতিক্রমে সময়ের বিনিময় দেওয়ার রেওয়াজ চালু করেছেন।

কখন বা কত রামাদ্বান তারাবি শেষ করার নিয়ম : রাসুল (সা.) সারা বছরব্যাপী রাতের শেষাংশে তাহজুদের নামাজ আদায় করতেন এবং শেষ করতেন সালাতুল বিতর আদায় করে। তাহজুদের এ নামাজকে ‘সালাতু কিয়ামিল লাইল’ বলা হয়। আর রমাদ্বানে এ নামাজকে বলা হয় ‘কিয়ামু রামাদ্বান’। নবী করিম (সা.) নিয়মিত তাহজুদে দীর্ঘরাত দাঁড়িয়ে থাকতেন, যার ফলে তাঁর পা ফুলে যাওয়ার কথাও বর্ণনায় এসেছে। তিনি দু'রাকাত করে করে তাহজুদ পড়েছেন এবং শেষ করেছেন আরও এক রাকাত বিতর যোগ দিয়ে। এই মাসে যে ইমামের সাথে (সালাত) শেষ করে চলে যাওয়া পর্যন্ত ক্বিয়াম করে, সে সারারাত ক্বিয়াম করেছে বলে হিসাব করা হবে যা ইমাম আবু দাউদ সূত্রে আবু যার (রা.) এর হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “যে ইমাম চলে যাওয়া পর্যন্ত তাঁর (ইমামের) সাথে ক্বিয়াম করল, সে সারারাত ক্বিয়াম করেছে বলে ধরা হবে”। আলবানী একে সহিহ বলেছেন।

কিয়ামুল লাইল হিসেবে রামাদ্বানের রাতে আরও অধিক পরিমাণ নামাজ পড়ার নিয়মও শরিয়তে রয়েছে। ইসলামের প্রথম জামানা থেকেই এ ২০ রাকাত তারাবি চলে এসেছে। এটা সব সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ি, তাবে-তাবেয়িদের আচরিত সুন্নত। দুনিয়ার সব মুজতাহিদ ইমাম, আলেম দেড় হাজার বছর ধরে এভাবেই আমল করে এসেছেন। তারাবি জামাআতে মসজিদে আদায় করা উত্তম। নবী (সা.) এ নামাজ মসজিদে পড়েছেন। তার সাথে লোকজনও নামাজ আদায় করেছে। আগমনকারীরা পরবর্তী রাতেও নামাজ পড়লেন। লোকজনও হয়েছিল বেশি। তারপর লোকজন তৃতীয় কিংবা চতুর্থ রাত্রিতে একত্রিত হলো অথচ আল্লাহর রাসুল (সা.) তাদের নিকট আসেননি। সকাল বেলা তিনি লোকদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা যা করেছ আমি তা দেখেছি, আমার বের না হওয়ার কারণ হলো, আমার ভয় হচ্ছিল যে, এ নামাজ তথা তারাবি তোমাদের উপর ফরজ হয়ে যাবে। (বুখারি : ১১২৯, মুসলিম : ৭৬১)। বর্ণনাকারী বলেন, এ ঘটনা রামাদ্বান মাসে হয়েছিল। তারাবিতে কুরআনের খতম প্রচলিত পদ্ধতিতে ২৭শের রাত না করে ২৯শের রাতেই পূর্ণ করা বিধেয়, তাহলে আরও দু'রাতও সুন্নত তারাবি পড়ার সুবর্ণ সুযোগ হবে। তবে যদি রামাদ্বান ৩০ দিন হয়, তাহলে কেবল ৩০শের রাত কুরআনের যে কোনো সুরা থেকে তারাবি পড়ে নিলেই চলবে।

৯. রামাদ্বানু শাহরুল গুফরান (মাগফেরাত ও নাজাত বা ক্ষমা হাসিলের মাস)

এই মাসে জান্নাতের সকল দরজা খুলে দেওয়া হয়। আর জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। শুধু রামাদ্বানের জন্য বাকী এগারো মাস জান্নাতকে সাজানো হয়। এই মাসে আল্লাহপাক পথভ্রষ্ঠ শয়তানকে বেঁধে ফেলেন, যাতে সে মুমিনদের ওয়াসওয়াস দিতে না পারে। এই মাসে যে কোনো দান-সদকা, ভালো কাজের প্রতিফল আল্লাহপাক ৭০গুণ থেকেও অধিক বাড়িয়ে দিয়ে থাকেন। যা অন্য মাসে মাত্র ১০গুণ। তাছাড়া রাসুল (সা.) বলেছেন ‘যে ব্যক্তি পাক্কা ঈমানদারির সাথে ও প্রচণ্ড ছওয়াবের আশায় রামাদ্বানের ফরজ সাওম পালন করবে, আল্লাহ তাঁর অতীতের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন’ (বুখারি ও মুসলিম)। অনুরূপ বর্ণনায় এসেছে, রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি রামাদ্বানের রাতে নিয়মিত তারাবি সালাহ পাক্কা ঈমানদারির সাথে ও প্রচণ্ড সওয়াবের আশায় আদায় করবে, তাঁরও অতীতের সব পাপ মোচন করে দেওয়া হবে’ (মুত্তাফাক্কুন আলাইহি)। রাসুল (সা.) এর মিম্বরে উঠে জিবরীল (আ.) এর জবাবে ৩বার আমিন বলেছেন যে

বিখ্যাত হাদিসে, সেখানে বর্ণনাকারী মালিক ইবনে হুআয়াইরিস উল্লেখ করেছেন; রাসুল (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার হায়াতে রামাদ্বান পেয়েও নিজের গুনাহ ক্ষমা করাতে পারলোনা সে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যবান" (আত-তারগীব ১৬৭৮ সহিহ) । সুতরাং এ মাসে ক্ষমার নিশ্চয়তা পেতে সারা মাসের সুন্দর আমলগুলো করতে আল্লাহ তা'য়ালার সাহায্য চাওয়া এবং প্রচেষ্টা চালানো একান্ত জরুরি কাজ।

১০. রামাদ্বানু শাহরু ইনফাক্ব ফী সাবিলিল্লাহ (আল্লাহর পথে খরচের মাস)

সাদাক্বাহ ও সকল দান দাতার সম্পদকে সর্বদা বৃদ্ধি করে, কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"যারা আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করে তার উদাহরণ হচ্ছে সেই বীজের মত যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। আর প্রতিটি শীষে একশতটি করে দানা থাকে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অতিরিক্ত দান করেন। আল্লাহ সুপ্রশস্ত সুবিজ্ঞ"। (সুরা বাকারা : ২৬১)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,

مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কোনো কিছু ব্যয় করবে তাকে সাতশত গুণ সওয়াব প্রদান করা হবে" (আহমাদ)। তিনি আরও বলেন, "যে ব্যক্তি নিজের হালাল কামাই থেকে (আল্লাহ হালাল কামাই ছাড়া দান কবুল করেন না) একটি খেজুর ছাদকা করে, আল্লাহ উহা ডান হাতে কবুল করেন অতঃপর তা বৃদ্ধি করতে থাকেন যেমন তোমরা ঘোড়ার বাচ্চাকে প্রতিপালন করে থাক; এমনকি তা একটি পাহাড় পরিমাণ হয়ে যায়" (বুখারি ও মুসলিম)। আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন, তাদের একজন দানকারীর জন্য দু'আ করে বলেন,

اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا

"হে আল্লাহ দানকারীর মালে বিনিময় দান কর"।

আর দ্বিতীয়জন কৃপণের জন্য বদদু'আ করে বলেন,

اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

"হে আল্লাহ কৃপণের মাল ধ্বংস কর" (বুখারি ও মুসলিম)। দানকারীর দুনিয়া-আখিরাতের সকল বিষয় সহজ করে দেয়া হয়। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

"যে ব্যক্তি কোনো অভাব গ্রস্তের অভাব দূর করবে, আল্লাহ তার দু'নিয়া ও আখিরাতের সকল বিষয় সহজ করে দিবেন" (মুসলিম)। গোপন ও প্রকাশ্যে যে কোনোভাবে দান করা যায় এবং সকল দানেই সওয়াব রয়েছে। আল্লাহ বলেন,

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ

"যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর, তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি গোপনে ফকীর-মিসকিনকে দান করে দাও, তবে এটা অধিক উত্তম। আর তিনি তোমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করে দিবেন" (সুরা বাকারা : ২৭১)।

গোপনে দানকারী কেয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া লাভ করবে। নবী (সা.) বলেন, "কেয়ামত দিবসে সাত শ্রেণির মানুষ আরশের নিচে ছায়া লাভ করবে। তম্মধ্যে এক শ্রেণি হচ্ছে–

وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ

"এক ব্যক্তি এতো গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত কি দান করে বাম হাত জানতেই পারে না" (বুখারি ও মুসলিম)। অপর বর্ণনায় এসেছে, নবী (সা.) বলেন, "হে কা'ব বিন উজরা! সালাত (আল্লাহর) নৈকট্য দানকারী, সিয়াম ঢাল স্বরূপ এবং দান-সাদাকা গুনাহ মিটিয়ে ফেলে যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে ফেলে" (আবু ইয়ালা) রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,

اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

"খেজুরের একটি অংশ দান করে হলেও তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা কর" (বুখারি ও মুসলিম)। উক্ববা বিন আমের (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেন, "নিশ্চয় সাদাকা দানকারীর কবরের গরম নিভিয়ে দিবে। আর মু'মিন কেয়ামত দিবসে নিজের সাদাকার ছায়াতলে অবস্থান করবে" (ত্বরানী, বাইহাক্বী)।

লোক দেখানোর জন্য দান : কিন্তু বর্তমান যুগে অনেক মানুষ এমন আছে, যারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দান করে মানুষকে দেখানোর জন্য, তাদের ভালোবাসা নেয়া অথবা প্রশংসা কুড়ানোর জন্য। কিন্তু আখেরাতে তার কোনো প্রতিদান পাওয়া যাবে না। হাদিসে কুদসিতে নবী (সা.) বলেন, আল্লাহ বলেছেন–

أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ

"আমি শির্ককারীদের শিরক থেকে মুক্ত। যে ব্যক্তি কোনো আমল করে তাতে আমার সাথে অন্যকে শরীক করবে, তাকে এবং তার শির্কের আমলকে আমি পরিত্যাগ করব" (মুসলিম)। বরং যারা মানুষের প্রশংসা কুড়ানোর উদ্দেশ্যে দান করবে, তাদের দ্বারাই জাহান্নামের আগুনকে সর্বপ্রথম প্রজ্বলিত করা হবে। রাসুল (সা.) বলেন, "সর্বপ্রথম তিন ব্যক্তিকে দিয়ে জাহান্নামের আগুনকে প্রজ্বলিত করা হবে। তম্মধ্যে সর্ব প্রথম বিচার করা হবে সেই ব্যক্তির, আল্লাহ যাকে দান করেছিলেন বিভিন্ন ধরনের যথেষ্ট অর্থ-সম্পদ। তাকে সম্মুখে নিয়ে আসা হবে, অতঃপর (আল্লাহ) তাকে প্রদত্ত নেয়ামত রাজীর পরিচয় করাবেন এবং সে উহা চিনতে পারবে। তখন তিনি প্রশ্ন করবেন, কি কাজ করেছ এই নেয়ামত সমূহ দ্বারা? সে জবাব দিবে, যে পথে অর্থ ব্যয় করলে আপনি খুশি হবেন এ ধরনের সকল পথে আপনার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেছি। তিনি বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ বরং তুমি এরূপ করেছ এ উদ্দেশ্যে যে, তোমাকে বলা হবে 'দানবীর', এবং তা তোমাকে বলাই হয়েছে। অতঃপর তখন তাকে মুখের উপর উপুড় করে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়া হবে" (মুসলিম)।

আত্মীয়-স্বজনকে দান করা : সালমান বিন আমের (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, "মিসকিনকে দান করলে তা শুধু একটি দান হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু অভাবগ্রস্থ নিকটাত্মীয়কে দান করলে তাতে দ্বিগুণ সওয়াব হয়। একটি সওয়াব সাদাকার; অন্যটি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার" (নাসাঈ, তিরমিযী)।

দান-সাদকা করে খোঁটা দেয়া :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-

খায়রাতকে বরবাদ করে দিও না" (সুরা বাকারা : ২৬৪)। আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেন, "কেয়ামত দিবসে আল্লাহ পাক তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। আবু যার (রা.) বললেন, ওরা ধ্বংস হোক ক্ষতিগ্রস্ত হোক, কারা হে আল্লাহর রাসুল? তিনি বললেন, "১. টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে যারা কাপড় পরিধান করে, ২. দান করে যে খোঁটা দেয় এবং ৩. মিথ্যা শপথ করে যে ব্যবসায়ী পণ্য বিক্রয় করে" (মুসলিম)। কৃপণের পরিণতি : কৃপণতা একটি নিকৃষ্ট কাজ। এর কারণে মনের মাঝে হিংসা সৃষ্টি হয় এবং মানুষ লোভী হয়। এজন্য নবী (সা.) এবিষয়ে উম্মতকে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন, "তোমরা কৃপণতা ও লোভ থেকে সাবধান থাক। কেননা পূর্ব যুগে এই কারণে মানুষ রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, খুনসহ নানা পাপাচার ও হারাম কাজে লিপ্ত হয়েছে" (আবু দাউদ, হাকেম)। এজন্য নবী (সা.) কৃপণতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তিনি দু'আয় বলতেন, "হে আল্লাহ তোমার কাছে কৃপণতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি" (মুসলিম)।

১১. রামাদ্বানু শাহরুত্তাওবাহ (তাওবাহ ও ইস্তিগফারের মাস)

আল্লাহ এই মাসে জান্নাতসমূহের দরজা সমূহ খুলে দেন, এ মাসে জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করে দেন এবং শয়তানদের শিকলবদ্ধ করেন। এ মাসের প্রতিরাতে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে (তাঁর বান্দাদের) মুক্ত করেন। ইমাম আহমাদ (৫/২৫৬) আবু উমামাহ'র হাদিস থেকে বর্ণনা করেছেন যে নবী (সা.) বলেছেন, "আল্লাহর রয়েছে প্রতি ফিত্বরে (ইফত্বারের সময় জাহান্নাম থেকে) মুক্তিপ্রাপ্ত বান্দা।" আবু সা'ঈদের বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহর রয়েছে (রামাদ্বান মাসে) প্রতি দিনে ও রাতে (জাহান্নাম থেকে) মুক্তিপ্রাপ্ত বান্দাগণ আর নিশ্চয়ই একজন মুসলিমের রয়েছে প্রতি দিনে ও রাতে কবুল হওয়া দুআ।"

১২. রামাদ্বানু শাহরুল উমরাহ (উমরাহ পালনের মাস)

এই মাসে "উমরাহ করা হজ করার সমতূল্য" (বুখারি : ১৭৮২, মুসলিম : ১২৫৬)। ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) আনসারদের এক মহিলাকে প্রশ্ন করলেন, "কিসে আপনাকে আমাদের সাথে হজ করতে বাঁধা দিল? তিনি বললেন, আমাদের শুধু পানি বহনকারী দুটি উটই ছিল। তাঁর স্বামী ও পুত্র একটি পানি বহনকারী উটে করে হজে গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, আর আমাদের পানি বহনের জন্য একটি পানি বহনকারী উট রেখে গেছেন। তিনি (রাসুলুল্লাহ) বললেন, "তাহলে রামাদ্বান এলে আপনি 'উমরাহ করেন কারণ, এ মাসে 'উমরাহ করা হজ করার সমতূল্য।" মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, "কারণ এ মাসে 'উমরাহ করা আমার সাথে হজ করার সমতূল্য।" আল্লাহ সবাইকে এমনটি করার তাওফিক দিন।

১৩. রামাদ্বানু শাহরুল ই'তিকাফ (ই'তিকাফ করার মাস)

এ মাসে ই'তিকাফ করা সুন্নাহ কারণ নবী (সা.) তা নিয়মিতভাবে করতেন, যেমনটি বর্ণিত হয়েছে আয়িশাহ (রা.) থেকে "আল্লাহ তাঁকে (রাসুলুল্লাহকে) মৃত্যু না দেওয়া পর্যন্ত রামাদ্বানের শেষ দশ দিনে ই'তিকাফ করতেন। তাঁর পরে তাঁর স্ত্রীগণও ই'তিকাফ করেছেন" (বুখারি : ১৯২২, মুসলিম : ১১৭২)। রামাদ্বান মাসে কুরআন অধ্যয়ন ও তা বেশি বেশি তিলাওয়াত করা মুত্তাকীদের সাথে করণীয় এক মুস্তাহাব (পছন্দনীয়) কাজ। আর কুরআন অধ্যয়ন হল একজন অপরজনকে কুরআন পড়ে শুনাবে এবং অপরজনও তাকে তা পড়ে শুনাবে। আর তা মুস্তাহাব হওয়ার দলিল, "যে জিবরীল রামাদ্বান মাসে প্রতি রাতে নবী-(সা.) এর সাথে সাক্ষাৎ করে কুর'আন অধ্যয়ন (বুঝে বুঝে পড়া বা তিলাওয়াত) করতেন" (বুখারি : ৬, মুসলিম : ২৩০৮)।

১৪. রামাদ্বানু শাহরুল ফুতুরি ওয়াস সুহুর (ইফতার ও সেহরির মাস)

রমাদ্বানে সাওম পালনকারীকে ইফতার করানো মুস্তাহাব যার দলিল যাইদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী হতে বর্ণিত হাদিস যাতে তিনি বলেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো সাওম পালনকারীকে ইফতার করায়, তাঁর (সাওম পালনকারীর) এবং যে করালো উভয়ের সমান সাওয়াব হবে, এতে সাওম পালনকারীর সাওয়াব কোনো অংশে কমবে না" (তিরমিযী : ৮০৭, ইবনু মাজাহ : ১৭৪৬)।

১৫. রামাদ্বানু শাহরু সাদাক্বাতিল ফিতর : (ফিতরাহ আদায়ের মাস)

ফিতরা কাকে বলে? ফিতরাকে শরীয়তে 'যাকাতুল ফিতর কিংবা সাদাকাতুল ফিতর' বলা হয়েছে। অর্থাৎ ফিতরের যাকাত বা ফিতরের সাদাকাহ। ফিতর বা ফাতূর বলা হয় সেই আহারকে যা দ্বারা রোজাদার রোজা ভঙ্গ করে। আর যাকাতুল ফিতর বলা হয় ঐ জরুরী দানকে যা, 'রোজাদার ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে অভাবীদের দিয়ে থাকে। যেহেতু দীর্ঘ দিন রোজা অর্থাৎ পানাহার থেকে বিরত থাকার পর ইফতার বা আহার শুরু করা হয় সে কারণে এটাকে ফিতরের তথা আহারের যাকাত বলা হয়'। (ফাতহুল বারী ৩/৪৬৩)। সাদাক্বাতুল ফিতর শরীয়তের অন্যতম বিধান, যা আদায় করা ওয়াজিব। রাসুলুল্লাহ (সা.) যা আদেশ করেছেন তা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক আদেশ করার সমতুল্য। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন:

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ عَلَيۡهِمۡ حَفِيظٗا

'যে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর হুকুম মান্য করল, সে আল্লাহর হুকুমই মান্য করল। আর যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল, আমি আপনাকে তাদের জন্য পুলিশ হিসেবে কঠোরতার জন্য নিযুক্ত করে পাঠাইনি'। (নিসা:৭০) । আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন:

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

'আর রাসুলুল্লাহ (সা.) তোমাদের যা আদেশ করেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক'। (হাশর: ৭) । সাদাকাতুল ফিতর মুসলিম নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সকলের উপর ওয়াজিব। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) রমাদ্বানে আযাদ, গোলাম, নারী-পুরুষ, ছোট-বড়ো সকল মুসলিমের উপর এক সা' খেজুর, বা এক সা' যব সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব করেছেন। পেটের বাচ্চার পক্ষ থেকে সাদাকাতুল ফিতর দেয়া ওয়াজিব নয়, কিন্তু কেউ যদি আদায় করে, তাহলে নফল সাদাক্বাহ হিসেবে আদায় হবে। উসমান (রা.) পেটের বাচ্চার পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর আদায় করতেন। ফিতরা নিজের পক্ষ থেকে এবং নিজের পরিবারবর্গের সবার পক্ষ থেকে আদায় করবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

'আমি যখন তোমাদের কোনো বিষয়ে আদেশ করি, তখন তোমরা তা

সাধ্যানুযায়ী পালন কর'। সাদাক্বাতুল ফিতর দ্বারা আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) সাদাক্বাতুল ফিতর ওয়াজিব করেছেন অশ্লীল ও অনর্থক কথা-বার্তার কারণে সিয়ামে ঘটে যাওয়া ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো দূর করার জন্য ও মিসকিনদের খাদ্য প্রদানের জন্য। ঈদের সালাতের পূর্বে আদায় করলে তা সাদাক্বাতুল ফিতর হিসাবে গণ্য হবে। আর ঈদের সালাতের পর আদায় করলে তা অন্যান্য সাধারণ দানের মত একটি দান হিসেবে গন্য হবে।

যা দ্বারা সাদাক্বায়ে ফিতর আদায় করা যায় : মানুষের সাধারণ খাবার জাতীয় বস্তু দ্বারা সাদাক্বায়ে ফিতর আদায় করা যায়। যেমন, খেজুর, গম, চাল, যব, পনির, ঘি ইত্যাদি। বুখারি ও মুসলিমে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সা.) সাদাকাতুল ফিতর খেজুর অথবা যব দ্বারা আদায় করতে বলেছেন। যবের ক্ষেত্রে দুই দিনের খাবারের সমপরিমণ যব প্রদান করা। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেছেন, রাসুল (সা.) এর যুগে আমরা খাবার জাতীয় জিনিস দ্বারা সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতাম। সে সময় আমাদের সবার খাবার ছিল পনির, ঘি এবং খেজুর। রাসুল (সা.) সাদাক্বায়ে ফিতর খাদ্যের মাধ্যমে আদায় করা ফরজ করেছেন। খাদ্যমূল্য দ্বারা আদায় করলেও আদায় হবে না। যেহেতু এটা রাসুল (সা.) এর নির্দেশের বিপরীত। রাসুল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন আমল করল, যে ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ নেই, তা পরিত্যাজ্য।' অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, 'যে আমাদের দ্বীনে এমন জিনিস সৃষ্টি করল, যা আমাদের ধর্মে নেই, তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য'। (মুসলিম)। তাছাড়া খাদ্যমূল্য প্রদান করা সাহাবাদের আমলের পরিপন্থী। কারণ, তারা খাদ্যজাতীয় বস্তু দ্বারাই সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতেন। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'তোমরা আমার সুন্নত এবং আমার পরবর্তীতে সঠিক পথে পরিচালিত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত আকড়ে ধর'। অতএব সাদাকাতুল ফিতর নির্দিষ্ট একটি এবাদত, তাই অনির্দিষ্ট বস্তু দ্বারা আদায় করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। যদিও এ বিষয়ে ফক্বীহগণ অবস্থার আলোকে ব্যবস্থা নেবার স্বার্থে বিশষত প্রবাসীদের বেলায় নিজ আত্বীয়দের নগদ অর্থ পাঠিয়ে দিতে সম্মতি দিয়েছেন। তবে এটি উত্তম নয়, উত্তম হলো একটি দেশের মানুষের জাতীয় প্রধান খাদ্য দিয়েই ফিতরাহ আদায় করা।

সাদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ : রাসুলুল্লাহ (সা.) এর যুগের এক সা'। যার ওজন চার শত আশি মিসকাল গম। ইংরেজী ওজনে যা দুই কেজি ৪০ গ্রাম গম। অতএব রাসূলের যুগের সা' জানতে ইচ্ছা করলে, তাকে দুই কেজি চল্লিশ গ্রাম গম ওজন করে এমন পাত্রে রাখতে হবে, যা মুখ পর্যন্ত ভরে যাবে। অতঃপর তা পরিমাপ করতে হবে। সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব কাদের উপর: ঈদের রাতে সূর্যাস্তের সময় জীবিত থাকলে তার উপর সদকাতুল ফিতর আদায় করা আবশ্যক, নতুবা নয়। সুতরাং কেউ সূর্যাস্তের এক মিনিট পূর্বে মারা গেলে তার উপর ওয়াজিব হবে না। এক মিনিট পরে মারা গেলে অবশ্যই তার পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে। যদি কোনো শিশু সূর্যাস্তের কয়েক মিনিট পর ভূমিষ্ট হয়, তার উপরও আবশ্যক হবে না, তবে আদায় করা সুন্নত। আর সূর্যাস্তের কয়েক মিনিট পূর্বে ভূমিষ্ট হলে তার পক্ষ থেকেও ফিতরাহ আদায় করতে হবে।

সাদাকাতুল ফিতর আদায়ের সময়

১. ফজিলতপূর্ণ সময় : ঈদের দিন সকালে ঈদের সালাতের পূর্বে। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ (সা.) এর যুগে সাদাকাতুল ফিতর ঈদুল ফিতরের দিন এক সা' পরিমাণ খাদ্য দিয়ে আদায় করতাম। (বুখারি) ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) মানুষের ঈদের সালাত পড়তে যাওয়ার পূর্বে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করার আদেশ দিয়েছেন। ঈদের পর আদায় করলে তা সাধারণ দানের মত গণ্য হবে।

২. জায়েয সময় : ঈদের এক বা দু'দিন পূর্বে সদকাতুল ফিতর আদায় করা। বুখারিতে আছে, নাফে (রা.) বলেন, ইবনে ওমর (রা.) নিজের এবং ছোট-বড়ো সন্তানদের পক্ষ থেকে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতেন, এমনকি আমার সন্তানদের পক্ষ হতেও। তিনি যাকাতের হকদারদের ঈদের একদিন বা দুদিন পূর্বে সাদাকাতুল ফিতর দিতেন, তবে ঈদের সালাতের পর আদায় করা জায়েয নেই। যদি কেউ শরিয়ত সমর্থিত কারণ বশত বিলম্ব করে, তাহলে অসুবিধা হবে না। ওয়াজিব হচ্ছে, সাদাকাতুল ফিতর তার প্রাপকের হাতে সরাসরি বা নিয়োজিত ব্যক্তির মাধ্যমে যথাসময়ে সালাতের পূর্বেই পৌঁছানো। তবে বাহক পৌঁছাতে বিলম্ব করলে ফিতরাহ আদায় হয়ে যাবে।

সাদাকাতুল ফিতরের হকদার হচ্ছেন : (১) দরিদ্র (২) ঋণ আদায়ে অক্ষম (৩) ঋণগ্রস্ত, তাকে প্রয়োজন পরিমাণ দেয়া যাবে। যেহেতু রাসুলুল্লাহ (সা.) সাদকাতুল ফিতরের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন, কিন্তু বণ্টনের বেলায় নির্ধারিত কোনো কড়াকড়ি যেহেতু নেই, তাই এক বা একাধিক লোককে তা দেয়া যেতে পারে।

রামাদ্বান মূলত আমাদের মুক্তির বারতা : রামাদ্বান এক বিশাল সওয়াবের মৌসুমের নাম। তবু ১৫টি পয়েন্টে সাজিয়ে রামাদ্বানের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছি। মূলত আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাহদের ক্ষমা করার জন্য একটি বিশাল মৌসুমের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছেন। বিভিন্ন ঈদ উপলক্ষ্যে দেশের প্রেসিডেন্ট যেমন কয়েদীদের ক্ষমা করে জেল থেকে মুক্তি দেয়ার ঘোষণা দেয়।

উপসংহার

আসুন হে মুসলিম ভাই-বোন! এত সুযোগ পেয়েও যদি আমাদের আত্মোপলব্ধি না হয়, তাহলে আর কখন পাপ মোচনের সুযোগ গ্রহণ করবো। যেহেতু বছরে এ সুযোগ আমাদের দ্বারে একবারই আসে। আল্লাহ তাআলার মূল টার্গেট হচ্ছে একমাস সাওম পালনের মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে যেন 'তাকওয়া' সৃষ্টি হয় এবং পার্থিব জীবন পরিচালনায় ঘরে-বাইরে সর্বত্র এর প্রয়োগ করি। কেননা এ তাক্বওয়ার ফলাফল হিসেবে তিনি বলেছেন,

إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

'নিশ্চয় যে 'তাকওয়ার নীতি' অবলম্বন করবে এবং ছবরের সাথে জীবন চালাবে, আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করবেন না' (ইউসুফ : ৯০)। সুতরাং কীভাবে সবচেয়ে সুন্দর ইবাদতের মধ্য দিয়ে এ মাসটি পালন করতে পারি এটাই হচ্ছে প্রবন্ধের আসল প্রতিপাদ্য বিষয়, আল্লাহ তাআলা আমাদের এবারের রমাদ্বানে সে লক্ষ্য হাসিলের তৌফিক দিন। আমিন।

লেখক : উলামা এন্ড রিলিজিয়াস লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট সেক্রেটারি, এমসিএ।

মুসলিম মাইনোরিটি এলাকায় রামাদ্বান পালন

ডা. মোহাম্মদ আমিন

ভূমিকা :

খোলাফায়ে রাশেদার যুগে ইসলাম একটি সম্প্রসারণশীল জনগোষ্ঠী হিসাবে প্রধানত আরব ভূখণ্ডে বিরাজ করছিল। কিন্তু বর্তমানে দুই বিলিয়ন মুসলমান বিশ্বের আনাছে-কানাছে ছড়িয়ে পড়েছে। শিক্ষা, ব্যবসা, চাকরি এমনকি স্থায়ীভাবে বসবাস করার প্রয়োজনে। আমরা জানি রামাদ্বানের সিয়াম সাধনা ইসলামের একটি অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। অতএব বিভিন্ন পরিবেশে বিশেষত মুসলিম মাইনোরেটি (মোট জনসংখ্যার মোট ১০% এর নিচে) এলাকায় কীভাবে সিয়াম সাধনা করা হবে এবং সেখানে কী কী চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা রয়েছে সে বিষয়ে এ প্রবন্ধে আলোচনা করতে হবে।

রামাদ্বান পালনে করণীয় :

এ আলোচনায় মুসলিম মাইনোরিটি এলাকা বলতে আমরা প্রধানত বর্তমানে ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলোকে বুঝাচ্ছি যেক্ষেত্রে এ অঞ্চলকে ২ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক অংশে থাকবে প্রধান প্রধান শহরগুলো যেখানে কমবেশি মুসলমানদের অবস্থান রয়েছে। এক দেশের না হলেও বিভিন্ন মুসলিম দেশের সমন্বয়ে এক ক্ষুদ্র পরিসরের বিশ্ব মুসলিম কমিনিটির অস্থিত্ব দেখা যায়। এ জাতীয় পরিবেশে জুমা আদায়, জামায়াতে নামাজ আদায়, তারাবি, ঈদের নামাজসহ রামাদ্বানের অন্যান্য ইবাদতসমূহ পালন করা সহজ হয়ে যায়। এ অবস্থা অবশ্য ভিন্ন ছোট ছোট শহরগুলোতে, এমন রিমোট এলাকাও থাকতে পারে যেখানে একজন মুসলিম হয়তো নিজেকে ছাড়া তার আশেপাশে পরিচিতদের মাঝে অন্য কোন মুসলিম খুঁজে নাও পেতে পারেন। এ জাতীয় পরিস্থিতিতেও একজন মুসলিম হিসাবে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে, নামাজ, রোজাসহ ইসলামের মৌলিক বিধি বিধানের প্রতি অটল থাকা। এক্ষেত্রে সূর্যদয়, সূর্যাস্তের লোকাল ক্যালেন্ডারসহ নিকটবর্তী ইসলামি সেন্টারের টাইম টেবিলকে ফলো করা যেতে পারে। জুমার নামাজ আদায়ের জন্য হয়তো অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে অন্যান্য মুসলিমদের খোঁজার চেষ্টা করা উচিত। আমার বিশ্বাস খুব নিকটে না হলেও আশেপাশে অন্য মুসলিম দেশের মুসলমানদের সন্ধান পেতে পারবো এ জাতীয় পরিস্থিতিতে। আমার মনে পড়ে সম্ভবত ১৯৯৪ সালে Boston এর Pilgrim হাসপাতালে আমি আরেকজন পাকিস্তানি ভাইয়ের সাথে এশা ও তারাবির নামাজ জামাতে আদায় করতাম। এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে খেয়াল করতে হবে। আমাদের ঈদের ছুটির জন্য বেশ আগে আবেদন করতে হবে। কারণ মেইনস্টিমের অনেক প্রতিষ্ঠানে ৬ থেকে ৮ সপ্তাহের আগে ছুটির দরখাস্ত করতে হয়। তার পাশাপাশি জুমা এবং ঈদের জামায়াতের জন্য যেখানে মসজিদ নেই সেখানে হল ভাড়া করে বিকল্প ঈদের জামাত ও ঈদ সমাবেশ এবং জুমা তারাবি চেষ্টা করা যেতে পারে।

রামাদ্বানে আমরা কীভাবে ইসলামকে তুলে ধরতে পারি :

মুসলিম মাইনোরিটি এলাকায় রামাদ্বানের রোজা পালন করা একদিকে যেমন কঠিন অন্যদিকে অমুসলিমদের কাছে অর্থাৎ পৃথিবীর ৬ বিলিয়ন অমুসলিমের কাছে ইসলামের আহ্বান তুলে ধরার যে দায়িত্ব আমাদের উপর আছে তা পালন করার এক বিরাট সুযোগ হলো মাহে রমজান। এক্ষেত্রে বেশকিছু ইতিবাচক কাজের উল্লেখ করা যায়। আমরা জানি ২০১৬ সালে জাপানি অধ্যাপক ওসমির অটোপিজির উপরে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর থেকে Fasting (উপবাস/রোজা) যে একটি স্বাস্থ্যকর জীবন পদ্ধতি তা বিশ্বব্যাপী সার্বজনীনভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এর পাশাপাশি গত কয়েকমাস ধরে ফিলিস্তিনে ইসরাইলের ব্যাপক গণহত্যার কারণে ইসলাম এবং মুসলমানদের সম্পর্কে বিশ্বের বিবেকবান মানুষের মন আকৃষ্ট হয়েছে। উল্লেখ্য রামাদ্বান উপলক্ষ্যে

কোন কোন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের থেকে ওয়েলকাম ম্যাসেজ দেওয়া হয়ে থাকে। তার পাশাপাশি আমরা দেখি ১৯৯৬ সাল থেকে হোয়াইট হাউজের এ্যানুয়েল ইফতার গ্যাদারিংসহ পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধান ও মেয়রদের পক্ষ থেকে ইফতার মাহফিলের আয়োজন, রামাদ্বানের পরিচিতি ও ভাবমূর্তি ইউরোপ, আমেরিকাতে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা দেখি রামাদ্বান উপলক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থল থেকে রামাদ্বান সচেতনতা লিফলেটসহ মুসলিম সহকর্মীদের এবং সহপাঠীদের সাথে কীভাবে আচরণ করতে সে বিষয়ে নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এর পাশাপাশি আমরা আরও দেখি সমাজের কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও নওমুসলিমরাও রামাদ্বানের সময় মুসলমান সহকর্মী এবং বন্ধুদের প্রতি একাত্মতা ঘোষণার জন্য দিনের বেলা কোন কোন দিন পানাহার বন্ধ রাখার দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অক্সফোর্ড, বার্মিংহামসহ বিভিন্ন শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামি সোসাইটি এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আয়োজিত কমিউনিটি ইফতার মাহফিল। আমরা তদুপুরি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের সহপাঠী ও সহকর্মীদের ঈদ উপহার দিতে পারি। আর প্রতিবেশীদের ইফতার করাতে পারি। সর্বোপরি ইউরোপ, আমেরিকায় লোকদের পড়াশুনার যে তৃষ্ণা রয়েছে সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তাদের মধ্যে আমরা কুরআনসহ ইসলামি সাহিত্য বিতরণ করতে পারি।

ইসলাম সম্পর্কে যেন ভুল ধারণা সৃষ্টি না হয় : আমাদের একটি বিষয় খেয়াল রাখা দরকার যে, কিছু কিছু আচরণ রামাদ্বানে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কিন্তু মুসলিম মাইনোরিটি এলাকায় সেই সমস্ত আচরণ ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা অথবা ইসলামের ভাবমূর্তি প্রশ্নবোধক করতে পারে। যেমন সেহরির সময় যদি আমরা সশব্দে রান্না-বান্না করি অথবা ডাইনিং হলের শব্দের মাধ্যমে আমাদের দেয়ালের অপর পাশে প্রতিবেশী অমুসলিমের ঘুম বা বিশ্রামে সমস্যা সৃষ্টি করা মোটেই কাম্য হতে পারে না। নামাজ পড়ার আগে দাঁত ব্রাশ করা সুন্নাত আমরা জানি এবং আমল করি। আমার পরামর্শ হচ্ছে– রামাদ্বানে কাজে অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার আগেও ভালভাবে দাঁত ব্রাশ করা প্রয়োজন। আরেকটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হলো, দুপুর বেলায় অথবা বিকালে আমরা কাজে যেন অমনোযোগী হয়ে না পড়ি। এজন্য প্রয়োজনীয় বিশ্রাম আগেই নেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে দুপুরে খাওয়ার বিরতির সময় স্বল্প সময়ের জন্য বিশ্রাম নেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় আমাদের যত্নবান হওয়া উচিত। তা হলো আমরা যখন রাতের বেলা নফল ইবাদত বেশি করবো তা যেন আমাদের দিনের বেলা কার্যক্রমকে ব্যাহত না করে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন যথাযথ টাইম ম্যানেজমেন্ট বা পর্যাপ্ত বিশ্রামের জন্য সময় অথবা প্রয়োজনীয় ছুটির এরেজমেন্ট করা। এ ব্যাপারে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, হাসপাতালে রামাদ্বানে মুসলিম রোগীদের মাঝে অনাকাঙ্ক্ষিত অনুপস্থিতি সংখ্যা বেড়ে যায়। রামাদ্বানে যদি কোন ভাই-বোন হাসপাতাল বা জিপির অ্যাপয়েন্টমেন্ট এটেন্ট করতে না চান তা পূর্বে জানিয়ে দেওয়া দরকার। যাতে করে ঐ অ্যাপায়েন্টমেন্টের শলটটি থেকে অন্যরা উপকৃত হতে পারেন। তা না করলে একদিকে যেমন এই প্যাসিলিটি আমরা নিজেরা গ্রহণ করছি না অন্যদিকে অন্যদেরকেও এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার ফলে মুসলমানদের দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে অমুসলিমদের মাঝে প্রশ্নবোধক চিহ্ন সৃষ্টি হয়ে থাকে। আশাকরি এ

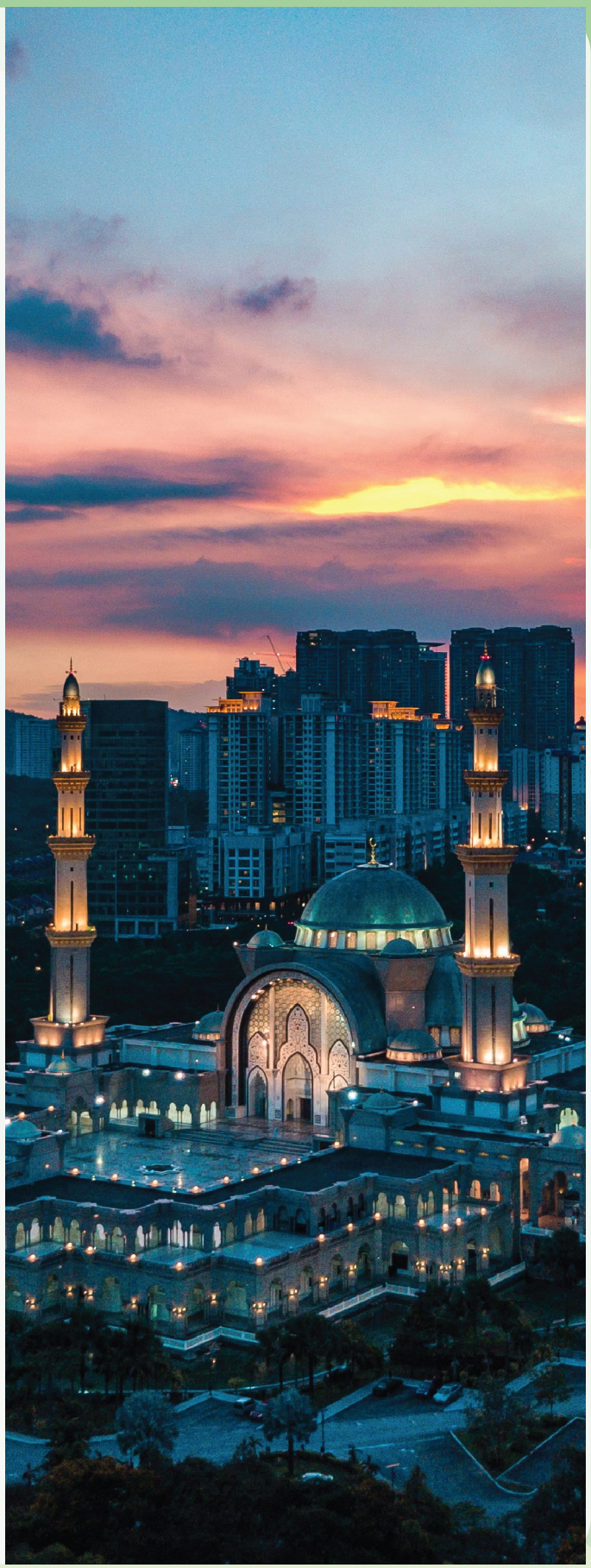

জাতীয় আরও অনেক বিষয়ে আমরা সচেতন হবো ইনশাআল্লাহ।

প্রতিকূল পরিস্থিতিতে করণীয় : মানবসৃষ্ট অথবা প্রাকৃতিক এবং গবেষণার কাজে মানবজাতিকে আজ বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মাঝে জীবনযাপন করতে হচ্ছে। এসব পরিস্থিতিতে রামাদ্বানের রোজা পালন সম্পর্কে এখন আলোচনা করা হবে।

ক. চীন : বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর দেশটিতে প্রায় ২% (২০ মিলিয়ন) মুসলিম হওয়ার পরও চীনের কমিউনিষ্ট সরকার দীর্ঘদিন ধরে উইঘুর মুসলমানদের উপর ধর্মীয় নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু মসজিদ বন্ধ করে তারা ক্ষান্ত হননি, বরং শুক্রবারে শুকরের গোস্ত খেতে বাধ্য করার মত খবর পাওয়া যাচ্ছে এবং যারা অস্বীকার করছে তাদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সাথে সাথে রামাদ্বানে রোজা পালন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে মুক্ত বিশ্বের গণতান্ত্রিক জনগোষ্ঠীসহ সারাবিশ্বের মুসলমানদের চীনের ধর্ম পালনের অধিকার স্তব্ধ করে দেওয়ার এই নেক্কারজনক অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া একান্ত জরুরি।

খ. স্লাভাকিয়া : স্লাভাকিয়া হচ্ছে– ইউরোপীয় ইউনিয়নের একমাত্র সদস্য দেশ যেখানে মুসলমান থাকার পরও কোনো মসজিদ প্রতিষ্ঠা হতে দিচ্ছে না। প্রায় ১০ হাজার মুসলিম অধ্যুষিত এদেশে মুসলমানরা একাধিকবার একমাত্র মসজিদ স্থাপনের অনুমতির জন্য চেষ্টা করলেও ইসলাম বিরোধী সরকার তা অনুমোদন দিচ্ছে না। এ পরিস্থিতিতে জুমা আদায়, ঈদের নামাজ আদায়, তারাবিসহ ৫ ওয়াক্ত নামাজ জামাতে আদায় করার কোন ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। তাই ইউরোপীয় ইউয়িনর্ভুক্ত মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইউরোপীয়ান কোর্ট অব জাস্টিজে স্লাভাকিয়ার ধর্মীয় স্বাধীনতা বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সরকারকে বিচারের মুখামুখী করা আজ সময়ের দাবি হয়ে পড়েছে।

গ. দুই মেরুতে অবস্থানরত জনগোষ্ঠী: অর্থাৎ উত্তর মেরু বা আরটিক সার্কেল এবং দক্ষিণ মেরু বা এন্টার্টিকাতে যে সমস্ত মুসলমানরা বসবাস করছেন তাদের সেখানে প্রাকৃতিক অবস্থার কারণে এক্সট্রিম সেসুয়েশান বিরাজ করছে। কোনো কোনো জায়গা এমন রয়েছে যেখানে ৬ মাস রাত আর ৬ মাস দিন কখন কখন সূর্য মোটেই অস্ত যায় না। এ পরিস্থিতিতে ইসলামি চিন্তাবিদগণ মতামত দিয়েছেন যে, হয় তারা নিকটবর্তী দেশে যেখানে সূর্য উদয় বা অস্ত হয় সেখান কার সময় অনুযায়ী রোজ রাখবেন, নামাজ পড়বেন অথবা কেউ কেউ মত দিয়েছেন সরাসরি কাবা শরীফের সময় অনুযায়ী রোজা ও নামাজ আদায় করবেন।

ঘ. ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন (ISS) : আমরা জানি এ ভ্রাম্যমান আন্তর্জাতিক ল্যাবরেটরিটি ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২৫০ মাইল উপরে পৃথিবীর কক্ষপথে দৈনিক পৃথিবীতে ১৬ বার প্রদক্ষিণ করছে। ১৯৯৮ সালে উৎক্ষেপণের পর থেকে ২৭৪ নভোচারী জন বিভিন্ন মেয়াদে সেখানে গবেষণার কাজে নিয়োজিত হয়েছেন। তাদের মাঝে ১৭ জন মুসলিম (৪ জন মুসলিম মহিলাসহ) মুসলিম নভোচারী সেখানে অবস্থান করছেন। সেখানে থেকে কীভাবে ৫ ওয়াক্ত নামাজ এবং রামাদ্বানের সিয়াম সাধনা করা যাবে সেজন্য মালয়েশিয়ার ফতোয়া কাউন্সিলের পক্ষ থেকে গাইড বুক তৈরি করা হয়েছে। সেদিন হয়তো বেশি দূরে নয় পৃথিবীর বাহিরে যদি মানুষের বসবাস স্থায়ী হতে থাকে যেমন চন্দ্র এবং মঙ্গলে তাহলে সেখানকার জনগোষ্ঠীর জন্য মসজিদ, কেবলা, নামাজের সময়সূচি এবং রামাদ্বানের নির্দেশিকা তৈরি করতে হবে।

উপসংহার : মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় রামাদ্বান পালন অনেকটা স্রোতের অনুকূলে চলার মত সহজ। অপরদিকে মুসলিম মাইনোরিটি এলাকায় নামাজ, রোজাসহ ইসলামি হুকুম আহকাম পালন করা স্রোতের বিপরীতে পথ চলার মত কঠিন। তার পাশাপাশি অমুসলিমদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া দায়িত্বও এ এলাকার মুসলিদের উপর বিশেষভাবে বর্তায়। কারণ এ এলাকাতে সারা বিশ্বের ৬ বিলিয়ন অমুসলিমদের অধিকাংশ পাশ। আর এ জন্য আমরা জানি কুরআন এবং হাদিসের এই দিগুণ দায়িত্ব পালন করার কারণে অনেক বেশি সওয়াবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের মুসলিম মাইনোরিটি এলাকায় ধৈর্যের সাথে নিজের দ্বীন ইসলামের উপর অটল থেকে নামাজ, রোজাসহ ইসলামি অনুশাসন পালন করার তৌফিক দান করুন এবং সাথে সাথে এ এলাকার ব্যাপক অমুসলিমদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ পাক আমাদের সহায় হোন এবং আমাদের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন আমাদের কাজকে সহজ করুন। আমিন।

লেখক : যুক্তরাজ্য কর্মরত চিকিৎসক ও লেখক।

তথ্যসূত্র:

১.Productive Muslims: Mohammed Faris
২.Fiqh of Muslim minorities
৩.Ramadan Fasting in the light of medical science: Prof Dr Ghulum Moazzem
৪.Nobel Laureate (2016) on Autophagy (``Professor Yoshinori Ohsumi: What is autophagy? A dynamic cellular recycling process")
৫.As Ramadan begins, China's Muslims face fasting bans (https://www.rfa.org/english/news/china/china-ramadan-03232023135232.html)
৬.Wikipedia & other internet sources.
৭.Quran (41:33) Abu Dawud 2490

রামাদ্বান : প্রশিক্ষণের এক অনুপম মাস

ড. আব্দুস সালাম আজাদী

রামাদ্বানকে আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য এক অনুপম উপহার হিসেবে পাঠিয়েছেন। উম্মাতে মুহাম্মদির একাধিক চাহিদা তিনি এই মাসের মাধ্যমে পূরণ করেছেন। আমাদের নবী (সা.) এই উম্মাতের বয়স হবে ৬০ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে– বলে জানিয়েছেন। কিন্তু তাদের কাজ হবে অনেক বড়ো, অনেক বিস্তৃত এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তাদেরকে شهادة على الناس এর দায়িত্ব দেবেন কেয়ামতে। এর অর্থ তারা সকল মানুষের আমলের সাক্ষী হবে এবং সমস্ত নবীগণ দায়িত্ব পালন করেছে কিনা তার ও সাক্ষ্য দেবে উম্মাতে মুহাম্মাদি। আমি মনে করি, আল্লাহ আমাদেরকে এই রামাদ্বান দিয়ে সেই দায়িত্ব আঞ্জাম দেবার যোগ্য করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। রামাদ্বানের মাধ্যমে আমাদের মান বৃদ্ধি হবে দুই ভাবে–

এক. এই মাসে প্রতিটি আমলের সওয়াব অনেকগুণ বৃদ্ধি করা হয়। কখনো দশগুণ বাড়ে, কখনো সত্তরগুণ, আবার কখনো সাত শতগুণ বাড়তে পারে। এমনকি কিছু কিছু আমলের প্রতিদান হিসেবেরও বাইরে চলে যায়। সেখানে আল্লাহ নিজেই বলেই দেন, "আমিই তার প্রতিদান হয়ে যাবো।"

দুই. কারো জীবনে লাইলাতুল ক্বাদর এলে তো অনেক বড়ো সৌভাগ্যের প্রতীক হয়ে যায়। কারণ ঐ রাতের মর্যাদা হাজার রাতের চেয়েও বেশি। এর মানে, একজন যদি তার জীবনে ষাট সত্তর বার এই রাত পায়, তা হলে তার আমল, কয়েক হাজার বছর হায়াত প্রাপ্ত ব্যক্তির আমলের কাছাকাছি চলে যায়। আল্লাহ তায়ালা দ্বিতীয় হিজরিতে রামাদ্বানের রোজা ফরজ করেন। কেন এই একটি মাস সিয়াম ফরজ করলেন তা ফুটে উঠেছে তাঁর ভাষায়–

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

অর্থাৎ আল্লাহ চান তোমাদের জন্য সহজ করবেন, তিনি তোমাদের জন্য কঠিন করতে চান না। তিনি চান তোমরা যেন ইদ্দাহ (কোর্স) পূর্ণ করতে পারো, এবং হেদায়াত পাওয়ার কারণে তোমরা আল্লাহর মাহাত্ম্য প্রকাশ করো। আর এভাবে তোমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সম্ভব হতে পারে। যদিও অনেক মুফাসসিরিন মনে করেন এই ৪টা কারণ আল্লাহ তায়ালা অসুস্থ ও মুসাফিরের ভাঙা-রোজা অন্য মাসে আদায় করার করণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু ইমাম কুরতুবির (র.) বক্তব্যকে আমি প্রাধান্য দিয়েছি। তিনি রামাদ্বানের রোজা ফরজ হওয়ার কারণ হিসেবে এই ৪টা বিষয় বলা হয়েছে বলে একটা মত উল্লেখ করেছেন। ত্রিশটা দিন এক নাগাড়ে সিয়াম পালনে দেহ ও মনে, পরিবার ও সমাজে, রাষ্ট্র ও বিশ্বে একটা পরিবর্তন আসে, অথবা বলতে পারেন একটা নতুনত্ব আসে। এতে করে অবশেষে আভাসে অভ্যাসে, কথায় কাজে, লেনদেনে অথবা প্রাপ্তিতে বা গ্রহণে এক অপার্থিব শক্তি ও পবিত্রতা তৈরি হয়। আমার বিশ্বাস মুসা (আ.) এর ত্রিশ দিনের সিয়াম সাধনা সেই ধরনেরই একটা কোর্স ছিল। আর নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কোর্স করাটাকে আমরা "তারবিয়াহ বা প্রশিক্ষণ" নাম দিতে পারি।

প্রশিক্ষণ (তারবিয়াহ) এর ইসলামি ধারণা

تَرْبِيَةٌ শব্দের ব্যবহার ইসলামের সেই প্রথম যুগ থেকেই চলে আসছে। এটাকে অধুনা সময়ে 'প্রশিক্ষণের' অর্থে নেওয়া যায়। তারবিয়া শব্দটি যদি (ربو) এর মূল ধাতু থেকে নেওয়া হয়, তাহলে তার অর্থ হবে বৃদ্ধি পাওয়া। যদি (ربي) মূল ধাতু থেকে হয় তাহলে অর্থ হবে বড়ো করে তোলা। আর যদি (رَبَّ) মূলানুগে পড়া হয় তাহলে অর্থ হতে পারে সংস্কার করা, অথবা শক্ত করে গড়ে তোলা। অর্থের এই তিনটি প্রপঞ্চ সামনে রেখে ইমাম বায়দ্বাওয়ী (র.) তারবিয়ার সংজ্ঞায় বলেন–

هي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا

অর্থাৎ কোন জিনিসকে এক এক করে তার পূর্ণতায় পৌঁছানোকে তারবিয়াহ বা প্রশিক্ষণ বলে। ইমাম আর-রাগেব বলেন–

هو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام

অর্থাৎ কোন জিনিসকে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য পূর্ণ করে বানানোই হলো তারবিয়াহ। আমাদের জীবনে রামাদ্বানের যথেষ্ট প্রভাব আছে। কুরআনেও রামাদ্বান নিয়ে বর্ণিত হয়েছে বেশ কয়েকগুলো আয়াত। হাদিসেও এসেছে অনেক বর্ণনা। এগুলো পড়লে দেখা যায়, রামাদ্বানে আল্লাহ আসমান ও জমিনে অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেন। এতে মনে হয় আল্লাহ তায়ালা গোটা রামাদ্বান মাসকে আমাদের প্রশিক্ষণের মাস হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

রামাদ্বানের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

গভীরভাবে দেখলে মনে হবে আল্লাহ তিন ভাবে এই মাসে আমাদের জীবনকে সুন্দর করে তুলতে চেয়েছেন।

১.ইবাদাত

রামাদ্বানের ইবাদাতগুলো বহুমুখী। এখানে সিয়াম একটা প্রধান ইবাদাত। ইসলামে এটি একটি অন্যতম দীর্ঘ ইবাদাত ও বটে। সিয়াম সম্পর্কে তিনি বলে দিয়েছেন "সুবহে সাদিক্ব" থেকে শুরু করে তা রাত পর্যন্ত তোমরা পূর্ণ করো। এবং এর সওয়াব অপরিসীম।

তিনি সালাতকে করেছেন এই মাসের জন্য বিশেষ ইবাদাত। আমাদের নবীর (সা.) ভাষায়–

مَن قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا واحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ.

অর্থাৎ যে বিশ্বাস ও আশার সাথে রামাদ্বানের রাত সালাতে কাটায় তার আগের গুনাহ সমূহ মাফ করে দেওয়া হবে। তিনি আরও বলেছেন–

مَن قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا واحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ

অর্থাৎ যে লাইলাতুল ক্বাদর বিশ্বাস ও আশার সাথে সালাতে কাটায় তার আগের গুনাহ সমুহ মাফ করে দেওয়া হবে। এতে দেখা যাচ্ছে সালাতেরও "কিয়ামু রামাদ্বান" ও "কিয়ামু লায়লাতিল ক্বাদর" বলে একটা নতুন নাম দেওয়া হলো। তিনি সাদাক্বাহকে এ মাসে ঈমানের অনুসঙ্গ করেছেন। মনে হবে সিয়ামের পরিপূর্ণতা বিধায়ক হিসেবেই এসেছে সাদাক্বাহ। রমাদ্বানে দান করা সাদাক্বাহকে নানা নামে পরিচিত করেছেন আল্লাহ তায়ালা নিজেই। আমাদের নবীও (সা.) এই সাদাকাতগুলোর নানা নাম দিয়েছেন। কোনটার নাম দিয়েছেন "সাদাক্বাতুল ফিতর", কোনটার নাম আবার "ইত-আমুল মিসকিন" (মিসকিনকে খাওয়ানো), কোনটার নাম "ফিদইয়া", কিংবা কোনটার নাম "কাফফারা, আবার কোনটার নাম রেখেছেন "তাফতীরুস সাই-মীন" (রোজাদারকে ইফতার করানো)।

এই মাসে উমরাহকে করা হয়েছে আমাদের নবীর (সা.) সাথে হজ করার মতো সওয়াবের আমল। তিনি এই মাসে তাওহিদকে উচ্চকিত করেছেন। ইবাদাতগুলোর সাথে اباستجاو انامي! শব্দদ্বয় জুড়ে দেওয়ায় বুঝা গেছে তাওহিদ এখানে মূল বিষয়। আল্লাহর কাছে দুয়া করার উৎসাহ আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন। তবে সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালা নিজেই

فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِى وَلْيُؤْمِنُواْ بِى

(অতএব তোমরা আমার ডাকে সাড়া দাও ও আমার প্রতি ঈমান আনো) কথা বলে প্রকারন্তরে তাওহিদেরই ডাক দিলেন। একটা হাদিসে মহানবী (সা.) আমাদের রমাদ্বানে তাওহিদের কালিমাহ বেশি বেশি করে পড়তে বলেছেন। হাদিসটির সনদে দুর্বলতা আছে।

এইমাসে আরেক ইবাদাত আল্লাহ তায়ালা পরিচিত করেছেন। তার নাম দিয়েছেন ই'তিকাফ। মানে, মসজিদে রামাদ্বানের শেষ দশ দিনে নিজকে আটকে রাখা। এর মাধ্যমে আল্লাহ এমন কিছু মানুষ প্রস্তুত করতে চান যারা দ্বীনের জন্য সব কিছুই ত্যাগ করতে ইচ্ছুক হয়

দুয়া ও যিকরকে আল্লাহ তায়ালা এই মাসে নতুন মাত্রায় এনেছেন। রমদ্বানের সিয়াম পালনের উপকার বর্ণনার পর তিনি আমাদের বলে দিয়েছেন, তিনি আমাদের নিকটে। কাজেই আমরা যেন তাকে বেশি বেশি করে ডাকি, কারণ তিনি যে কোন ডাকেরই সাড়া দেন।

এইভাবে একজন মুমিন রমাদ্বানে অনেক ধরনের ইবাদাতের সম্মুখীন হয়, যা তাকে জাহান্নামের দাও দাও আগুন থেকে রেহায় দিয়ে জান্নাতের সবুজাভ বাগানের দোরগড়ায় নিয়ে আসে। আর এই সব ইবাদাত করতে করতে সে "উতাক্বা' মিনান নার" (জাহান্নাম থেকে মুক্ত) এর তালিকা ভুক্ত হয়ে যায়।

২.আসমান জমিনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন

রামাদ্বান হাজির হলেই মুমিন হৃদয় জেগে ওঠে। তার দেহেও আসে পরিবর্তন। এর প্রভাব পড়ে সমাজের অনেক কর্মকাণ্ডে। রাষ্ট্রীয় অফিস আদালতেও আসে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন।

আল্লাহ অনেক মানুষের মনকে এমন ভাবে জান্নাতমুখী করে দেন যাতে তারা জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে গেলেও "উতাক্বা' মিনান নার" এ পরিণত হয়ে যায়। তাদের মুখের দুর্গন্ধকে আল্লাহ নিজেই মিশকের ঘ্রাণ হিসেবে গণ্য করেন। রোজাদারের জীবনে তিনি আনন্দের ব্যবস্থা করে দেন। যে আনন্দ সে ইফতারের সময় পায়। রোজাদার তার খাওয়ার মধ্যে পরিবর্তন আনে। খাবার নামও দেয় ভিন্ন ভিন্ন। সিয়াম ভাঙার পর খাদ্যের নাম হয় "ইফতার"। মানে "ভেঙে ফেলা"। এই সময় তার জন্য একটা দুআ কবুল হয়। শেষ রাতে তার জন্য একটা খাবারের সময় নির্ধারণ হয়, যার নাম ও দেওয়া হয় ভিন্ন, "সেহেরি"। এবং এই খাবারের মাঝে রাখা হয় স্পেশাল বারাকাহ।

দুনিয়ায় যখন এই সাজ সজ্জা, তখন আল্লাহ জান্নাতের আটটা দরোজা খুলে দেন। রায়্যান, জিহাদ, সালাত, যাকাত, আল-আয়মান, যিকর, ওয়ালিদ, আলহাজ্জ– সবগুলোই খুলে দেওয়া হয়। এই দরজাগুলো খুলে দিয়ে তিনি প্রতিটি মুমিনের হৃদয় জান্নাতমুখী করে দেন। ফলে এই মাসে প্রতিটি দরজার দিকে তারা হাত বাড়িয়ে দেয়। তাদের মনেরও টান জাগে সেই দিকে এগিয়ে যেতে। এই জন্য দেখা যায় ঐ সব আমলের প্রতি তাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। জাহান্নামের সকল দরজা আল্লাহ বন্ধ করে দেন। মারাত্মক শয়তানগুলোকে জিঞ্জিরাবদ্ধ করা হয়।

দুনিয়ায় নিয়োগ করা হয় লক্ষ লক্ষ মালাইকাহ, যাদের কাজ হয় মানুষকে ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করা। আল্লাহ লায়লাতুল ক্বাদরে লক্ষ কোটি মালাইকাহ জিবরীলের নেতৃত্বে পাঠান, যাদের কাজ হয় এক বছরের "আমর" সমূহ বন্টন করা ও জনে জনে সালাম প্রেরণ করা। এই মাসে মালাইকাহর এমন বিরাট সংখ্যা আছে যারা সিয়াম-সাধকদের জন্য দুআ করে।

৩.আল–কুরআন ও রামাদ্বান

রামাদ্বানকে বিশেষায়িত করার পেছনে আল্লাহ তায়ালা আল-কুরআনের নাজিল হওয়াকে বড়ো কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন। কুরআন রামদ্বানে নাজিল হয়েছে, লায়লাতুল কৃদরে তার আগমন সূচিত হয়েছে, এবং এইজন্যেই এই মাসের আগমনে সিয়াম সাধনার নির্দেশ দেওয়া

হয়েছে। কুরআন এমন কোনো ধর্মগ্রন্থ নয়, যা মানা না মানা কোনো মানুষের জন্য "নফল" করা হয়েছে। বরং এটা মানার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সকল মানুষকে। যে মানবে সে আল্লাহর পথে থেকে জান্নাতের দিকেই ধাবিত হবে। না মানলে তার জন্য আসবে ক্রান্তিকাল, আসবে বিপদ মুসিবাত। এমনকি এই দুনিয়ায় অসহনীয় দুঃখ দুর্দশা, আর লাঞ্ছনার নিগড় তার অপেক্ষায়। কুরআন তার পাঠককে দেয় অপার অনুগ্রহ, তার গবেষক ও বিশেষজ্ঞকে দেয় অপার মর্যাদা, এবং তার হুকুম আহকাম মোতাবেক চলার মানুষকে দেয় দুনিয়ার সেরা সম্মান ও বিশ্ব নেতৃত্ব। কুরআনের কথা শুনতে হলে, তার ভাষা বুঝতে হলে, তার বন্ধু হতে হলে যে গুণটা অপরিহার্য, তা হলো তাক্বওয়ার গুণ অর্জন করা।

যে সব আমলে তাক্বওয়া অর্জন হয় তার একটা তালিকা কুরআনে আল্লাহ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে সিয়ামের মাধ্যমে অর্জিত তাক্বওয়া অত্যন্ত কার্যকর। ফলে কুরআনের সাথে আল্লাহ রামাদ্বানের সিয়ামের অনেকগুলো মিল রেখে দিয়েছেন। কিয়ামতে কুরআনকে ও সিয়ামকে কথা বলার সুযোগ দেবেন আল্লাহ। উভয়েই একজন বান্দাহ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে আল্লাহর সামনে এবং সুপারিশও করবে।

সিয়ামের সাথে কুরআন তিলাওয়াত ও তাদাব্বুর খুবই সুন্দর ভাবে যায়। এই জন্য আল্লাহর রাসূল (সা.) রমাদ্বানে কুরআনের রিভিশন করতেন প্রতিটি দিন। এই সময় জিবরাইল ও আসতেন তার রিভিশনে সাথী হতে।

এমনটাই ঘটতো সালাফে সালেহীনের জীবনে। তারা এই মাসে অনেক অনেক কুরআন পড়তেন ও বুঝার চেষ্টা করতেন। এভাবে বিগত দেড় হাজার বছর ধরে রামাদ্বানের মাধ্যমে আল্লাহ মুসলিম উম্মাহ কুরআনকে যেমন উচ্চকিত করেছে, ঠিক তেমনি কুরআনের মাধ্যমে রমাদ্বানে প্রশিক্ষিত হয়ে এসেছে।

রমাদ্বানে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রসমুহ

আমরা এতক্ষণ প্রশিক্ষণ কীভাবে হয় তার আলোচনা করার প্রয়াস পেলাম। এখন আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে আল্লাহ আমাদের প্রশিক্ষণ দেন সে ব্যপারে আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

১.আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ

আমার মনে হয় রামাদ্বানের সবচেয়ে বড়ো প্রভাব পড়ে মানুষের মনোজগতে। তার মনে এনে দেয় আল্লাহভীতির এক ঐতিহাসিক পরম্পরা। সে জানে সিয়াম শুধু তার জন্য আল্লাহর দেওয়া আদেশ নয়। বরং এটা এসেছে আদম, শিস, নূহ, ইবরাহিম, দাউদ, সুলাইমান, মূসা ঈসা হয়ে মুহাম্মাদ আলাইহিমুস সালাহ ওয়াসসালাম পর্যন্ত। এই ঐতিহাসিকতা তাকে দেয় অযুত প্রেরণা, করে তোলে সিয়াম সাধনার মাধ্যমে আল্লাহকে কাছে পাওয়ার আগ্রহী। আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

অর্থাৎ যেমন ভাবে রোজা ফরজ করা হয়েছিলো তোমাদের আগেকার উম্মাতদের।

একই ভাবে একজন মানুষকে দেয় জান্নাতের দিকে চলার ধৈর্য ও হিম্মত। তাকে লক্ষ্য করেই যেন আমাদের মহানবী (সা.) বলেছেন: صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ সবরের মাসের সিয়াম, অর্থাৎ রামাদ্বান মাসকেই সবরের মাস হিসেবে তুলে ধরা হলো। ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম মনে করেন এই মাসে একজন মানুষের দুইটা মানসিক শক্তি অর্জিত হয়, একটা সামনে চলার শক্তি, আরেকটা বিরত থাকার শক্তি। মানুষ যখন সকল প্রবৃত্তি ও মানসিক চাহিদার বিপরীতে চলার মত সবরের অধিকারী হয়, তখন সে ফিরিশতার গুণের সাথে যুক্ত হয়। কিন্তু উল্টোটা হলে যুক্ত

হয় শয়তানের সাথে।

রমাদ্বানে তাক্বওয়ার হাট বসে, এখানে প্রতিটি পণ্যই মনে আল্লাহ ভীতি ছড়ায়, এবং তাকে আরশের দিকে ধাবিত করে। যা হলো আল্লাহকে হাজির নাযির জেনে আল্লাহভীরু হয়ে সোনার মানুষ হবারই নামান্তর। ইখলাস বা নিষ্ঠা একজন মুমিনের বড়ো সম্পদ এবং তার আমল কবুলের বড়ো উপাদান। সিয়াম সাধনার মাধ্যমে তা খুব সহজে অর্জন হয়। এক হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، إِلى سَبْعِ مِائَة ضِعْفٍ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ؛ فإِنَّه لي، وَأَنَا أَجْزِي به، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِن أَجْلِي.

অর্থাৎ আদম সন্তানের প্রতিটি কাজের বদলা বহুগুণে বাড়ানো হবে। একটা ভালো কাজ দশগুণ থেক সাত শতগুণে বাড়িয়ে দেওয়া হবে। আল্লাহ বলেন, তবে সাওম ছাড়া। কারণ তা শুধু আমার জন্যই। আর আমিই দেবো তার প্রতিদান। সে তার প্রবৃত্তি ও খানা ছেড়েছে আমার জন্যেই।

রমাদ্বানে সবচেয়ে বড়ো ট্রেইনিং হয় রাগ দমনের উপর। ক্ষুধার তীব্রতায় মানুষের রাগ অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু হাদিসে রাগ সংবরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি সে মজলুম হলেও এবং মানুষ তাকে গালি দিলেও, মারতে এলেও তাকে বলা হয়েছে, তুমি পালটা রাগ করো না, মারামারিতে জড়িয়ে পড়ো না, বরং সেখানে বলে দাও, "তুমি একজন সিয়াম-সাধনাকারী"।

অশ্লীলতা মানুষকে পশুত্বে নামিয়ে আনে। অথচ তার বিপরীতে ভাষার সৌন্দর্য তাকে ফেরেশতার কাতারে উন্নীত করে। চিৎকার চেচামেচি তাকে রাস্তার ছেলেদের কাতারে নিয়ে আসে। কিন্তু একমাস ধরে একজন সিয়াম সাধনাকারী পর্যায়ক্রমে এই পশুত্বের সারি থেকে সেরা মানবতার উন্নত শিখরে চলে আসে।

একজন সুস্থ মস্তিকের অধিকারী মানুষ সভ্যতা সৃষ্টির অন্যতম অনুঘটক। রামাদ্বানের প্রশিক্ষণ তাকে তুলে ধরে মানসিক শান্তির হাইওয়েতে। তার ক্ষুধা হয় আল্লাহর গুণে সুবাসিত, তার ইফতার হয়ে ওঠে আল্লাহর কাছাকাছি হওয়ার আনন্দে মুখরিত, তার সালাত হয় আল্লাহর নৈকট্যের ছোঁয়ায় পুষ্পিত।

এমন একজন মানুষের সন্ধানে মানবতা খুঁজে ফিরে, যার মাঝে থাকে ভারসাম্যতা, থাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, থাকে সেরা জিনিস লাভের আকাঙ্ক্ষা, অথবা উঁচুতে ওঠার মানসিকতা। রামাদ্বান সেই লক্ষ্যে একজন মুমিনের সামনে খুলে দেয় জান্নাতের সেরা দরজা, বন্ধ করে জাহান্নামের সাতটা দার, শৃঙ্খলিত করে শয়তানের কূটচক্র। ফলে সে হয়ে ওঠে ভারসাম্যপূর্ণ। খাওয়া দাওয়ায়, চলা ফেরায়, ঘুমানোয় রাত্র জাগরণে, কথা বার্তায় এবং আমল আখলাকে সে হয়ে ওঠে সেরা সৃষ্টির আদর্শ।

২.শারীরিক প্রশিক্ষণ

শরীরকে সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান রাখতে রামাদ্বান বিশেষ ভূমিকা রাখে। এখানে একজন ব্যক্তি দিনের সূচনা থেকে রাতের প্রারম্ভ পর্যন্ত না খেয়ে, না পান করে, না যৌন সম্ভোগ করে থাকে। রাতে সে বিভিন্ন ইবাদাতেরত থাকে। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সঠিক নিয়মে ও নির্ধারিত সময়ে আদায় করে। তারাবিহির সালাতে নিবিষ্ট হয়ে দীর্ঘ সময়ে শরীরের মুভমেন্ট বজায় রাখে। অনেকক্ষণ না খাওয়ায় পাকস্থলী, ব্রেইন, রক্তের প্রবাহ ও চাপ, হার্টের বিট ও সঞ্চালন সবই একটা নিয়মের মধ্যে চলে আসে। এতে করে রামাদ্বান একজন মানুষকে শারীরিকভাবে অনেক ফিট করে তোলে।

৩.ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণ

রামাদ্বান মাস একজন মানুষকে বিভিন্নমুখী প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। তাকে প্রথমেই সময়ানুবর্তি করে তোলে। মাস গণনায় তাকে সচেতন করে। প্রতিটি মানুষ যেন রামদ্বান মাসের চাঁদ সঠিক সময় দেখার চেষ্টা করে। এটা যাতে সঠিক হয় সে জন্য আগে পরের আরও মাসগুলো খেয়াল রাখতে বলেছেন আমাদের নবী (সা.)।

দিনের শুরু, রাতের শুরু, সাহরির শেষ সময়, সালাতের সময়গুলো, শেষ দশ দিনের লায়লাতুল ক্বাদরের গণনা, শাওয়ালের চাঁদ, শাওয়াল থেকে হজের মাস সমূহের গণনা, প্রতি মাসের তিন দিন, ও প্রতি সপ্তাহের দুইদিন এই সব হিসেব তাকে রাখতেই হয়। এভাবে তাকে বানিয়ে দেয় এস্ট্রনোমার, বা জ্যোতির্বিজ্ঞানী।

দুনিয়ার ব্যাপারে তাকে মধ্যমপন্থী মানুষ বানায়। আল্লাহ তাকে দিনের বেলায় তিনটি হালাল জিনিষ হারাম করে দিয়েছেন। আবার রাতের বেলায় ঐ তিনটি বিষয়কে আগের মতো হালাল করে দিয়েছেন। স্ত্রী সম্ভোগ রাতে হালাল হলেও ইতিকাফ অবস্থায় তা আবারো হারাম করা হয়েছে। এইভাবে একজন মানুষের প্রশিক্ষণ চলতে থাকে।

সিয়ামের মাধ্যমে একজন ব্যক্তিকে রামাদ্বান প্রটেক্ট করতে চায়। তাকে বলে দেওয়া হয়েছে, الصِّيَامُ جُنَّةٌ বা সিয়াম ঢাল। এই ঢাল একজন মানুষকে অবক্ষয়ের সমস্ত উপকরণ থেকে রক্ষা করে। তাকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করবে। তাকে চারত্রিক ধ্বংস থেকে বাঁচায়ে রাখবে। মিথ্যা, বেহায়াপনা, গালি গালাজ, পাপ, অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখবে। তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ ইবাদাতের বাইরে যেতে এই সিয়াম আটকে রাখবে। ইবনুল ক্বাইয়িম কত সুন্দরই না বলেছেন; আত্মা, মন ও মনন, এবং দেহের যাবতীয় রোগ থেকে সিয়াম ঢালের মত কাজ করে।

দেহের ইবাদাত, মনের ইবাদাত, মুখের ইবাদাতে রামাদ্বান একজন মানুষকে মশগুল রাখে হর-হামেশা। সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে, চোখের পানির ঝর্ণা ঝরিয়ে, আল্লাহর ঘরে দিনের অধিকাংশ সময় কাটিয়ে, গোপনে আল্লাহর সাথে সময় দিয়ে একজন মানুষ আল্লাহর এতো কাছে চলে যেতে পারে যে, রামাদ্বান শেষে সে জান্নাতের অধিবাসী হয়ে যেতেও পারে।

ইসলাম চায় একজন মানুষ ভালো হবে স্বেচ্ছায়। তার ভালো হওয়া কোন লোক দেখানো নয়, কারো ভয়ে নয়, বা আইনের চোখ রাঙানিতে নয়। সে ভালো, কারণ সে ভালোটাকেই গ্রহণ করেছে। এই কারণের আল্লাহ তাকে নিয়ে গর্ব করেন, ফেরেশতার সামনে তাকে মডেল হিসেবে দেখান। রামাদ্বান সেই কাজটিই করে গোটা একমাস ধরে। এতে তার কোর্স পূর্ণ হয়, আল্লাহর মাহাত্ম্য গায় এবং রব্বের শোকর আদায় হয়। ইসলাম স্বার্থপর মুসলিম নিয়ে কোন কাজ করতে পারে না। এইজন্য রামাদ্বানের মাধ্যমে তাকে আত্মোৎসর্গের চেতনায় উজ্জীবিত করে তোলে। সময়ের কুরবানি করে সে। অকাতরে অর্থ দান করে অহর্নিশ। ঘুম ও প্রবৃত্তির অনুশাসন থেকে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। চরম জুলুমের কাছেও নিজেকে বিনয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে সে। এ সবই একজন মানুষের আত্মোতসর্গের নমুনা।

একজন মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসা অত্যন্ত উন্নত

চরিত্রের লক্ষণ। রমদ্বানে একজন মানুষ দুনিয়ার সবচেয়ে হত ভাগা হতে পারে এই ইতিবাচক পরিবর্তনে ব্যর্থ হওয়ার কারণে। একবার জিবরীল (আ.) এসে বললেন, হে নবী, যে ব্যক্তি রামদ্বান পেলো, অথচ তার গুনাহ মাফ করিয়ে নিতে পারলো না, তার ধ্বংস হোক, বলুন আমিন। আমাদের নবী (সা.) বললেন, আমিন। আবার এই ধরনের আরেকজন ইতিবাচক পরিবর্তন এনে বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবার উপযুক্ত হতে পারে।

আত্মমর্যাদাবোধ একটা জাতিকে অনেক উন্নত করে। এই যোগ্যতা না থাকলে তাদের দিয়ে সভ্যতা তো দূরে থাক একটা মর্যাদার ঘরও তৈরি করা যায় না। রামাদ্বান শেখায় কীভাবে আমরা ক্ষুধাকে ছাড়িয়ে উঠি। কীভাবে আমরা জান্নাতের দরজা সমূহে নেত্রপাত করি। কীভাবে আমরা আল্লাহর সাথে মুলাক্বাত করি। কীভাবে তাঁর সাথে গোপনে কথা বলি। কীভাবে আমরা ফেরেশতার মর্যাদার কাছে দাঁড়াই। ফলে তারাই এসে আমাদের সাথে দেখা করে, সালাম দেয়। আর এই জন্যেই আমরা দেখতে পাই ইসলামের সবচেয়ে সঙ্গীন ও ইতিহাস পাল্টানো যুদ্ধগুলো হয়েছে রামাদ্বানেই এবং মুসলিমগণ বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন দুর্দশ সেনাবাহিনীদের পরাজিত করে।

একজন মানুষের পরিচয় হয় তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে। রামাদ্বান একজন মুসলিমকে চরিত্রের পোশাকে সাজিয়ে তোলে। তাকে মিথ্যা কথা বলতে দেয় না, জালিয়াতি করতে বাঁধা দেয়, তাকে গালি গালাজ নিষেধ করে, তাকে অশ্লীল হতে দেয় না। তাকে বলে দেয় তোমার সিয়াম সাধনা বৃথা হয়ে গেলো যদি তোমার চরিত্র ঠিক করতে না পারো। মহানবী (সা.) বলেছেন–

ربَّ صائمٍ ليسَ لَه من صيامِه إلَّا الجوعُ وربَّ قائمٍ ليسَ لَه من قيامِه إلَّا السَّهرُ

অনেক রোজাদার আছে, যাদের ক্ষুধায় থাকা ছাড়া সিয়াম দিয়ে কোন কাজে আসেনা, আবার অনেক নামাযি আছেন, যারা রাত জাগা ছাড়া নামাযে কিছুই পায়না।

৪.পরিবার প্রশিক্ষণ

রামাদ্বান পরিবারের জন্য নিয়ে আসে জান্নাতি পরিবেশ। একজন সিয়াম সাধনাকারীর গোটা দিনের একটা বিশেষ অংশ কাটে নিজ সংসারের সদস্যদের সাথে। রমাদ্বানে আমাদের নবী (সা.) পরিবারের জন্য আলাদা কোনো প্রশিক্ষণ দিয়েছেন তার বর্ণনা আমরা তেমন পাই না। তবে কুরআনের সুরা আল-বাক্বারার ১৮৭ আয়াতটি একান্তই পরিবার কেন্দ্রীক। এখানে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছেঃ

এক : রামদ্বানের সিয়াম প্রথম ফরজ হওয়ার সময় আমাদের নবী (সা.) এর মাধ্যমে রাতে খাওয়া দাওয়া বৈধ করা হলেও স্ত্রী সম্ভোগ বৈধ ছিল না। কিন্তু সাহাবিগণের কেউ কেউ এইটা কন্ট্রোল করতে পারেননি, ফলে আল্লাহ তায়ালা আগের হারামটা রাতের বেলায় বৈধ করে দেন। কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের ভূষণ। তাদের মিলন একেবারে প্রকৃতিগত।

দুই : স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক সম্পর্ক রামাদ্বানের রাতে বৈধ করার আরেকটি কারণ হলো রামাদ্বানের এই পবিত্র সময়ে স্বামী-স্ত্রী যেন আল্লাহর লেখা ভাগ্য তারা অনুসন্ধান করে। অধিকাংশ মুফাসসির وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ এই "লেখা ভাগ্য" বলতে সন্তান বুঝেছেন। এ থেকে ভালো একটা পথ দেখানো হচ্ছে যে, সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে রমদ্বানের রাতগুলো

রমাদ্বানে পরিবার কেন্দ্রীক আরেকটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাহলো– পরিবারের ছোট বাচ্চাদেরকেও সিয়াম সাধনায় উদ্বুদ্ধ করা উচিৎ। মহানবী (সা.) এর যুগে বাচ্চাদের সিয়ামের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হতো। ওদের যখন ক্ষুধা ও পিপাসা লেগে যেতো, তখন তাদেরকে খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখা হতো।

স্বামী স্ত্রী ব্যবহার করতে পারে।

তিন : যেহেতু এই আয়াতটি পরিবার কেন্দ্রীক লেখা, আর একজন মানুষ রাতে স্বীয় বাসাতেই ঘুমায়, তাই সেহেরির প্রসঙ্গও এখানে এসেছে। সেটা হলো খাওয়া দাওয়া সংক্রান্ত নীতি মালা। খাওয়া ও পান করার বিষয়টা সুবহে সাদিক পর্যন্ত শেষ সময়। সেটাই আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত হুদুদ বা সীমানা, যা লঙ্ঘন করা যাবে না। এখানে খাওয়া ও পান করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির কথাও অন্যত্র বলা হয়েছে।

كُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ

তোমরা খাও ও পান করো, তবে সীমালঙ্ঘন করো না। এটাই পরিবারের একটা ট্রেইনিং হওয়া উচিত।

চার : ই'তিকাফ ও এমন একটি ইবাদাত যা রামদ্বানে আল্লাহ করতে অনুপ্রাণিত করেছেন। আর এটা হলো ফ্যামিলি থেকে দূরে থেকে মসজিদে একাকি থাকার নাম। পরিবারকে মানসিক ভাবে এটাও প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত যে তারা যেন পরিবার প্রধানের এই সুযোগ দানে কোনো বাঁধা না হয়।

পাঁচ : ই'তিকাফ করা অবস্থায় সুযোগ এলেও স্বামী স্ত্রীর দৈহিক মিলন বৈধ নয়।

রমাদ্বানে পরিবার কেন্দ্রীক আরেকটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাহলো– পরিবারের ছোট বাচ্চাদেরকেও সিয়াম সাধনায় উদ্বুদ্ধ করা উচিৎ। মহানবী (সা.) এর যুগে বাচ্চাদের সিয়ামের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হতো। ওদের যখন ক্ষুধা ও পিপাসা লেগে যেতো, তখন তাদেরকে খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখা হতো। এতে করে কখন ইফতারের সময় আসতো ওরা বুঝতে পারতো না। ফলে তাদের রোজা রাখায় কষ্ট কমতো। বাচ্চাদের এই ধরনের নির্মল আনন্দে ব্যস্ত রাখা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

এখানে আরেকটা বিষয় আমাদের নবী (সা.) কখনোয় ভুলতেন না, তাহলো, রামাদ্বানের শেষের দশদিন তিনি পরিবারকে নিয়ে এক সাথে আমল বাড়াতেন। যাতে গোটা পরিবার ইবাদাতে শামিল হয়ে যেতো। ইসলামি জীবন যাত্রায় পরিবারের এই ধরনের ইবাদাত খুবই অর্থবোধক। এতে করে যেমন পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়, তেমনি ভাবে পরিবারের কাছে পরিবার প্রধানের রোলমডেলিংটাও অত্যন্ত সুন্দর ভাবে ফুটে ওঠে।

৫.সমাজ প্রশিক্ষণ

ইসলাম সামাজিক রীতিনীতির এমন এক বন্ধন ও ইন্সটিটিউশনের উপর ভিত্তি করে গেঁথে তোলা, যার শক্তি অনেক এবং মাঝে মাঝে সে শক্তি রাষ্ট্রীয় শক্তির চেয়েও বেশি হয়ে যায়। রমাদ্বানে আমরা ইসলামের সেই শক্তিই অনেকটা দেখতে পাই। সামাজিক ক্ষেত্রগুলোতে রামাদ্বান এমন প্রভাব বলয় তৈরি করে যে, আমরা তার দ্বারা যেমন আপ্লুত হই, তেমন গর্বিত হয়ে উঠি। সমাজ জীবন তখনই সুন্দর হয় যখন এখানে প্রতিজন সদস্যের মাঝে সম্পর্ক থাকে নিবিড়। একে অপরের মাঝে ভালোবাসায়, দয়া, হৃদ্যতায় তারা যেন একটা দেহের মতো হয়ে যায়। যখন দেহের একটা অঙ্গ ব্যথা পায় তখন সর্বাঙ্গ জ্বর ও নিদ্রাহীনতায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। রামাদ্বান এসে এই ইসলামি সামাজিক জীবনে আরো গতি সঞ্চার করে। রামাদ্বান এসে এখানে ভ্রাতৃত্ববোধকে এমন পর্যায়ে নিয়ে আসে, যেন কেউ কাউকে গালি না দেয়, অশ্লীল কথা না বলে, কেউ কারো প্রতি রাগ না দেখায়। বরং সবার মধ্যে যেন সিয়ামের আবহ সঞ্চারিত হয় সেই জন্য সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে।

সমাজের কেন্দ্রবিন্দু হলো মসজিদ। রামাদ্বানের প্রতি মুহূর্ত চলে এই মসজিদ কেন্দ্রীক। সালাতের জন্য নামে মুসল্লিদের ঢল, তারাবিহি জামাআতে মানুষের সারি, কিয়ামুলায়লে অশ্রুসজল উপস্থিতি, ইফতারির জন্য আসে রকমারি ডিস। রামাদ্বান ঐক্যের সূত্র দেয়, সিয়াম একতার বিণ বাজায়, আর নর নারী, শিশু কিশোর, যুবক বৃদ্ধ, এবং নিশ্চিত ভাবে ধনী গরিবের মিলন মেলায় উদ্ভাসিত হয় সমাজের কেন্দ্রগুলোতে। এখানে গোটা রমাদ্বানে কেউ যেন অভুক্ত না থাকে তার জন্য ফিদইয়ার প্রচলন করা হয়েছে। যদি কেউ রোজা রাখতে অপারগ হয়, সে কোন মিসকিন কে প্রতি রোজার বদলে একদিনের খাবার খাওয়াবে। তাদের ইফতার খাওয়ানোর প্রতিও উৎসাহিত করা হয়। তাদের গরিবদের মাঝে যাকাত বণ্টনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারা সবাই যেন সুন্দর ভাবে এক সাথে আনন্দের মাঝে ঈদ করতে পারে এজন্য সাদাক্বাতুল ফিতরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রামাদ্বানের সামাজিক প্রশিক্ষণের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক দৃশ্য ফুটে ওঠে ইসলামি সভ্যতাও সংস্কৃতির সব চেয়ে আনন্দময় ঈদে। ঈদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে শপিংমল, ভরে যায় রকমারি খাদ্য, পানীয়, কাপড় চোপড় ও ঈদের গান ও কবিতায়। ঈদের জামাআত হয় মুসলিমদের সবচেয়ে উপভোগ্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জমায়েত। আমাদের নবী (সা.) তাই এতে শিশু ও নারীদেরকেও সম্পৃক্ত করতেন। তিনি অন্দর মহলে অবগুণ্ঠনবতী মেয়েদের ও নিয়ে আসতে বলতেন, এমনকি মাসিকগ্রস্ত নারীদের নামাজ না থাকলেও ঈদের জামাআতে অংশ নিতে বলেছেন।

৬.রাষ্ট্র ও বৈশ্বিক প্রশিক্ষণ

ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দ্বীন পালনের সুযোগ তৈরি করা। রমাদান এসে রাষ্ট্রের বিভিন্ন দিকও বিভাগে ফেলে বিস্ময়কর প্রভাব। রামাদ্বান এসে রাষ্ট্রকে দেয় অর্থ, দেয় জনগণের সাথে একাত্ম হওয়ার সুযোগ, খোলে বৈশ্বিক সংযোগ ও সম্পর্কের দরজা। রামাদ্বান এসে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি তুলে ধরে–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। যদি মুনাফাখোর হয়ে জনগণের উপর বাজার দর আগুণ করে দেয় তার জন্য রয়েছে মারাত্মক সাজা। মহানবী (সা.) বলেছেন, যে দাম বাড়ানোর জন্য মুসলমানদের খাদ্য মজুদদারি করে আল্লাহ তাকে কুষ্ঠ রোগ ও দারিদ্র্য দিয়ে আঘাত করবেন।

রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো রামাদ্বান শুরু ঘোষণা, ঈদের তারিখ ঘোষণা এবং মুসলিম জাতিসত্তাকে একতাবদ্ধ করে রাখা। সে ক্ষেত্রে আলিম উলামাদের ঐক্য ও সরকারি সংস্থা সমূহের মাঝে সুন্দর ব্যবস্থাপনা হওয়া উচিত।

রামাদ্বান ও ঈদকে কেন্দ্র করে যে অশ্লীলতার সয়লাব আজকের দুনিয়ায় মুসলিমদের হাতে ছড়িয়ে পড়েছে তা রোধ করা রাষ্ট্রের তো দরকারই, এমনকি সামগ্রিক পর্যায়ে সকল মুসলিমের উপরে এটা ফরজ।

রামাদ্বান এসে আমাদের নানামুখী প্রশিক্ষণ দিয়ে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হবার সুযোগ করে দেয়। আমরা দুআ করি আল্লাহ যেন এবারের রামাদ্বান আমাদের সেই পথে প্রভাবিত করে এবং জান্নাতের রায়্যান গেইট আমাদের জন্য অবধারিত করে দেন। আমিন।

লেখক : পরিচালক, কিউ এন এস একাডেমি লন্ডন।

যিকরুল্লাহ

ব্যারিস্টার মু. আবু বকর সিদ্দিক মোল্লা

কুরআনে ذِكْرُ ٱللَّهِ পরিভাষাটি খুব গুরুত্বের সাথে অনেকবার এসেছে। অন্তত ২৩ বার। সাধারণত আল্লাহকে মনে মনে স্মরণ করা অথবা তাসবিহ পড়া অর্থে ذِكْرُ ٱللَّهِ কে অনুবাদ-ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু আমার মতে এই অনুবাদ-ব্যাখ্যা আংশিক; পরিপূর্ণ নয়। কুরআনের নিচের আয়াতগুলো থেকে বুঝা যায় ذِكْرُ ٱللَّهِ শুধু মানসিকভাবে আল্লাহকে স্মরণ করা নয়; ذِكْرُ ٱللَّهِ এক ধরনের স্পেশাল রিচুয়াল বা আল্লাহ কে স্মরণের পদ্ধতি; যা আল্লাহ পাক রাসূল (সা.) কে শিখিয়েছিলেন এবং মিল্লাতে হানিফের মধ্যেও ذِكْرُ ٱللَّهِ এর বিশেষ পদ্ধতি ছিল। নিচের আয়াতে ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ - মুজদালিফা এর মধ্যে যিকর করতে বলেছেন: অর্থাৎ ذِكْرُ ٱللَّهِ কে বিশেষ পবিত্র স্থানের সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে।

فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ

“মাশআরুল হারাম (মুযদালিফা) এর কাছে থেমে আল্লাহর যিকর করো এবং এমনভাবে যিকর করো যেভাবে যিকর করার জন্য তিনি তোমাদের পথ দেখিয়েছেন। নয়তো ইতঃপূর্বে তোমরা তো ছিলে পথ ভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত।” (সুরা বাকারা : ১৯৮)

নিচের আয়াতে বলা হয়েছে আমাদের পূর্ববর্তী মিল্লাতে হানিফ ذِكْرُ ٱللَّهِ এর একটি পদ্ধতি জানতেন :

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا

“অতঃপর যখন তোমরা নিজেদের হজের অনুষ্ঠানাদি/ কুরবানি সম্পন্ন করবে তখন আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করবে যেমন ইতঃপূর্বে তোমাদের বাপ-দাদারা (মিল্লাতে হানিফ) বরং তার চেয়ে অনেক বেশি করে স্মরণ করবে।” (সুরা বাকারা : ২০০)

নিচের আয়াতে বলা হয়েছে বিশেষ দিনে / সময়ে ذِكْرُ ٱللَّهِ করতে :

وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْدُودَٰتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ

“এই হাতেগোনা কয়েকটি দিন, এ দিনগুলোতে তোমাদের যিকরুল্লাহ করতে হবে। যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে দুদিনে করে, তাতে কোন ক্ষতি নেই। আর যদি দেরি করে শেষের দিকে (দুদিনে) করে তবে তাতেও কোন ক্ষতি নেই।” (সুরা বাকারা : ২০৩)

নিচের আয়াতে বলা হয়েছে এই উম্মতকে বিশেষ পদ্ধতির ذِكْرُ ٱللَّهِ শিক্ষা দিয়েছেন যা তারা পূর্বে জানতো না অর্থাৎ ذِكْرُ ٱللَّهِ পূর্ববর্তী উম্মত থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের :

فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ

“আর যখন নিরাপদ অনুভব করো, তখন সেই পদ্ধতিতে আল্লাহর যিকর করো, যা তিনি তোমাদের শিখিয়েছেন, যে সম্পর্কে ইতঃপূর্বে তোমরা অনবহিত ছিলে।” (সুরা বাকারা : ২৩৯)

যিকরুল্লাহর এতো গুরুত্ব যে মুসা (আ.) কে নবুওতের প্রথম দিনই সালাতের হুকুম দিয়ে সালাতের উদ্দেশ্য হিসেবে বললেন,

إِنَّنِىٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدْنِى وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِىٓ

“সালাত কায়েম করুন আমার যিকরের উদ্দেশ্যে।” (সুরা ত্ব-হা : ১৪)

অর্থাৎ যিকরুল্লাহ হচ্ছে সালাতের উদ্দেশ্য।

নিচের আয়াতে সালাতের পর ذِكْرُ ٱللَّهِ করতে বলা হয়েছে এবং ذِكْرُ ٱللَّهِ কে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে :

ٱتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

যিকরুল্লাহ ও তাসবিহর বিশেষ উপকার হলো আল্লাহ পাক ও ফেরেস্তাগণ আমাদের সাথে সংযোগ স্থাপন করে আমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসবেন :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ﴿٤٢﴾ هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۭ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ﴿٤٣﴾

৪১) হে ঈমানদারগণ! বেশি করে আল্লাহর যিকর করো। ৪২) এবং সকাল সাঁঝে তাঁর তাসবীহ করতে থাকো। ৪৩) তিনিই তাঁর ফেরেশতারা তোমাদের সাথে সংযোগ স্থাপন/দুআ করবেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোকের মধ্যে নিয়ে আসেন, তিনি মু'মিনদের প্রতি বড়োই মেহেরবান। (সুরা আহযাব : ৪১-৪৩)

জিহাদের ময়দানের সফলতাও নির্ভর করে অধিক পরিমাণে যিকরুল্লাহর উপর :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"হে ঈমানদারগণ! যখন কোনো দলের সাথে তোমাদের মোকাবিলা হয়, তোমরা দৃঢ়পদ থাকো এবং আল্লাহর যিকর করো বেশি বেশি করে। আশা করা যায়, এতে তোমরা সাফল্য অর্জন করবে।" (সুরা আনফাল : ৪৫)

ব্যক্তি জীবনেও সফলতা নির্ভর করে অধিক পরিমাণে যিকরুল্লাহর উপর :

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

"তারপর যখন নামাজ শেষ হয়ে যায় তখন ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো এবং অধিক মাত্রায় আল্লাহর যিকর করতে থাকো। আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।" (আন'আম : ১০)

অপরদিকে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ও হবে যারা আল্লাহর যিকর থেকে বঞ্চিত :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

"হে সেই সব লোক যারা ঈমান এসেছো, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর যিকর থেকে গাফিল করে না দেয়। যারা এরূপ করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকবে।" (সুরা মুনাফিকুন : ৯)

লেখক : বিশিষ্ট আইনজীবী ও লেখক।

ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ছে ইসলামের জ্যোতি

সাঈদ চৌধুরী

- ব্রিটেনে বছরে ৫ সহস্রাধিক শ্বেতাঙ্গ মানুষের ইসলাম গ্রহণ।
- আযানের সুমধুর ধ্বনি প্রতিদিন ভেসে আসছে বাতাসে।
- নাইন এলেভেনের পর এক দশকে ব্রিটিশদের ইসলাম গ্রহণের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ।
- ইসলামে ধর্মান্তরিতদের অর্ধেকেরও বেশি শ্বেতাঙ্গ নারী।
- ইউরোপে ধর্মান্তরিত হয়েছেন ২ লক্ষাধিক।
- গড় প্রজনন হার অমুসলিমদের ১.৬ এর তুলনায় মুসলমানদের হার ২.৬।
- পিআরসি'র গবেষণা মতে ইউরোপীয় দেশে মুসলিম জনসংখ্যা ২০৫০ সালের মধ্যে তিনগুণ হয়ে সাড়ে পাঁচ কোটি ছাড়িয়ে যাবে।

বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধকতা ও অপ্রচার সত্ত্বেও ধর্মের শাশ্বত বাণীতে আকৃষ্ট হচ্ছেন ব্রিটেনসহ পশ্চিমা দেশসমূহের বহু জাতিগোষ্ঠীর মানুষ। ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ছে ইসলামের জ্যোতি। মুক্তিকামী মানুষ উপলব্ধি করছেন, মানবতা ও সভ্যতার পরিপূর্ণ বিকাশ ইসলামী জ্ঞানের আলো ছাড়া সম্ভব নয়। ফলে ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে আশ্রয় নেয়া মানুষের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে।

ইউরোপে স্বার্থহীনভাবে ভালোবাসার, মানুষের সাহায্যে নিঃস্বার্থভাবে এগিয়ে আসার গুণাবলি খুবই শিক্ষণীয়। তবে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে কামনা-বাসনার বল্গাহীন মেলামেশা বাস্তবতার আলোকে মোকাবেলা করতে হয় মুসলমানদের। নানা কারণে মাঝে মধ্যে কোথাও জটিলতা বা পঙ্কিলতা সৃষ্টি হলেও কোন কিছুতেই থেমে যায়নি ইসলামের বিকাশ। বিভিন্ন দেশ থেকে আগত অভিবাসী এবং স্থানীয় মুসলমান মিলেমিশে কাজ করার ফলে আধুনিক জ্ঞান ও ইসলামী জীবনবোধের উন্মেষ ঘটছে। সকলের সমন্বয়ে দ্রুত বিকশিত হচ্ছে গোটা ইউরোপজুড়ে একটি শক্তিশালী মুসলিম কমিউনিটি।

বছরে ইসলাম ধর্ম আলিঙ্গন করেন ৫ সহস্রাধিক ব্রিটিশ

ব্রিটেনে ইসলামিকরণ সম্পর্কে প্রভাবশালী ব্রিটিশ সংবাদপত্র ইনডিপেনডেন্ট লিখেছে, নাইন-এলেভেনের পরের দশকে ব্রিটিশদের ইসলাম গ্রহণের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। বছরে ৫ সহস্রাধিক শ্বেতাঙ্গ ইসলাম গ্রহণ করেন। বিশ্বব্যাপী ইসলাম সম্পর্কে হিংসাত্মক অপপ্রচার ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভের পরও এমনটি হওয়ার কারণ আবিষ্কার করতে চেয়েছে দ্য ইনডিপেনডেন্ট। (THE ISLAMIFICATION OF BRITAIN: RECORD NUMBERS EMBRACE MUSLIM FAITH, 04 January 2011, independent) প্রতিবেদনটি করেছেন জেরোম টেলর এবং সারাহ মরিসন। তাদের অনুসন্ধান মতে, ইসলামের ব্যাপারে প্রায়ই নেতিবাচক চিত্রায়ন সত্ত্বেও, হাজার হাজার ব্রিটিশ প্রতি বছর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছেন।

অনুমান করা হতো ইউকেতে ধর্মান্তরিত মুসলমানের সংখ্যা ১৪ হাজার থেকে ২৫ হাজার। কিন্তু ইন্টারফেইথ থিঙ্ক এর একটি নতুন সমীক্ষা- ট্যাঙ্ক ফেইথ ম্যাটারসয়- বলা হয়েছে, প্রকৃত সংখ্যা ১ লাখ পর্যন্ত হতে পারে। স্কটিশ আদমশুমারির ডেটা ব্যবহার করে অনুমান করা হয়েছিল ২০০১ সালে ব্রিটেনে ৬০ হাজার ৬৯৯ জন ধর্মান্তরিত মুসলিম বসবাস করেন। গবেষকরা লন্ডনের মসজিদগুলিতে জরিপ করেছেন। ফলাফলে ১২ মাসে এই রাজধানীতে ১ হাজার ৪০০ জন ধর্মান্তরের পরিসংখ্যান মিলেছে। তখন দেশব্যাপী এক্সট্রাপোলেট করা হয়, প্রতি বছর প্রায় ৫ হাজার ২০০ জন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন।

বাতুল আল তোমা, একজন আইরিশ ২৫ বছর বয়সে ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনে কাজ করেন এবং ধর্মান্তরিতদের সাহায্য করার জন্য বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত একটি নিউ মুসলিম প্রজেক্ট পরিচালনা করেন। তিনি বলেছেন, "আমি অবশ্যই মনে করি সাম্প্রতিক

বছরগুলিতে ধর্মান্তরিতদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।"

মুসলিম ফর ইউকে'র প্রতিষ্ঠাতা ইনায়েত বাংলাওয়ালা বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য ইসলামী সমাজের সক্রিয় আউটরিচ প্রোগ্রাম রয়েছে যা বিশ্বাস সম্পর্কে জনপ্রিয় ভুল ধারণাগুলি দূর করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা ২০১১ সালের ৫ জানুয়ারি একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে উল্লেখ করা হয় ব্রিটিশ ইউনিভার্সিটির রিপোর্ট মতে, গত এক দশকে ধর্মান্তরিতদের সংখ্যা অন্তত দ্বিগুণ বেড়ে প্রায় ১ লাখ হয়েছে। নতুন গবেষণায় দেখা গেছে, ইসলামে ধর্মান্তরিতদের অর্ধেকেরও বেশি শ্বেতাঙ্গ নারী।

সোয়ানসি ইউনিভার্সিটির কেভিন ব্রাইসের প্রতিবেদনে দেখা যায়, ইসলামে ধর্মান্তরিত মানুষের সংখ্যা ২০০১ সালে প্রায় ৬০ হাজার থেকে বেড়ে ২০১০ সালে প্রায় ১ লাখ হয়েছে। সমীক্ষায় শ্বেতাঙ্গ ধর্মান্তরিতদের মধ্যে ৫৬ শতাংশ পুরুষ এবং ৬২ শতাংশ মহিলা বলে প্রমাণিত হয়েছে। দাতব্য সংস্থা ফেইথ ম্যাটার্সের পক্ষ থেকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শুধু ২০০৯ সালেই যুক্তরাজ্যে ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছেন ৫,২০০ জন। জরিপে ইসলামে রূপান্তরের সময় গড় বয়স ছিল প্রায় ২৭ বছর।

ব্রিটেনের জাতীয় দৈনিক ডেইলি মেইল লিখেছে, কিভাবে ১ লাখ ব্রিটিশ মুসলিম হবার পথ বেছে নিয়েছেন এবং ইসলামে রূপান্তরকারী হলেন গড়ে ২৭ বছর বয়সী সাদা মহিলা। (HOW 100,000 BRITONS HAVE CHOSEN TO BECOME MUSLIM... AND AVERAGE CONVERT IS 27-YEAR-OLD WHITE WOMAN, 5 January 2011, the Daily Mail) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শ্বেতাঙ্গ মহিলারা ব্রিটিশ ভোগবাদ এবং অনৈতিকতায় বিরক্ত। সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেশটি 'ইসলামীকরণ' প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলছে।

জিহাদি তকমা ও রিচার্ড দ্য লায়ন হার্টের যুদ্ধ

প্রাচীনকালে মিসরের সুলতান সালাউদ্দিনের সঙ্গে ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড দ্য লায়ন হার্টের যুদ্ধ হয়েছিল। রিচার্ড ছিলেন রাজা দ্বিতীয় হেনরির পঞ্চম পুত্র। রিচার্ড ৬ জুলাই ১১৮৯ থেকে আমৃত্যু ইংল্যান্ডের রাজা ছিলেন। একই সময়ে ছিলেন নরমান্ডের ডিউক, অ্যাকুইটাইনের ডিউক, গাসকনির ডিউক, সাইপ্রাসের লর্ড, আনজুউয়ের কাউন্ট, মাইনের কাউন্ট, নান্তেগের কাউন্ট।

মধ্যপ্রাচ্যে ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী যোধাইয়ান পর্বতের মালভূমিতে অবস্থিত ঐতিহাসিক নগরী জেরুজালেম দখল করতে গিয়ে রিচার্ড পরাজিত হন। এই যুদ্ধকে পশ্চিমা ইতিহাসবিদরা ক্রুসেড বলে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু মুসলমানরা এটাকে অবিচার, অত্যাচার ও দখলদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম হিসেবেই বিবেচনা করেন।

তখন থেকে ইউরোপে মুসলমানদের বিরুদ্ধে 'জিহাদি' তকমা দিয়ে সৃষ্টি করা হয় নানা রকম প্রতিবন্ধকতা। ইংরেজি 'ক্রুসেড' দ্বারা জিহাদের মর্মার্থ বোঝানো হয়েছে। অথচ আরবিতে আত্মসংশোধন, সমাজ সংশোধন এবং নিজ ভূখণ্ড রক্ষার সংগ্রামকে জিহাদ বলা হয়ে থাকে। এটি সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক অনাচারের বিরুদ্ধে সর্বোত্তম প্রয়াস। এছাড়াও অপরিমিত কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি থেকে নিজেকে এবং সমাজকে বাঁচানোর সাধনা হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিহাদ।

ফিলিস্তিনের সেই প্রতিরোধ আন্দোলন এবং পরবর্তী অনেক ঘটনা বিকৃত করে ইসলাম ও মুসলমানদের দমনের চেষ্টা হয়েছে পৃথিবীর অন্য প্রান্তেও। জিহাদের ব্যাপক ও বিস্তৃত অর্থকে সংকুচিত করে ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে।

তবে এমন অপচেষ্টা ক্রমেই ব্যর্থ হতে বাধ্য। বুমেরাং হয়েছে বহু ক্ষেত্রে। শক্ত প্রতিবন্ধকতার বিপরীতে বিজয় ত্বরান্বিত হয়েছে। কোরআনের আলো ছড়িয়ে পড়ছে প্রতিপক্ষের ঘরে। আমাদের নতুন প্রজন্ম জেনে গেছে, জ্ঞানে যে জাতি যত অগ্রসর, তাদের সম্মান ও ঐশ্বর্য তত উন্নত। ফলে অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ-সহ বিশ্বসেরা বিদ্যালয়ের শীর্ষ মেধা তালিকায় জায়গা করে নিচ্ছে মুসলিম শিক্ষার্থীরা।

ইহুদি নির্মূলে হিটলারের প্রয়াস ও ধর্মীয় আবরণে ফ্যাসিবাদী আচরণ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে হিটলার জার্মানিসহ ইউরোপ থেকে ইহুদি নির্মূলের ঘোষণা দিয়েছিলেন। জঘন্য বর্বর পন্থায় তাদের বিতাড়ন বা হত্যার নীতি অনুসরণ করা হয়। দেশ দখল বা সম্পদ দখলের পুরানো ধারার সাথে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি এমন বিদ্বেষ ভয়াবহ রূপ লাভ করে। ফলে সংশ্লিষ্ট ভুক্তভোগী ও তাদের উত্তরাধিকারী প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে ওঠে। এরাই জেরুজালেম ইস্যুতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অন্যায্য বিদ্বেষ ও অপপ্রচার চালাতে শুরু করে।

আল জাজিরার মানবতাবাদী লেখক বেলেন ফার্নানদেজ ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে লিখেছেন, ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে অব্যাহত বর্বরতা চালাচ্ছে ইহুদিবাদী ইসরাইল। যদিও পশ্চিমা কর্পোরেট মিডিয়া এটাকে দেখছে 'সংঘর্ষ' হিসেবে। গত রমাদ্বান মাসে পবিত্র আল-আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণে কোন কারণ ছাড়াই হামলা চালায় ইসরায়েলি পুলিশ। রাবার বুলেট, লাঠিসোটা, গ্রেনেড এবং টিয়ার গ্যাসের আক্রমণে কয়েকশ ফিলিস্তিনি আহত হন। এদেরকেই তারা আবার গ্রেপ্তার করেছে। ফিলিস্তিনিদের ওপর এমন সহিংসতা, তাদের জাতিগত ভাবে নির্মূল, ফিলিস্তিনি ভূমি দখল এবং গণহত্যার পর্যায়ক্রমিক অপরাধ প্রায় ৭৫ বছর ধরে ইসরায়েলি দখলনীতির কারণেই ঘটছে।

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ার ফ্রাঁসেসকা আলবানিজ বলেছেন, ফিলিস্তিনে যা করছে ইসরায়েল, তা যুদ্ধাপরাধ। তারা মৌলিক মানবাধিকার পদদলিত করছে। গণহারে মানুষকে জেলে পাঠিয়েছে। ১৯৬৭ সালের পর থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুসহ কমপক্ষে ৮ লাখ ফিলিস্তিনিকে তারা গ্রেপ্তার করেছে। কর্তৃত্ববাদী শাসনের অধীনে তাদেরকে আটকে রেখেছে। ফিলিস্তিনকে একটি 'ওপেন-এয়ার কারাগারে' পরিণত করেছে।

১০ জুলাই ২০২৩ তারিখে সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে জাতিসংঘ সদর দফতরে এ রিপোর্ট প্রকাশ করেন ফ্রাঁসেসকা আলবানিজ। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, ১৯৯২ সাল থেকে ফিলিস্তিনিদের এসব বিষয় আমলে নিয়েছে জাতিসংঘের ওয়ার্কিং গ্রুপ অন আরবিট্রারি ডিটেনশন। তারা বার বার ব্যাপক ও পর্যায়ক্রমে স্বাধীনতা বঞ্চিত রাখাকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে বলে এসেছে। এসব অপরাধ তদন্তের জন্য তিনি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টের (আইসিসি) প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

গত ৮ অক্টোবরের পর থেকে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী গাজায় নির্বিচার মানুষ হত্যা করে চলেছে। ইতিমধ্যে সেখানে মৃত্যুর সংখ্যা ৩০ হাজার ছাড়িয়েছে, যাদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু। গাজায়

আগ্রাসন ও গণহত্যার জন্য ইসরায়েলকে জবাবদিহির আওতায় আনতে গত বছরের শেষের দিকে আন্তর্জাতিক আদালত আইসিজেতে মামলা দায়ের করে দক্ষিণ আফ্রিকা। ১১ ও ১২ জানুয়ারি মামলার শুনানি হয়। ইসরায়েলের সম্প্রসারণ নীতি ও যুদ্ধোন্মাদনা লাখ লাখ ফিলিস্তিনিকে কেবল মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করেনি; গাজায় তৈরি হয়েছে চরম মানবিক বিপর্যয়।

ইসলামী বিশ্বাসের অনুসারী হওয়ার কারণে শুধু ফিলিস্তিনে নয়, ইউরোপেও বহু মানুষ অন্যায় আচরণের শিকার হয়েছেন। ইসলামে হজরত মরিয়ম (আ.) এবং তার পুত্র হজরত ঈসা (আ.) পরম শ্রদ্ধায় বরিত হলেও খ্রিষ্টান সমাজের একটি অংশ সব সময় মুসলিম বিরোধীতা করেছে। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিও অনাহুত অপপ্রচার চালিয়েছে। অথচ আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআন বলেছেন, ওয়া ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আজিম। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা.) নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত। সুরা কলম ৬৮:৪

ধর্মীয় আবরণে এমন ফ্যাসিবাদী আচরণ ভারতীয় উপমহাদেশেও এক সময় ব্যাপকতা লাভ করে। যদিও তাদের এ মনোভঙ্গিটি উন্মুক্ত নয় এবং যুক্তিসমূহ অনেকটাই মনগড়া। ভারতের বর্তমান সরকারি দল বিজেপি বহুদিন ধরে নানা অজুহাতে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের অধিকার খর্ব করে চলেছে। অযোধ্যায় মোগল আমলে তৈরি বাবরি মসজিদের জায়গাতেই ভগবান রামের জন্ম হয়েছিল বলে তারা দাবি করে। ১৯৯২ সালের ছয়ই ডিসেম্বর বিজেপির পুষ্য কট্টর হিন্দু সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) ঐতিহ্যবাহী বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলে। তাদের সৃষ্ট দাঙ্গায় প্রায় ২ হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটে। আরও বহু জায়গায় মসজিদ ও মাদ্রাসা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সাম্প্রদায়িক হামলায় অনেক মানুষ হতাহত হয়েছেন। দুনিয়াজুড়ে এ ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ হয়েছে।

বিজেপির বিতর্কিত এমপি প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরের বিরদ্ধে 'রোজ যেভাবে নিয়ম করে বিষ ছড়াচ্ছেন' তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ভারতের শতাধিক সাবেক শীর্ষস্থানীয় আমলা (৭ জানুয়ারি ২০২৩) লোকসভার স্পিকার ও এথিকস কমিটির কাছে একটি খোলা চিঠি লিখেছেন। এই চিঠিতে যারা স্বাক্ষর করেছেন তাদের মধ্যে ভারতের সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা শিবশঙ্কর মেনন, প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত মধু ভান্ডারী, সাবেক কেন্দ্রীয় সচিব অনিতা অগ্নিহোত্রী, রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্য সচিব সালাউদ্দিন আহমদের মতো বহু পরিচিত নাম রয়েছে।

বিবিসি বাংলা নিউজে দিল্লির শুভজ্যোতি ঘোষ লিখেছেন, মুসলিম-বিদ্বেষী হেইট স্পিচ প্রদানের জন্য দল তো নয়ই, পার্লামেন্টের স্পিকারও তার বিরদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেননি। এর আগেও বহু সিভিল সোসাইটি গ্রুপ পার্লামেন্টে প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরের সদস্যপদ বাতিল করার দাবি জানিয়েছে, কিন্তু স্পিকারের কার্যালয় বা দল হিসেবে বিজেপি তাতে কর্ণপাতও করেনি।

২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে দ্য নিউ ইয়র্কার ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্পর্কে অর্থনীতিতে নোবেলজয়ী ভারতীয় বাঙালি অমর্ত্য সেন বলেছেন, ভারতের ভাষা ও কৃষ্টিগত বহুত্ব সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই মোদীর। আশৈশব আরএসএস'র প্রোপাগান্ডায় বিশ্বাসী মোদী ভারতের বিবিধতা বোঝেন না, বোঝেন শুধু হিন্দুত্ব।

দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক রাজ্যে কয়েকটি স্কুল ও কলেজে হিজাব পরা মেয়েদের ক্লাসে ঢুকতে না দেওয়ার ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন নোবেল বিজয়ী অধিকারকর্মী মালালা ইউসুফজাই। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এক টুইট বার্তায় তিনি বলেন, হিজাব পরার কারণে মেয়েদের স্কুলে ঢুকতে না দেওয়া ভয়ংকর ব্যাপার। নারী শিক্ষার পক্ষে আন্দোলনে বিশ্বজুড়ে খ্যাতি পাওয়া মালালা তার টুইটে 'মুসলিম নারীদের কোণঠাসা করা'বন্ধ করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

২০০২ সালে ব্রিটেনের লোটন শহরের ড্যানবি হাই স্কুলে বোরকাজাতীয় পোশাক 'জিলবাব' পরায় কর্তৃপক্ষ বাধা দেন বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত সাবিনা বেগমকে। প্রতিবাদের ঝড় ওঠে সর্বত্র। পৃথিবীর সেরা গণমাধ্যমে তা প্রচারিত হয়। আদালতের আশ্রয় নেন সাবিনা। হাইকোর্টে সাবিনার পক্ষে মামলা লড়েছেন ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের স্ত্রী চেরি ব্লেয়ার।

আদালতে চেরি ব্লেয়ার কিউসি বলেছেন, এই মামলাটির সাথে ব্রিটেনের বহুজাতিক সংস্কৃতির বৈশিষ্টের সম্পর্ক রয়েছে। যে কারণে মামলাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস পরিপূর্ণভাবে পালনের অধিকার সাবিনার রয়েছে। স্কুল থেকে তাকে বের করে দিয়ে তার ব্যক্তিগত অধিকার খর্ব করা হয়েছে। আপিলে জিতে যান সাবিনা। বিচারক রায়ে বলেছেন, জিলবাব পরার অনুমতি না দিয়ে সাবিনা বেগমকে নিজ ধর্মীয় পরিচয় বহনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

এরপর ২০০৪ সালের ১৪ জুন লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দ্য ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্ক অ্যাসেম্বলি ফর প্রোকেটশন অব হিজাব (প্রো-হিজাব)। এই সংগঠনের মাধ্যমে ইউরোপজুড়ে হিজাব পরার অধিকার সংরক্ষণের জন্য ব্যাপক প্রচারণা শুরু হয়। মুসলিম অ্যাসোসিয়েশন অব ব্রিটেন, ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি অ্যাগেইন্স্ট রেসিজম, দ্য ফেডারেশন অব ইসলামিক অর্গানাইজেশন ইন ইউরোপ, হিউম্যান রাইট্স গ্রুপ লিবার্টি সহ বিভিন্ন সংগঠন এই আন্দোলনে সমর্থন জানায়। প্রচারণায় অংশ নেন তৎকালীন লন্ডনের মেয়র কেন লিভিংস্টোন, জর্জ গ্যালাওয়ে এমপি, ফিওনা ম্যাকটগার্ট এমপি, ক্যারোলিন লুকাস এমইপি সহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ। পরবর্তীতে ইউনিভার্সিটি অব গ্রিনউইচ থেকে ডিগ্রী নিয়ে সাবিনা এখন ব্রিটেনে পারিবারিক আইন বিষয়ক আইনজীবী। স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেছেন আন্তর্জাতিক সেবা সংস্থা ইসলামিক হেলপে। পূর্ব আফ্রিকা সহ বিশ্বের এতিম শিশুদের সাহায্যের জন্য তহবিল সংগ্রহ করেছেন। কাজ করেছেন ফিলিস্তিনে মসজিদ পুনর্নির্মাণ প্রজেক্ট 'দারুল ফাদিলা'য়। সম্পৃক্ত হয়েছেন মানবাধিকার সংক্রান্ত অনেক সংগঠন ও আন্দোলনে।

নাইন ইলেভেন পরবর্তী প্রতিবন্ধকতা

২০০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে (৯/১১) আমেরিকায় ভয়ংকর হামলার ঘটনা গোটা বিশ্বকে চমকে দিয়েছিল। নিউইয়র্কে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ১১০ তলা বিশিষ্ট টুইন টাওয়ার ভবন মাটিতে ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়ে। ভয়াবহতম হামলায় সব মিলিয়ে মারা গেছেন ২,৯৭৭ জন। ওসামা বিন লাদেনের নেতৃত্বাধীন আল-কায়দা সংগঠনকে দায়ী করেছিল আমেরিকা এবং তার মিত্র দেশগুলো। আসল ঘটনা অবশ্য এখনো রহস্যাবৃত রয়েছে।

এই ঘটনার মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে ইতিহাসের দীর্ঘতম যুদ্ধে জড়িয়েছে। এটি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলা হলেও বিশ্বব্যাপী অভিবাসন নীতিও বদলে দিয়েছে। বর্ণ বৈষম্য, জাতিগত বৈষম্য ও বিদ্বেষমূলক অপরাধ বাড়িয়েছে। অথচ কারা এই হামলা চালিয়েছিল,

কেন চালিয়েছিল, নেপথ্যে কারা ছিল, কী করে সম্ভব হলো তা নিয়ে বিতর্ক রয়েই গেছে।

ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন-বিবিসি'র সূত্র মতে, হামলাকারী ছিল মোট ১৯ জন। এদের মধ্যে তিনটি দলে ছিল পাঁচজন করে, যারা বিমান হামলা চালায় টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগনে। আর যে বিমানটি পেনসিলভেনিয়ায় ভেঙে পড়ে, তাতে ছিল চারজন। প্রত্যেক দলে একজনের বিমানচালক হিসাবে প্রশিক্ষণ ছিল। তারা পাইলটের ট্রেনিং নেন খোদ আমেরিকার ফ্লাইং স্কুলে। অনেক নাটকীয়তার পর অবশেষে ২০১১ সালে ২ মে লাদেনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আপাতত শেষ হয় এই অধ্যায়ের।

মার্কিন বুদ্ধিজীবী নোয়াম চমস্কি সহ বহু গবেষক মনে করেন, আফগানিস্তানে আল-কায়েদার বিরুদ্ধে মার্কিন হামলা ছিল একটি বাহানামাত্র। দেখা যায়, তালেবান সরকারের বিরুদ্ধে হামলার পর ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়াসহ মধ্যপ্রাচ্যেও তাণ্ডব চালানো হয়েছে। অবশেষে তালেবানেরাই তাদের দেশ পরিচালনা করছে। মধ্যপ্রাচ্যেও আমেরিকার কর্তৃত্ব দিন দিন খর্ব হচ্ছে।

আমেরিকার ব্রাউন ইউনিভার্সিটির 'কস্ট অব ওয়ার' থেকে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে, আফগানিস্তান ও ইরাকে ২০ বছরের যুদ্ধে নিহত হয়েছেন প্রায় এক লাখ মানুষ। এতে মানুষের জীবন ও জীবিকার অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, যার কোন হিসেব হয়নি। সরাসরি অর্থের হিসাবে এই যুদ্ধে ব্যয় হয়েছে ৮ লাখ কোটি মার্কিন ডলার।

আমেরিকার সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী, নাইন ইলেভেনের দায় একটি গোষ্ঠীর ব্যাপার হলেও গোটা বিশ্বের মুসলিম বেশ বেকায়দায় পড়েন। বিমান ভ্রমণের নিরাপত্তা জোরদারের নামে সর্বত্র মুসলমানদের হেনস্তা বাড়তে থাকে। আমেরিকাতে বিমানবন্দর ও বিমানের ভেতর নিরাপত্তা আরও কঠোর করতে ট্রান্সপোর্টেশান সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশান নামে পরিবহন নিরাপত্তা প্রশাসন গঠন করা হয়। মুসলমানদের চাকরি, ব্যবসা এমনকি স্বাভাবিক চলাচলে সৃষ্টি হয় নানা প্রতিবন্ধকতা। ইউরোপেও মুসলিম জনজীবনে এক ধরনের ভীতির সৃষ্টি হয়।

ইসলামী স্কলারদের প্রজ্ঞা দীপ্ত পথচলা

ইউরোপের ইসলামী স্কলারগণ সামগ্রিক পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রজ্ঞা দীপ্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তারা ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলার পরামর্শ দেন। মহানবী হজরত মুহাম্মদের (সা.) বাণী স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। প্রিয় নবী বলেছেন, বুইছতু লিউতাম্মিমা মাকারিমাল আখলাক। আমাকে পাঠানো হয়েছে সুন্দর চরিত্রের পূর্ণতা প্রদানের জন্য। মুসলিম ও তিরমিজি

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন, ইন্না ফি জালিকা লাআতিল লিকুল্লি ছব্বারিন শাকুর। নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে চরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য। সুরা ইবরাহিম : ৫

ইসলাম ও আধুনিক শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত স্কলারগণ ইউরোপের বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের মাধ্যমে কোরআন-হাদিসের আলোকে সাধারণ মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছেন। ফলে শান্তিপ্রিয় মুসলমানেরা সর্বোত্তম আচরণের মাধ্যমে অন্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক দ্রুত সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন।

খ্যাতিমান ব্যক্তিদের ইসলাম গ্রহণ

আটার শতকের শেষ দিকে ব্রিটেনে এবং উনিশ শতকের ছয় দশক থেকে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহে বহু মানুষ ইসলামে ধর্মান্তরিত হতে শুরু করেন। উনিশের আশির দশকে সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদের পতনের পরে, ইসলাম গ্রহণের আরেকটি তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। শীতল যুদ্ধ পরবর্তী যুগে অনেক মানবতাবাদী ইসলামের প্রতি আগ্রহ দেখান। তখন ক্রমবর্ধমান সংখ্যক প্রাক্তন মার্কসবাদী ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছেন।

উইলিয়াম হেনরি : ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উচ্চতায় অবস্থান করা ও বাছাই করা ব্যক্তিত্বদের অন্যতম উইলিয়াম হেনরি খ্রিস্টান ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামে ধর্মান্তরিত হন, যখন খ্রিস্টধর্ম ছিল ব্রিটিশ পরিচয়ের ভিত্তি। ১৮৮৭ সালে আনুষ্ঠানিক ভাবে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন উইলিয়াম হেনরি আবদুল্লাহ কুইলিয়াম। প্রাজ্ঞ আইনজীবী উইলিয়াম লিভারপুলে প্রকাশ্যে তার নতুন বিশ্বাসের প্রচার করেন এবং ভিক্টোরিয়ান ব্রিটেনে ধর্মান্তরিত মুসলিমদের প্রথম কমিউনিটি প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রিটেনজুড়ে তিনি প্রায় ৬শ জনকে ধর্মান্তরিত করার ক্ষেত্রে সহায়ক ছিলেন। সে বছর তিনি লিভারপুলে দেশের প্রথম মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। লিভারপুল তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শহর হিসেবে গণ্য ছিল। ১৮৮৯ সালে ওকিং-এ নির্মিত দেশের দ্বিতীয় প্রাচীনতম মসজিদের সাথেও তিনি জড়িত ছিলেন। উসমানীয় সুলতান ১৮৯৪ সালে আবদুল্লাহ কুইলিয়ামকে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের শেখ আল-ইসলাম হিসাবে নিযুক্ত করেন। এটি ব্রিটিশ সমাজে মুসলিম নেতৃত্বের তাৎপর্যপূর্ণ স্বীকৃতি হিসেবে প্রতিফলিত হয়।

ইভন রিডলি : ব্রিটেনে বিখ্যাত মিডিয়া ব্যক্তিত্বদের মধ্যে অন্যতম শক্তিমান সাংবাদিক ও লেখক ইভন রিডলি। একজন বামপন্থী পটভূমির সাংবাদিক যিনি অক্টোবর ২০০১ সালে আফগানিস্তানের বন্দিদশা থেকে মুক্ত হওয়ার পর ইসলামে ধর্মান্তরিত হন। ইউরোপে ইসলামোফোবিয়ার বিরুদ্ধে তিনি এখন সোচ্চার কণ্ঠ। ২০০৪ সালে রিডলি মুসলিম অ্যাসোসিয়েশন অব ব্রিটেন এবং মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেনের সাথে কাজ শুরু করেন। সে বছর গ্লোবাল পিস অ্যান্ড ইউনিটি (এচট) সম্মেলন লন্ডনের রয়্যাল ভিক্টোরিয়া ডকের ঊঈঁবখ প্রদর্শনী কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। এটা ছিল ইসলাম চ্যানেল আয়োজিত ইউরোপের সবচেয়ে বড় আন্তঃধর্মীয় এবং বহুসাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ইভেন্টটিতে অর্ধ লক্ষ মানুষ অংশ গ্রহণ করেন। সম্মেলনে দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক বক্তাদের কাছ থেকে আলোচনা, কর্মশালা, সেমিনার, ইসলামিক প্রদর্শনী, নাশিদ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল। অনুষ্ঠানে ইভন রিডলির অসাধারণ বক্তব্য মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে দূরত্ব দূর করা এবং সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সংহতি বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। সংবাদ সংস্থা 'মিডিয়া মহল' অনুষ্ঠানে অন্যতম মিডিয়া পার্টনার ছিল। সেদিন মিডিয়া মহল থেকে প্রকাশিত মাসিক সময়'র পক্ষ থেকে এই প্রতিবেদকের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে ইভন রিডলি ইসলাম গ্রহণের প্রেক্ষাপট ও অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, একজন নারী বন্দী হিসেবে তার প্রতি তালেবানদের মর্যাদাপূর্ণ আচরণ দেখে তিনি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন। এজন্য তিনি মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন।

ইভন রিডলি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কিত বিষয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষণ প্রদান করেন। দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট থেকে তেহরান টাইমস এবং ত্রিপোলি পোস্টের মতো বৈচিত্র্যময় সংবাদ মাধ্যমে শিরোনাম হন। তার কাজ পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে অসংখ্য প্রকাশনায় প্রদর্শিত হয়। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যে বহু স্বীকৃতি এবং

পুরস্কার অর্জন করেছেন। ফ্লিট স্ট্রিটে প্রধান শিরোনামের জন্য দশ বছর কাজ করার পর তিনি তার সংক্ষিপ্ত বিবরণটি ইলেকট্রনিক এবং সম্প্রচার মিডিয়াতে প্রসারিত করেন এবং গুয়ানতানামো থেকে লিবিয়া এবং আরব বসন্ত পর্যন্ত ফিলিস্তিনি ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ইস্যুতে বেশ কয়েকটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি করেছেন।

লরেন বুথ : সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের শ্যালিকা এবং বিখ্যাত অভিনেতা টনি বুথের কন্যা ব্রিটিশ লেখক ও সাংবাদিক লরেন বুথ এখন সাড়া জাগানো ইসলাম প্রচারক। ধর্মান্তরিত হবার পর তিনি নিজের জীবনীভিত্তিক বই 'ফাইন্ডিং পিস ইন দ্য হলি ল্যান্ড' প্রকাশ করেছেন। ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে এই বই প্রকাশ কালে লরেন বুথ জানান, এটি পাঠকদের জন্য অনেক রকমের বার্তা এবং প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সাজানো হয়েছে। ধর্মান্তরের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে তিনি বলেন, 'যিশুকে খুঁজতে ২০০৮ সালে আমি ফিলিস্তিন সফরে গিয়েছি, কিন্তু আমি সেখানে মহানবী হযরত মুহাম্মদকে (সা.) খুঁজে পেয়েছি। আমি সেখানে এমন সত্য খুঁজে পেয়েছি যার সম্পর্কে আগে কিছুই জানতাম না। ১৯৯৭ সাল থেকে সাংবাদিকতায় আসা লরেন বুথ বার্তা সংস্থা সিএনএন, আল-জাজিরা, দ্যা ডেইলি মেইল সহ অনেক জনপ্রিয় সংবাদ মাধ্যমে লিখে থাকেন। ২০০৬ সালে তিনি আইটিভির 'আই এম সেলিব্রিটি' রিয়েলিটি শো'র আয়োজক ছিলেন। তিনি যুদ্ধ বিরোধী সংগঠন স্টপ দ্য ওয়ার কোয়ালিশনের সমর্থক। অটোমানদের ইতিহাস সম্পর্কে একটি ইউটিউব চ্যানেলের জন্য দারুণ সব ভিডিও তৈরি করেন তিনি। মসজিদ ও ইতিহাস নিয়ে তার বেশকিছু ভিডিও ব্যাপক প্রচার পেয়েছে।

ক্যাট স্টিভেন্স : বিশ্বব্যাপী ইসলামী সংগীত জগতের আইকন হিসেবে খ্যাত ব্রিটেনের ইউসুফ ইসলাম। এক সময়ের পপ সংগীত জগতের আইকন বহুল আলোচিত ক্যাট স্টিভেন্স এখন ইউসুফ ইসলাম। অসামান্য সুর আর মায়াময় কণ্ঠের যাদুতে তার প্রতিটি গান মুগ্ধ করে লক্ষ লক্ষ সংগীত অনুরাগীদের ক্যাট স্টিভেন্স ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ইসলামী সংগীতের জগতে নতুন মাত্রা সৃষ্টি করেন। মুসলিম বিশ্বে তার পরিচিতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। চির সবুজ গীতিকার, সুরকার ও গায়ক ক্যাট স্টিভেন্স নতুনভাবে জাগিয়েছেন তার অনুরাগীদের। এমনিতেই ষাটের মাঝমাঝি থেকে সত্তরের শেষ অবধি তার পপ সংগীত সাড়া জাগিয়েছিল বিশ্বব্যাপী সাফল্য ও জনপ্রিয়তার শীর্ষে ছিলেন তিনি। স্বপ্ন আর ভালোবাসা নিয়ে গাঁথা তার ব্যালাড আঙ্গিকের গান আজো মুগ্ধ করে অসংখ্য সংগীত অনুরাগীদের।

ইউসুফ ইসলাম ১৯৮১ সালে লন্ডনে ইসলামিয়া স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এটি মুসলিম কমিউনিটির জন্য বিশেষ নিয়ামত। আমি ব্যক্তিগতভাবেও গত ২০ বছর ধরে এটার প্রচার ও প্রসারে সচেষ্ট রয়েছি। বর্তমানে এই ধারায় আরও বেশ কিছু ইসলামিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইউসুফ ইসলাম ব্রিটেনে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশের পাশাপাশি সেবা কর্মেও সম্পৃক্ত রয়েছেন। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মানবিক ও সামাজিক সংগঠনের সাথে কাজ করে চলেছেন। মানবিকতা ও শান্তির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে 'ম্যান ফর পিস অ্যাওয়ার্ড' সহ বহু আন্তর্জাতিক সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন সংগীত শিল্পী ক্যাট স্টিভেন্স ওরফে ইউসুফ ইসলাম।

রজার গারাউডি : বিশিষ্ট পণ্ডিত রজার গারাউডি একজন ফরাসি দার্শনিক, ফরাসি প্রতিরোধ যোদ্ধা এবং একজন কমিউনিস্ট লেখক। ১৯৮২ সালে তিনি ইসলামে ধর্মান্তরিত হন। তার মাধ্যমে আরও বহু উচ্চ শিক্ষিত মানুষ ইসলাম কবুল করেছেন।

সেদরিক রিব রুট : ডক্টর সেদরিক রিব রুট ছিলেন ফ্রান্সে একজন অর্থোডক্স খ্রিস্টান পাদ্রি। তিনি একাধারে দক্ষ সঙ্গীত শিল্পী, পিয়ানো-বাদক, কবি ও সাহিত্যিক। সাহিত্য বিষয়ে তার লেখা কয়েকটি বইও প্রকাশিত হয়েছে। সবাইকে বিস্মিত করে ছয় বছর আগে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মুসলমান হওয়ার পর নিজের জন্য আহমদ আলী নামটি বেছে নেন সাবেক সেদরিক।

আহমদ ডেনফার : ১৯৪৯ সালে জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেন আহমদ ভন ডেনফার। তিনি ইউনিভার্সিটি অফ মেইনজ-এ ইসলামিক এবং সামাজিক নৃবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। সেখানে তিনি মিসিওলজি বিভাগে অতিরিক্ত কোর্সেও যোগদান করেন। তার বিশেষ আগ্রহের মধ্যে রয়েছে খ্রিস্টান-মুসলিম সম্পর্ক। তিনি প্রতি জার্নালে অনেক অবদান রেখেছেন। তার কৃতিত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি প্রকাশনা রয়েছে। ১৯৭৮ সালে তিনি রিসার্চ ফেলো হিসাবে ইসলামিক ফাউন্ডেশনে যোগদান করেন এবং বর্তমানে ইসলামিক সেন্টার মিউনিখে কাজ করছেন।

পিয়েরে ভোগেল : খ্যাতিমান বক্সার পিয়েরে ভোগেল ধর্মান্তরিত হওয়ার পর আকর্ষণীয় ইসলামী বক্তা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ২৩ বছর বয়সে ইসলাম ধর্ম কবুল করেছেন। তখন তিনি একজন পেশাদার বক্সার ছিলেন। মক্কায় দুই বছর অধ্যয়ন করার পর ভোগেল অনলাইনে চমৎকারভাবে ইসলাম প্রচার শুরু করেন।

ভ্যান ডি ভেন: ডাচম্যান আব্দুল জব্বার ভ্যান ডি ভেন হলেন আরেকজন নেতৃস্থানীয় ধর্মান্তরিত। তিনি ১৪ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। নেদারল্যান্ডসে ফিরে যাওয়ার আগে তিনি আম্মান ও মদিনায় পড়াশোনা করেছেন। পিয়েরে ভোগেলের মতো, ভ্যান ডি ভেন তার ইসলামী বার্তা প্রচারের জন্য ব্যাপকভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করেন।

গিনিড ও'কনর: অতি সম্প্রতি সুপরিচিত আইরিশ গায়িকা সিনিড ও'কনর ঘোষণা করেছেন যে, তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। নাম পরিবর্তন করে তিনি নিজের নাম রেখেছেন শুহাদা। উনিশশত নব্বই সালে রিলিজ করা 'নাথিং কমপেয়ার্স টু ইউ' গানটির জন্যে তিনি সর্বত্র সুপরিচিত। ওই বছরের সবচেয়ে হিট গানের তালিকায় ছিল এই গানটি। টুইটারে দেওয়া বার্তায় তাকে সাহায্য করার জন্য তিনি অন্য মুসলমানদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সিনিড ও'কনর বলেছেন, তার এই সিদ্ধান্ত যেকোনো বুদ্ধিমান ধর্মতত্ত্ববিদের সফরের স্বাভাবিক পরিণতি। নিজের একটি ভিডিও প্রকাশ করেছেন, যাতে দেখা যায় তিনি আজান দিচ্ছেন।

ধর্মান্তরিত কয়েকজনের প্রতিক্রিয়া

ব্রিটেনের জাতীয় দৈনিক দ্য গার্ডিয়ান ইসলামে ধর্মান্তরিত কয়েকজনের সাক্ষাৎকার নিয়েছে। CONVERTING TO ISLAM: BRITISH WOMEN ON PRAYER, PEACE AND PREJUDICE, 11 Oct 2013, .the guardian) প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে লকাল অথরিটিতে কর্মরত আয়নি সুলিভান (৩৭) বলেছেন, পূর্ব সাসেক্সে আমি একজন মুসলিমকে বিয়ে করেছি এবং আমার দুটি সন্তান আছে। আমরা লুয়েসে থাকি, যেখানে আমি সম্ভবত গ্রামে একমাত্র হিজাবি। আমি মধ্যবিত্ত, বামপন্থী, নাস্তিক পরিবারে জন্মেছি এবং বেড়ে

উঠেছি। আমার বাবা একজন অধ্যাপক, আমার মা একজন শিক্ষক। যখন ২০০০ সালে কেমব্রিজে এমফিল শেষ করেছি, তখন আমি মিশর, জর্ডান, ফিলিস্তিন এবং ইসরায়েলে কাজ করেছি। ইসলাম সম্পর্কে আমার মোটামুটি স্টিরিওটাইপিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। কিন্তু মুসলমানদের বিশ্বাস থেকে প্রাপ্ত শক্তিতে আমি প্রভাবিত হই। তাদের অস্তিত্বে প্রশান্তি এবং স্থিতিশীলতা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি একটি আরবি কোর্স করি এবং কোরানের একটি ইংরেজি কপি পড়তে শুরু করি। তারপর ইসলামিক অভ্যাসগুলির দিকে নজর দেই। মনে মনে আমি নিজেকে একজন মুসলিম ভাবতে লাগলাম, এভাবেই আমি বদলে গেলাম।

সামাজিক মনোবিজ্ঞানী এবং লিঙ্গ সমতা কর্মী অনিতা নায়ার (৩৭) সাক্ষাৎকারে বলেছেন, আমি একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। আমার হিন্দু দাদা-দাদি ভারত ও পাকিস্তানের বিভাজনের সময় কঠিন জীবনযাপন করেছিলেন। ফলে আমি মুসলিম হওয়া কী তা নিয়ে মোটামুটি ম্লান দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে বড় হয়েছি। এছাড়া আমি খুব ধার্মিক খ্রিস্টান ছিলাম, গির্জার সাথে জড়িত এবং একজন ভিকার হতে চেয়েছিলাম। ১৬ বছর বয়সে আমি একটি ধর্মনিরপেক্ষ কলেজে ভর্তি হই, যেখানে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব হয়। তারা আচরণে খুব স্বাভাবিক ছিল এবং আমি তাদের কতটা পছন্দ করতাম তা দেখে আমিই হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমি বিতর্ক শুরু করি, প্রাথমিকভাবে তাদের জানাতে যে তারা কী ভয়ানক ধর্ম অনুসরণ করে। কিন্তু আমি শিখতে শুরু করি যে এটি খ্রিস্টধর্ম থেকে খুব বেশি আলাদা নয়। আসলে, এটি আরও অর্থপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল। আমি ধর্মান্তরিত হতে দেড় বছর সময় নিয়েছিলাম। ২০০০ সালে ১৮ বছর বয়সে আমি মুসলমান হয়েছি। এই ধর্মে আমি অভিভূত।

ডাঃ অ্যানি (আমিনা) বললেন, ছয় বছর বয়সে যুক্তরাজ্যের বোর্ডিং স্কুলে আসার আগে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মিশরে বড় হয়েছি। তারপরে লন্ডন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসা ট্রেনিং করেছি। ২১ বছর আগে আমি ধর্মান্তরিত হয়েছি। ক্যাথলিক ধর্মের চেয়ে আরও আধ্যাত্মিক বিকল্পের জন্য দীর্ঘ অনুসন্ধানের ফলাফল ছিল। যখন ধর্মান্তরিত হলাম, আমি বিভিন্ন ইসলামিক সম্প্রদায়ে সাথে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করেছি: তুর্কি, পাকিস্তানি এবং মরক্কো ইত্যাদি। তিন বছর ধরে মরক্কোর মসজিদে গিয়ে, সেখানে আমি পেয়েছি নির্মলতা, প্রজ্ঞা এবং শান্তি।

ব্রিটেনের মিডল্যান্ডসে বসবাসকারী সফ্টওয়্যার ডেভলাপার নাম প্রকাশ না করে বলেছেন, আমি যখন মুসলিম হয়েছিলাম তখন ছাত্র ইসলামী সমাজের সাথে মিশেছিলাম। যারা সুখী-সৌভাগ্যবান ও স্পষ্টভাষী। বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমানদের সাথে দেখা করার পর, আমি আগ্রহী হয়ে উঠতাম। আমি ইসলাম অধ্যয়ন শুরু করি এবং কোরআনের শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হই। দুই বছর পর, ২৩ বছর বয়সে, আমি আমার শাহাদাহ (ইসলামিক বিশ্বাস) গ্রহণ করি। আমার পরিবার শিখ। পরিবারের সাথে এক বাড়িতে থাকি। আমার পরিবার এবং শিখ বন্ধুরা এখনও আমার ধর্মান্তর সম্পর্কে জানতে পারেনি। তবে আমি আমার কোরআনের কপিগুলো লুকিয়ে রাখছি না। আমি ইসলাম অধ্যয়ন করছি, যাতে তারা জানতে পারে আমি এমন একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ইসলাম আমাকে স্বাধীনতা ও প্রশান্তির বোধ দিয়েছে।

এভাবে প্রায় প্রতিনিয়ত বিভিন্ন পেশা ও আদর্শের বহু লেখক, চিন্তাবিদ, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী ও মানবতাবাদী মানুষ ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলামের প্রচারে আত্মনিবেদিত হচ্ছেন।

ধর্মান্তরিতদের নিয়ে সমালোচনা

ইউরোপে ইসলামিক সক্রিয়তা: ধর্মান্তরিতদের ভূমিকা (ISLAMIC ACTIVISM IN EUROPE: THE ROLE OF CONVERTS BY EMMANUEL KARAGIANNIS, AUGUST 2011, VOLUME 4, ISSUE 8) শীর্ষক নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলাম ইউরোপে দ্রুত বর্ধনশীল ধর্ম। ইউরোপে বসবাসকারী মুসলমানদের মধ্যে অভিবাসন এবং উচ্চ জন্মহারের কারণে তা হলেও, স্থানীয় ইউরোপীয়দের ধর্মান্তরও এই বৃদ্ধির মধ্যে রয়েছে। ইউরোপে সম্ভবত ২ লাখ থেকে ৩ লাখ ২০ হাজর ধর্মান্তরিত হয়েছেন। বেশিরভাগ ইউরোপীয় ধর্মান্তরিতরা ইসলামের উদার ব্যাখ্যা অনুসরণ করেন। যেহেতু তারা আধুনিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে বেড়ে উঠেছেন, তাই স্বাভাবিক ভাবেই ইসলামকে নিজেদের প্রয়োজনে মানানসই মনে করেন।

ধর্মান্তর বিরোধী এই লেখায় নতুন মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা রকম 'জিহাদি' তকমা দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ নিবন্ধে অনেক তথ্য সংযুক্ত করলেও সত্য সুন্দরের পক্ষে মানুষের এই পরিবর্তনের কারণ উপলব্ধি করতে লেখক ব্যর্থ হয়েছেন। উল্লেখ্য, ১৯৮০র দশকের শেষের দিকে ইউরোপে ইসলামিক সক্রিয়তার বিষয়টি প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল, যখন ব্রিটেনে সালমান রুশদির প্রতিবাদ হয়েছিল। হাজার হাজার মুসলমান এই ব্রিটিশ লেখকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন এবং তার বই 'দ্য স্যাটানিক ভার্সেস'র কপি পুড়িয়ে দেন। এসবই এই গ্রন্থে গুরুত্বের সাথে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ইসলামী প্রকাশনা ও প্রচারণা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন: ব্রিটেনের লেস্টার শহরে অবস্থিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ বছর ৫০তম বার্ষিকী পালন করছে। গত অর্ধ শতকে তারা ৯টি মাইলফলক অর্জন করেছে। ১. গবেষণা: সেমিনার, গবেষণা পত্র, বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জার্নাল। ২. প্রকাশনা: চার শতাধিক বই প্রকাশ। ৩. শিক্ষা: মার্কফিল্ড ইনস্টিটিউট অব হায়ার এডুকেশন প্রতিষ্ঠা। ৪. লাইব্রেরি: ৩৫ হাজারের অধিক বই নিয়ে অনন্য সাধারণ গ্রন্থাগার। ৫. নিউ মুসলিম প্রজেক্ট: নওমুসলিমদের আরবি, ইসলাম এবং কাউন্সেলিং শিক্ষা। ৬. আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক: বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে কথোপকথনে অগ্রগামী ইসলামী সচেতনতা কোর্স। ৭. এনডাউমেন্ট (ওয়াকফ): যোগ্য ছাত্রদের জন্য ২ মিলিয়ন পাউন্ডের অধিক স্কলারশিপ প্রদান। ৮. মার্কফিল্ড কনফারেন্স সেন্টার: ৯ একর জুড়ে প্রশান্ত ও প্রশস্ত মিলনায়তন। ৯. অত্যাধুনিক মার্কফিল্ড মসজিদ। ইসলামের প্রকৃত সম্ভাবনা আবিষ্কার করতে মানবতাকে সহায়তা করা এবং মানব সমাজে শান্তি, অগ্রগতি এবং সাফল্য অর্জনের জন্য গবেষণা ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাউন্ডেশন। ইসলামী বিশ্ব ও ইউরোপের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন, পারস্পরিক বোঝাপড়া, সম্মান এবং সহনশীলতা প্রচারের অভূতপূর্ব সুযোগ তৈরি হয়েছে এখানে। ইসলামী জ্ঞান ও অনুশীলনে উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে একটি সুন্দর আগামী গড়তে অবদান রাখছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

ব্রিটিশ লাইব্রেরি : হাজার বছর আগের হাতে লেখা কোরান শরীফ আছে ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে। সেই সাথে আছে অটোম্যানদের সময়কার কারুকার্য-শোভিত কোরান শরীফ। ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি

সোমবার থেকে ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে যাতায়াত শুরু করি। এখন নিয়মিত সদস্য হিসেবে যুক্ত আছি। এদেশে দর্শনীয় বিষয়ের মধ্যে নান্দনিক নিদর্শন এবং কসমোপলিটন সংস্কৃতি উপভোগ করেন অধিক সংখ্যক ভ্রমণ পিয়াসী মানুষ। তবে পৃথিবী জুড়ে জ্ঞানী মানুষেরা ব্রিটিশ লাইব্রেরি দেখার আগ্রহ লালন করেন। এটা আমারও একটা আকর্ষণস্থল। লন্ডনের গ্রেট রাসেল স্ট্রিটে 'ব্রিটিশমিউজিয়াম ও ব্রিটিশলাইব্রেরি' অবস্থিত। এখানে রয়েছে এশিয়া, ইউরোপ, গ্রীক, মিশরীয় প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতার এক বিশাল সংগ্রহ। ১৭ কোটি বস্তু নিয়ে এটি বিশ্বের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান, ব্রিটেনের জাতীয় গ্রন্থাগার। লন্ডনে ১৭৫৩ সালে স্থাপিত লাইব্রেরিটি পৃথিবীর বিখ্যাত গবেষণা গ্রন্থাগারগুলোর একটি। এতে আছে প্রায় সব ভাষার বিভিন্ন ধরনের ১ কোটি ৫৫ লাখের বেশি সংগ্রহ। প্রতি বছর ব্রিটিশ লাইব্রেরির সংগ্রহশালায় যুক্ত হয় প্রায় ৩০ লাখ নতুন বই। এই লাইব্রেরিতে রয়েছে ইতিহাসখ্যাত 'ম্যাগনাকার্টা'। ১২১৫ সালে ল্যাটিনে লেখা এই ডকুমেন্টই ছিল ইংল্যান্ডের কোন রাজার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের পক্ষে রচিত প্রথম দলিল। এক অর্থে গণতন্ত্রে উত্তরণের বুনিয়াদ ছিল এই ম্যাগনাকার্টা। প্রথম সার্থক ইংরেজ কবি খ্যাত জিওফ্রে চসার রচিত ক্যান্টরবেরি টেলগের পাণ্ডুলিপি রয়েছে এখানে। সেই সাথে ১৬২৩ গালে ছাপা শেক্সপিয়ারের প্রথম ফোলিও, জেন অস্টেন, রুড-ইয়ার্ড কিপলিং, শার্লট ব্রন্টি, লুই ক্যারল, চার্লস ডিকেন্স, জর্জ ইলিয়ট, ভার্জিনিয়া উলফ, টমাস হার্ডি প্রমুখ সাহিত্যিকের নানা রচনার পাণ্ডলিপি রয়েছে।

আমার গ্রন্থসমূহ এবং সম্পাদিত বাংলাদেশি ব্যবসা-বাণিজ্যের নাম ঠিকানা ও ফোন নাম্বার সম্বলিত ইউকে বাংলা ডাইরেক্টরি, ব্রিটেনের সকল এশিয়ান রেষ্টুরেন্ট নিয়ে প্রকাশিত ইউকে এশিয়ান রেষ্টুরেন্ট ডাইরেক্টরি এবং ইসলামিক সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) ৫৭টি দেশের তত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ ডাইরেক্টরি মুসলিম ইন্ডেক্স ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। এছাড়াও আমার সম্পাদিত দৈনিক সময় যখন মাসিক ম্যাগাজিন ছিল তখনকার প্রতিটি সংখ্যা এবং সাপ্তাহিক ইউরো বাংলা নিয়মিত পাঠাতাম। কোন একটি সংখ্যা বাদ পড়লে চিঠি পাঠিয়ে ব্রিটিশ লাইব্রেরি তা সংগ্রহ করে নেয়। এই লাইব্রেরিতে ইসলাম সম্পর্কে জানার এবং ইসলামী আর্কাইভ নিয়ে গবেষণার জন্য মানুষের আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইস্ট লন্ডন মস্ক আর্কাইভ স্ট্রংরুম :শতাধিক বছরের পুরনো আড়াই লক্ষ ডকুমেন্টস সংরক্ষণের মধ্যদিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে লন্ডন মুসলিম সেন্টারের ইস্ট লন্ডন মস্ক আর্কাইভ স্ট্রংরুম। ২০১৭ সালের ২২ নভেম্বর এই আর্কাইভের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন লন্ডন মেয়র সাদিক খান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাদিক খান বলেন, এই আর্কাইভ স্থাপনের মাধ্যমে আজ থেকে শত বছর আগে আমাদের পূর্ববর্তী বংশধর ইস্ট লন্ডন মসজিদ প্রতিষ্ঠায় যে অবদান রেখে গেছেন তা যুগযুগ ধরে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য ইতিহাস হয়ে থাকবে। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইস্ট এন্ডের মুসলমানদের অতীত অবদান ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী লন্ডনারদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

অনুষ্ঠানে ইস্ট লন্ডন মসজিদের তৎকালীন চেয়ারম্যান মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান বলেন, এই আর্কাইভ স্ট্রংরুম প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আমরা ১৯১০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ইস্ট লন্ডন মসজিদের ১০৭ বছরের আড়াই লক্ষাধিক ডকুমেন্টস সংরক্ষণ করতে পেরেছি। এসব ডকুমেন্টস আধুনিক ব্রিটিশসমাজের ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে প্রাথমিক সোর্স হিসেবে ভূমিকা রাখবে। তিনি আরও বলেন, মানুষ ব্রিটেনে মুসলমানদের অভিবাসন প্রক্রিয়া, বিশেষ করে ইস্ট এন্ডের মুসলমানদের ইতিহাস জানতে পারবেন। এই স্ট্রংরুম আগামী দিনে ইস্ট লন্ডন মসজিদের নতুন নতুন ডকুমেন্টস সংরক্ষণ করবে। তিনি আর্কাইভ প্রতিষ্ঠায় প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর হুমায়ুন আনসারী, প্রফেসর জন উলফ, টাওয়ার হ্যামলেটগ কাউন্সিল, টাওয়ার হ্যালেটগ লোকাল হিস্ট্রি লাইব্রেরী এন্ড আর্কাইভস এর হ্যারিটেজ ম্যানেজার টামসিন বুকির আন্তরিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান।

১৯১০ সালের ইস্ট লন্ডন মসজিদ ফান্ডের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য স্যার সৈয়দ আমির আলী, ইতিহাসবিদ প্রফেসর টি ডাব্লিউ আরনোলড, স্যার আর্নেস্ট হিউস্টন, স্যার জন উডহেড, আর্ল উইন্টারটন, প্রখ্যাত কুরআন অনুবাদক আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী ও মুহাম্মদ মারমাডুক পিকতলের অবদান অনুষ্ঠানে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়। উল্লেখ্য, আর্কাইভ স্ট্রংরুম এমন একটি নিরাপদ সংরক্ষণ ব্যবস্থা, যা পানি ও আগুন থেকে সবধরণের ডকুমেন্টস রক্ষা করতে পারে। জনসাধারণের জন্য অ্যাপোয়েন্টমেন্টের মাধ্যমে ডকুমেন্টস দেখার সুযোগ রয়েছে। স্কুল, কলেজ ও ইনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষামূলক কাজে আর্কাইভ পরিদর্শনকে মসজিদের পক্ষ থেকে স্বাগত জানানো হয়েছে।

এছাড়াও ব্রিটেন সহ ইউরোপে অনেক সরকারি ও বেসরকারি লাইব্রেরিতে ইসলামী গ্রন্থ রাখা হয়। অনেক প্রকাশনায় কোরআন-হাদিস এবং ইসলামী মূল্যবান গবেষণা গ্রন্থ রয়েছে। বইয়ের দোকানে এসবের ঘাটতি উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি ফরাসি দৈনিক লা মন্ডের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফ্রান্সে ইসলাম ও মুসলমানদের দমিয়ে রাখার জন্য উগ্র ইহুদিবাদী নানা গ্রুপ ও ডানপন্থী ফরাসি দলগুলোর ব্যাপক তৎপরতা সত্ত্বেও এই দেশটিতে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় এবং সর্বাধিক বিক্রিত গ্রন্থের তালিকার শীর্ষে রয়েছে পবিত্র কুরআন।

ইউরোপে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি

ইউরোপের ক্রমবর্ধমান মুসলিম জনসংখ্যা (EUROPEÕS GROWING MUSLIM POPULATION) শীর্ষক গবেষণায় বলা হয়েছে, কিছু ইউরোপীয় দেশে মুসলিম জনসংখ্যা ২০৫০ সালের মধ্যে তিনগুণ হতে পারে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সিরিয়া, ইরাক ও আফগানিস্তানের সংঘাত থেকে পালিয়ে আসা লোকজনের কারণে আশ্রয় প্রার্থীদের (ASYLUM SEEKERS) রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। অভিবাসীদের এই প্রবাহের ঢেউ অনেক দেশে অভিবাসন এবং নিরাপত্তা নীতি নিয়ে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ইউরোপে মুসলমানদের বর্তমান ও ভবিষ্যত সংখ্যা নিয়েও প্রশ্ন ওঠেছে। ভবিষ্যতে কোন রকম অভিবাসন ছাড়াই মুসলমানেরা ইউরোপের জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য অংশ হিসেবে বৃদ্ধি পাবে বলেও অনুমান করা হচ্ছে। আগামী কয়েক দশকে ইউরোপের মুসলিম জনসংখ্যার আকার কীভাবে পরিবর্তিত হতে পারে তা নিয়ে ২০১৭ সালে আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা 'পিউ রিসার্চ সেন্টার' একটি চিত্র তৈরি করেছে। বিভিন্ন ধর্মের মানুষের সংখ্যার অনুপাতে ২০৫০ সালে ইউরোপের চেহারাটা কেমন দাঁড়াবে তা চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে মুসলিম জনসংখ্যা বিরাট বৃদ্ধি ঘটবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। তবে তারা বলছে, এটা তাদের

ভবিষ্যদ্বাণী নয়, বরং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কী ঘটতে পারে সে সম্পর্কে গবেষণার ফসল মাত্র।

ইউরোপে মুসলিম জনসংখ্যা ২৫.৮ মিলিয়ন। সামগ্রিক জনসংখ্যার ৪.৯ শতাংশ। এটা ২০১৬ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত হিসাব এবং এতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৮টি দেশ এবং নরওয়ে ও সুইজারল্যান্ড যুক্ত রয়েছে। ২০১০ সালে তা ছিল ১৯.৫ মিলিয়ন (৩.৮%)। এই সময়ে ইউরোপে আসা মুসলিম অভিবাসীর সংখ্যা প্রায় অর্ধ মিলিয়ন বেড়েছে। পিউ রিসার্চ সেন্টার তিনটি দৃশ্যকল্পে ব্যাপারটা সাজিয়েছে। প্রথম দৃশ্যকল্প হল 'শূন্য অভিবাসন'। যদি ইউরোপে সমস্ত অভিবাসন অবিলম্বে এবং স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়, তবুও ইউরোপের মুসলিম জনসংখ্যা ২০৫০ সাল নাগাদ বর্তমান স্তরের ৪.৯ শতাংশ থেকে ৭.৪ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। এর কারণ হল, কম বয়সী মুসলিম (গড়ে ১৩ বছর) এবং অন্যান্য ইউরোপীয়দের তুলনায় অধিক জন্মহার উর্বরতা। সমীক্ষায় দেখা যায়, অন্য ধর্মের লোকদের তুলনায় মুসলমানদের বেশি সন্তান রয়েছে। ইউরোপীয় গড় প্রজনন হার অমুসলিমদের ১.৬ এর তুলনায় মুসলমানদের ২.৬। কম বয়সী মুসলিম জনসংখ্যার তুলনায় অমুসলিমদের সংখ্যা অনেক কম। ১৫ বছরের কম বয়সী অমুসলিমদের অনুপাত ১৫%, একই বয়সী মুসলমানদের অনুপাত ২৭%, প্রায় দ্বিগুণ। এছাড়াও ইউরোপের অধিক সংখ্যক মুসলিম অধ্যুষিত সাইপ্রাস, যেখানে দ্বীপের উত্তরে তুর্কি সাইপ্রিয়টদের ঐতিহাসিক উপস্থিতির কারণে ২৫.৪%, ফ্রান্সের জনসংখ্যার ১২.৭% থাকবে, যা ৮.৮% ছিল।

দ্বিতীয় দৃশ্যকল্প 'মাঝারি' অভিবাসন হিসেবে অনুমান করা হয়, ২০১৬ সালের মাঝামাঝি থেকে সমস্ত শরণার্থী প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলেও ইউরোপে 'নিয়মিত' অভিবাসনের সাম্প্রতিক স্তরগুলি অব্যাহত থাকবে। অর্থাৎ যারা আশ্রয় চাওয়া ছাড়া অন্য কারণে আসেন তাদের অভিবাসন। যেমন অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত বা পারিবারিক কারণে। এই পরিস্থিতিতে ২০৫০ সালে ইউরোপের জনসংখ্যার ১১.২ শতাংশ হতে পারে মুসলিম। মাঝারি অভিবাসন পরিস্থিতিতে সম্ভবত সুইডেনের মুসলিম জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি ২০.৫% হবে। যুক্তরাজ্যে ৬.৩% থেকে বেড়ে ১৬.৭% হবে। ফিনল্যান্ডের মুসলিম শেয়ার ২.৭% থেকে বেড়ে ১১.৪% হবে এবং বেশিরভাগ পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতে একটি বড় সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। তৃতীয় 'উচ্চ'অভিবাসন দৃশ্যকল্পতে ২০১৪ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে ইউরোপে শরণার্থীদের রেকর্ড প্রবাহকে প্রজেক্ট করা হয়েছে। এতে নিয়মিত অভিবাসীদের সাধারণ বার্ষিক প্রবাহ ছাড়াও একই ধর্মীয় ছকে (অর্থাৎ বেশিরভাগ মুসলমানদের দ্বারা গঠিত) যদি ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকে, এই পরিস্থিতিতে ২০৫০ সালের মধ্যে ইউরোপের জনসংখ্যার ১৪ শতাংশ হতে পারে মুসলিম। বর্তমান হিসেবের প্রায় তিনগুণ। যদি ২০৫০ সাল পর্যন্ত উচ্চ অভিবাসন অব্যাহত থাকে, তাহলে সুইডেনের মুসলিম অংশ ৩০.৬%, ফিনল্যান্ডের ১৫% এবং নরওয়ের ১৭%-এ বৃদ্ধি পাবে। পূর্ব ইউরোপের হাঙ্গেরি এবং গ্রীসে উল্লেখযোগ্য মুসলিম বৃদ্ধি পাবে।

আশ্রয়প্রার্থী প্রত্যাশিত বা যাদের আশ্রয়ের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, যদিও এই জনসংখ্যা সাময়িকভাবে বা অবৈধভাবে ইউরোপে থাকতে পারে, সেসব অভিবাসীদের এই প্রতিবেদনে জনসংখ্যার হিসাব থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। গত কয়েক বছরের শরণার্থী প্রবাহ সাম্প্রতিক দশকের ঐতিহাসিক গড় তুলনায় অত্যন্ত বেশি।

ওই প্রতিবেদনে পশ্চিম-পূর্ব বিভাজন দেখানো হয়েছে। যদি উচ্চ অভিবাসন অব্যাহত থাকে তবে জার্মানির জনসংখ্যার মুসলিম অংশ ২০১৬ সালে ৬.১% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০৫০ সালে ১৯.৭% হতে পারে। পিউ রিসার্চ সেন্টার এই গবেষণাটি চালায় মোট তিরিশটি দেশের ওপর। এর মধ্যে ২৮টি হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বর্তমান সদস্য রাষ্ট্র। অন্য দুটি দেশ হচ্ছে নরওয়ে এবং সুইটজারল্যান্ড। ২০১৬ সালের তথ্য বিবেচনায় নিলে ইউরোপের এই তিরিশটি দেশের মুসলিম জনসংখ্যা এই মূহুর্তে ২ কোটি ৫৭ লক্ষ। সংখ্যার হিসেবে এবং জনসংখ্যার অনুপাতে সবচেয়ে বেশি মুসলিম ফ্রান্সে। দেশটিতে বাস করেন প্রায় অর্ধ কোটি মুসলিম (৪৯ লক্ষ ৫০ হাজার)।

ইউরোপের এই তিরিশটি দেশের মধ্যে মুসলমানদের দ্বিতীয় বৃহত্তম সংখ্যা হচ্ছে জার্মানিতে। মোট মুসলিমের সংখ্যা ৫৭ লক্ষ ২০ হাজার। ব্রিটেনে মুসলমানদের সংখ্যা ৪১ লক্ষ ৩০ হাজার। এছাড়া ইউরোপে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলিম আছেন নেদারল্যান্ডস, ইটালি, স্পেন এবং সুইডেনে। যদি মধ্যম হারে অভিবাসন চলতে থাকে, তাহলে ইউরোপে মুসলমানের সংখ্যা ২০৫০ সাল নাগাদ সাড়ে পাঁচ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। এর মধ্যে ব্রিটেনেই মুসলিম সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হবে, এক কোটি ৩০ লাখ। আর উচ্চ হারে যদি অভিবাসন ঘটে, তাহলে ২০৫০ সালে ইউরোপে মুসলিমদের সংখ্যা হবে সাড়ে সাত কোটি। জার্মানি হবে ইউরোপে সবচেয়ে বেশি মুসলিম জনসংখ্যার দেশ। তাদের মোট সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় এক কোটি ৭৫ লাখ।

মূলধারার রাজনীতিতে মুসলিম ব্যক্তিত্ব

হামজা ইউসুফ :ইউরোপে নিপুণ স্থাপত্য শৈলীর দেশ স্কটল্যান্ডের ফার্স্ট মিনিস্টার তথা প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন হামজা ইউসুফ। এই প্রথম একজন মুসলিম রাজনীতিক হলেন পশ্চিম ইউরোপের কোনো দেশের সরকার প্রধান। পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ৩৭ বছর বয়সী হামজা ইউসুফ ২০২৩ সালের ২৭ মার্চ সোমবার স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টি-এসএনপির সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচিত হন। ফার্স্ট মিনিস্টার নিকোলা স্টার্জনের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন তিনি। এর মধ্য দিয়ে স্কটল্যান্ডে প্রথম মুসলিম শাসক হলেন কৌশলী ও সাহসী সংগঠক হামজা ইউসুফ। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে হামজা ইউসুফ যখন সরকারি বাসভবনে উঠেছেন, প্রথম রাতেই সেখানে নামাজ আদায় করেছেন। পরিবারের সঙ্গে এই বিশেষ মুহূর্তটি তিনি শেয়ার করেছেন টুইটার একাউন্টে। তাতে দেখা যায় তিনি নামাজে ইমামতি করছেন। আরেক ছবিতে আছেন পিতা মুজাফ্ফর ইউসুফ, মা শায়েস্তা ভুট্ট, স্ত্রী নাদিয়া এবং দুই মেয়ে। হামজা লিখেছেন, পার্লামেন্টারি ভোটের পর বিউজ হাউজে প্রথম রাত অতিবাহিত করছি আমি ও আমার পরিবার। সবাই মিলে ইফতার করে রীতি অনুযায়ী পরিবারের সদস্যরা নামাজ আদায় করলাম। এটা এক বিশেষ মুহূর্ত। ব্রিটেনসহ ইউরোপ জুড়ে এটা ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন ও ব্যক্তিত্ব হামজা ইউসুফকে প্রাণখোলা অভিনন্দন জানিয়েছেন। ধর্ম অনুশীলনকারী মুসলিম (PRACTICING MUSLIM) সম্প্রদায়ের পাশাপাশি অন্যদের মাঝেও অনুপ্রেরণার সঞ্চার করেছে। ইউরোপের মুসলিম কমিউনিটি এতে বেশ উৎফুল্ল।

আনাস সারওয়ার :২০২১ সালে স্কটল্যান্ডে আরেক মুসলিম রাজনীতিক আনাস সারওয়ার স্কটিশ লেবার পার্টির প্রধান নির্বাচিত

হয়েছেন। এশীয় বংশোদ্ভূত এবং মুসলমান প্রতিনিধি হিসেবে আনাসই প্রথম ব্যক্তি ব্রিটেনের কোনো বড় দলের নেতা নির্বাচিত হলেন। গ্লাসগো সেন্ট্রাল আসনের স্কটিশ পার্লামেন্ট সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। এই আসনে ১৯৯৭ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত এমপি ছিলেন আনাস সারওয়ারের বাবা ব্রিটেনের প্রথম মুসলিম এমপি মোহাম্মদ সারওয়ার। ২০১০ সালে বাবার আসনে প্রথম এমপি নির্বাচিত হন আনাস সারওয়ার।

বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত একমাত্র স্কটিশ পার্লামেন্ট সদস্য ফয়ছল চৌধুরী এমবিই জানালেন, স্কটল্যান্ডে এখন ৪ জন মুসলিম এমপি। সকলেই স্কটল্যান্ডের স্বার্থ এবং নিজেদের শিকড়ের সংযোগ রক্ষা করে চলেছেন। স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টি-এসএনপির সর্বোচ্চ নেতা এবং স্কটল্যান্ডে 'ফার্স্ট মিনিস্টার' নির্বাচিত হওয়ায় তিনি হামজা ইউসুফকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। একজন সাহসী, অমায়িক ও গণমুখী রাজনীতিক হিসেবে হামজা ইউসুফের সাফল্য তিনি প্রত্যাশা করেন। ফয়ছল চৌধুরী এমবিই আরও বললেন, সেখানকার পার্লামেন্ট সদস্য ও লেবার পার্টির নেতা আনাস সারোয়ার এবং মুসলিম মহিলা সদস্য কোকাব স্টুয়ার্ডও রাজনীতিতে ভালো করছেন। মুসিলম এমিপদের মধ্যে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্য রয়েছে।

মেয়র সাদিক খান : ব্রিটিশ-পাকিস্তানি সাবেক পার্লামেন্ট সদস্য সাদিক খান যখন ২০১৬ সালে প্রথম লন্ডনের মেয়র নির্বাচিত হন, তিনি ছিলেন ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত কোন দেশের রাজধানী শহরের প্রথম মুসলমান মেয়র। তখন থেকে নতুন প্রজন্মের মুসিলম তরুণেরা মূলধারার রাজনীতিতে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণে আশাবাদী হয়েছেন। লন্ডনের মেয়র হিসেবে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে ২০১৬ সালে বরিস জনগণের স্থলাভিষিক্ত হন সাদিক খান। তিনি ২০১৫ সালে সাউথ লন্ডনের টুটিংয়ের এমপি ছিলেন। তখন তিনি ছায়া মন্ত্রিসভায় যোগদানকারী প্রথম এশিয়ান ও মুসলিম এমপি। ১৯৯৪ সালে ২৩ বছর বয়সে তিনি সর্বকনিষ্ঠ কাউন্সিলর ছিলেন। লেবার পার্টির ১১৬ বছরের ইতিহাসে তিনি সবচেয়ে সিনিয়র মুসলিম সদস্য। সাদিক খান পরিবহন দফতর এবং কমিউনিটি ও স্থানীয় সরকার বিভাগের মন্ত্রীও ছিলেন। তিনি একজন মানবাধিকার আইনজীবী হিসেবে সর্বোচ্চ আদালত ও ট্রাইব্যুনালে বেশ কয়েকটি যুগান্তকারী মামলায় ভূমিকা পালন করেছেন। লন্ডন মেয়র নির্বাচনে টোরি প্রার্থী জ্যাক গোল্ডস্মিথের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হন। ২০২১ সালের মে মাসে লন্ডনের মেয়র হিসাবে দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হয়েছেন লেবার পার্টির নেতা সাদিক খান। বর্তমান সরকার দল কনজারভেটিভ পার্টির সাউন বেইলিকে হারিয়ে তিনি মেয়র নির্বাচিত হন। বর্ণবাদ এবং ইসলামফোবিয়ার বিরুদ্ধে তার বিজয়ে ইউরোপের মসুলিম কমিউনিটিতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

চলতি বছর প্রথমবারের মতো সেন্ট্রাল লন্ডনের আইকনিক স্থান ও প্রধান প্রধান গড়কে মাহে রামাদানকে স্বাগত জানান মেয়র সাদিক খান। 'রামাদান মোবারক' এবং 'হ্যাপি রামাদান' লেখা সাইন ও রঙিন বাতিতে বিরল এক ঘটনার সাক্ষী হলো রাজধানী লন্ডন। অর্ধচন্দ্রাকার চাঁদ, তারা এবং ঐতিহ্যবাহী লণ্ঠনের মতো শো-পিস দিয়ে সড়কগুলো সাজানো হয়। আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে এটা ব্যাপকভাবে প্রচার হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এসব ছবি শেয়ার করেছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। মুসলিম কমিউনিটির প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে এই আলোকসজ্জার উদ্বোধন করেন লন্ডন মেয়র। বিবিসির এক প্রতিবেদন বলা হয়, প্রায় ৩০ হাজার রঙিন বাতির আলোয় ঝলমল করছে রাজধানীর ওয়েস্ট এন্ড এলাকা। পশ্চিম লন্ডনের লেইসেস্টার স্কয়ারকে পিকাডেলির সঙ্গে সংযুক্ত করেছে কভেন্ট্রি স্ট্রিট। পুরো এলাকার রাস্তাজুড়ে এখন সাজ সাজ রব। মাথার ওপর দেখা যাচ্ছে উজ্জ্বল আলোয় জ্বলজ্বল করছে 'হ্যাপি রামাদান'।

সাঈদা ওয়ার্সি : ব্রিটিশমন্ত্রিসভায় প্রথম মুসলিম সাঈদা ওয়ার্সি একজন আইনজীবী, ব্যবসায়ী মহিলা এবং একজন মূল্যবোধের প্রচারক। ২০১০ সালে তিনি কনজারভেটিভ পার্টির সহ-সভাপতি ছিলেন। ডেভিড ক্যামেরনের মন্ত্রিসভায় পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ অফিসের সিনিয়র মন্ত্রী এবং ফেইথ কমিউনিটির প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আগস্ট ২০১৪ সালে তিনি ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাতের বিষয়ে সরকারের নীতির সাথে মতানৈক্যের কারণে পদত্যাগ করেন। ব্রিটেনে এই ঘটনা ব্যাপকভাবে আলোচিত এবং মুসলিম দুনিয়ায় প্রশংসিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি হাউজ অব লর্ডসে ব্যারনেস হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ব্রিটিশপার্লামেন্টে মুসলিম সদস্য : ব্রিটেনের মূলধারার রাজনীতিতে রয়েছেন অনেক মুসলিম ব্যক্তিত্ব। তৃণমূল স্তর থেকে উচ্চতর রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তাদের অবদান এখন স্বীকৃত। ২০১৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের লেবার পার্টি থেকে ১২ জন এবং কনজারভেটিভ পার্টি থেকে ২ জন মুসলিম এমপি নির্বাচিত হয়েছেন। ১৪ জন মুসলিম এমপির মধ্যে ৮ জন মহিলা এবং ৬ জন পুরুষ। মুসলিম ব্যাকগ্রাউন্ডের এমপিদের সংখ্যা এবার বেড়েছে।

২০১৫ থেকে পুনর্নির্বাচিত এমপিরা হচ্ছেন- ইমরান হোসেন (ব্র্যাডফোর্ড ইস্ট), নাসিম নাজ শাহ (ব্র্যাডফোর্ড ওয়েস্ট), রূপা আশা হক (ইলিং সেন্ট্রাল এন্ড অ্যাক্টন), টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক (হ্যাম্পস্টেড এন্ড কিলবার্ন), নুসরাত মুনির উল গনি (ওয়েল্ডেন), খালিদ মাহমুদ (বার্মিংহাম), ইয়াসমিন কুরেশি (বোল্টন সাউথ ইস্ট), শাবানা মাহমুদ (বার্মিংহাম লেডিউড), রেহমান চিশতি (গিলিংহাম এন্ড রেইনহাম), রুশনারা আলী (বেথনাল গ্রিন এন্ড বো)। ২০১৭ সালে নির্বাচিত নতুন এমপিরা হলেন, আফজাল খান (ম্যানচেস্টার গোর্টন), ফয়সাল রশিদ (ওয়ারিংটন সাউথ), মোহাম্মদ ইয়াসিন (বেডফোর্ড), রোসেনা আলিন খান (টুটিং), সাজিদ জাভিদ (ব্রমসগ্রোভ)। ২০১৯ সালের ব্রিটিশ সংসদ নির্বাচনে লাইমহাউস সংসদীয় আসনে নির্বাচিত হয়েছেন আফসানা বেগম। উল্লেখ্য, ব্রিটিশপার্লামেন্টে মুসলিম এমপিদের মধ্যে রুশনারা আলী, রূপা হক, টিউলিপ সিদ্দিক ও আফসানা বেগম বাংলাদেশী অরিজিন। এমপিরা প্রায় সকলেই ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্থার মাধ্যমে মুসলিম কমিউনটিতে অবদান রাখছেন। তবে একজন হিজাবী মহিলা এমপি আফসানা বেগম নতুন প্রজন্মের মুসলিমদের আইকন হিসেবে পরিচিত লাভ করেছেন।

হাউস অফ লর্ডসের সদস্য : ব্রিটিশ হাউস অফ লর্ডসে মুসলিম ব্যারন এবং ব্যারনেস রয়েছেন ১১ জন। এরমধ্যে ৫ জন ব্যারোনেস এবং ৬ জন লর্ডস্। ওয়াহিদ আলী (দ্য লর্ড আলী), পলা উদ্দিন (ব্যারনেস উদ্দিন), নাজির আহমদ (লর্ড আহমদ), আমির ভাটিয়া (লর্ড ভাটিয়া ওবিই), মোহাম্মদ শেখ (লর্ড শেখ), সাঈদা ওয়ারসি (ব্যারনেস ওয়ারসি), ইসি (ব্যারনেস হুসেন ইসি ওবিই), গুলাম নুন (লর্ড নুন এমবিই), আরমিঙ্কা হেলিক (ব্যারনেস হেলিক), নশীনা

মোবারিক (ব্যারনেস মোবারিক সিবিই)। বিভিন্ন ইসলামিক অনুষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশ নিয়ে মাল্টিকালচারাল ব্রিটেনে মুসলিম কমিউনিটির বিকাশে তারা অবদান রাখছেন।

নির্বাহী মেয়র লুতফুর রহমান : লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলে তৃতীয় বারের মতো নির্বাহী মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ধর্মপ্রাণ রাজনীতিক লুতফুর রহমান। ২০১০ সালে ২১ অক্টোবরের নির্বাচনে লুতফুর রহমানের বিজয়ের মধ্যদিয়ে বৃটিশ বাংলাদেশীদের এক নব যাত্রার সূচনা হয়। ১ম বাংলাদেশী নির্বাচিত নির্বাহী মেয়র হিসেবে ইতিহাসের খাতায় নাম লেখান লুতফুর রহমান। বৃটেনে ১৩ জন নির্বাচিত মেয়রের মধ্যে তিনি একমাত্র অশ্বেতাঙ্গ এবং প্রথম মুসলিম ও প্রথম বাংলাদেশী মেয়র। অন্য সকলেই শ্বেতাঙ্গ। ব্রিটেনের শীর্ষ পত্রিকা ডেইলি টেলিগ্রাফে সেরা ১০০ প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হন মেয়র লুতফুর রহমান। টানা ৩য় বারের মতো তিনি এই তালিকায় স্থান পেয়েছেন। আগের বারের চেয়ে পরের বার তিনি ১৫ ধাপ এগিয়ে ৫৩ নাম্বারে স্থান করে নেন। টপ হান্ড্রেডস মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ব্যক্তিদের মধ্যে লুতফুর রহমান ২০১১ সালে ৭৮তম স্থান লাভ করেন। ২০১২ সালে তিনি ১০ জনকে টপকে যান। এভাবে দু বছরে ২৫ জনকে ছাড়িয়ে ৭৮ থেকে ৫৩তে স্থান করে নেন। নির্বাহী মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের আগে লুতফুর রহমান ২০০৮ থেকে ২০১০ পর্যন্ত টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলে দু টার্ম কাউন্সিল লিডার ছিলেন। পেশাগত জীবনে তিনি ফ্যামিলি এন্ড চাইলড প্রটেকশন ল স্পেশালিষ্ট ও সিনিয়র সলিসিটর। ব্রিটেনে বাংলাদেশীদের প্রাণকেন্দ্র ইস্ট লন্ডনে বাংলা ভাষা ও মুসলিম সংস্কৃতির বিকাশে তার অবদান প্রশংসনীয়।

মুসলিম সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান

ইউরোপে ইসলাম এখন দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম। এই অঞ্চলে ইসলামী জীবনধারাকে বিকশিত করতে প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কিছু সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান। ইসলামকে কলুষিত করার হীন প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে এই সব প্রতিষ্ঠানের বহুমাত্রিক প্রয়াসে। পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণকীর্তন করতে গিয়ে যারা ইসলামকে মধ্যযুগীয় বলে হেয় করে, তাদের জবাব দেওয়ার মত যোগ্য নেতৃত্ব এখানে সৃষ্টি হয়েছে। ইসলামী সভ্যতার সোনালী যুগ সম্পর্কে ইউরোপের মানুষ এখন সম্যক অবহিত। 'কারনুস সালাসাহ্' নামে খ্যাত ইসলামী সভ্যতার স্বর্ণ যুগ সম্পর্কে মহানবী মোহাম্মদ (সা.) বলেছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ আমার যুগ (সাহাবাগণসহ), তারপর নিকটবর্তী যুগ (তাবেয়ীনের), অতঃপর তৎনিকটবর্তী যুগ (তাবে তাবেয়ীনের)। সময়টা হলো ৭ম থেকে ৯ম শতাব্দী। সেকালের মানুষের জ্ঞানের প্রখরতা, ধর্মীয় আচার ও সামাজিক মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসার সমাধান দেওয়ার মতো মেধা সম্পন্ন জনবল তৈরি হচ্ছে এসব প্রতিষ্ঠান। ইউরোপে নতুন নতুন মসজিদ, শিক্ষা, সেবা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান দিন দিন বেড়ে চলেছে। আযানের সুমধুর ধ্বনি ভেসে আসছে বাতাসে। সকাল থেকে সন্ধ্যায়, প্রতিদিন বার বার।

এলএমসি : বাংলাদেশী সংগঠক ও স্কলারদের দ্বারা পরিচালিত লন্ডন মুসলিম সেন্টারে (এলএমসি) বহু জাতিগোষ্ঠির মানুষ প্রতিদিন আসেন। জুমাবারে ৮/১০ হাজার মানুষের সমাগম ঘটে। কয়েক হাজার মহিলা জুমা ও তারাবি জামাতে সমবেত হন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বহু সংগঠন ও সংস্থার কর্ণধার ও প্রতিনিধিত্বশীল জ্ঞানী-গুণী মানুষ এসে মসজিদ কর্তৃপক্ষ এবং ইমাম সাহেবদের (শায়খ আব্দুল কাইয়ুম ও হাফিজ মাওলানা আবুল হুসেন খান) সাথে সাক্ষাৎ করেন। ব্রিটেনের সাবেক ও বর্তমান মন্ত্রী-এমপি সহ সরকারি কর্মকর্তা ও মূলধারার বুদ্ধিজীবীগণ আসেন। মানবাধিকার থেকে শুরু করে জীবন ও জগতের নানা রহস্য নিয়ে গভীর আলোকপাত করেন তারা। কর্তৃপক্ষের প্রজ্ঞা ও বিনয়শীল আচরণ সবাইকে মুগ্ধ করে। বিভিন্ন ধর্মের বহু পন্ডিতজন এখানে এসে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।

২০০০ সালের জানুয়ারী মাসে আমি লন্ডন এসেছি। প্রথম দিন থেকে ইস্ট লন্ডন মসজিদে নিয়মিত নামাজ আদায় করি। এলএমসি কমপ্লেক্সের বিজনেস উইংয়ে প্রায় ১৫ বছর আমার অফিস ছিল। এর বহুমুখি কার্যক্রমের সাক্ষী ও সহায়ক শক্তি ছিলাম। ইউরোপের সর্ববৃহৎ ইসলামিক প্রতিষ্ঠান লন্ডন মুসলিম সেন্টার (এলএমসি) ও ইস্ট লন্ডন মসজিদ (ইএলএম) প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষের প্রাণকেন্দ্র। ব্রিটেনসহ ইউরোপের মুসলমানদের জন্য আনন্দ ও গর্বের প্রতিষ্ঠান। নতুন প্রজন্মের হাজার হাজার তরুণ এখান থেকে আলোর সন্ধান পেয়ে থাকেন।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাস। ১৯১০ সালে মসজিদ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বিবিসি একটি ডকুমেন্টারি করেছে। সেখানে লন্ডনের ইম্পেরিয়েল ওয়ার মিউজিয়াম থেকে অনেক ফুটেজ এবং বেশ কিছু তথ্য ও ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। তখন বিভিন্ন দেশ থেকে লন্ডনে আগত মুসলমানদের নামাজের কোনো মসজিদ ছিল না। ৯ নভেম্বর ১৯১০ সালে সেন্ট্রাল লন্ডনের রিচ হোটেলে প্রিন্স সুলতান মুহাম্মদ আগা খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় লন্ডন মস্ক ফান্ড গঠন করে মসজিদ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস শুরু হয়। ১৯৪০ সালে বাস্তবে রূপ নেয় ইস্ট লন্ডন মসজিদ। কমার্শিয়াল রোডে নিয়মিত নামাজের ব্যবস্থা হয়। সময়ের ব্যবধানে যোগ্য নেতৃত্বের তত্ত্বাবধানে কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষের সহায়তায় হোয়াইটচ্যাপেল রোড সংলগ্ন নিজস্ব স্থানে গড়ে ওঠে ইস্ট লন্ডন মসজিদ। ২০০৪ সালে যুক্ত হয় ইউরোপের মুসলমানদের প্রাণকেন্দ্র লন্ডন মুসলিম সেন্টার (এলএমসি)। মুসলিম উম্মাহর প্রাণপুরুষ পবিত্র কাবা শরিফের ইমাম শায়খ আবদুর রহমান আগ সুদাইস এলএমসি উদ্বোধন করেন। ইস্ট লন্ডন মসজিদ ও এলএমসি'র কার্যক্রম দেশে বিদেশে প্রশংসিত হয়ে আসছে। বিভিন্ন সময় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই মসজিদ পরিদর্শনে এসে মসজিদের কার্যক্রম দেখে অভিভূত হয়েছেন।

২০০১ ও ২০০৪ সালে ব্রিটেনের বর্তমান রাজা চার্লস (তৎকালীন প্রিন্স) দু'বার মসজিদ পরিদর্শন করেছেন। তখন বিশিষ্ট ইসলামী স্কলার খ্যাতিমান লেখক ও সংগঠক ড. আব্দুল বারি ছিলেন চেয়ারম্যান। এখানে বিভিন্ন সময় বিশ্বের বহু দেশের প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ এসেছেন। ব্রিটিশসরকারের মন্ত্রী ও এমপিগণ নিয়মিত বহুমুখি এই প্রকল্প পরিদর্শন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে থাকেন। কিছু দিন আগে মসজিদ পরিদর্শনে আসেন ব্রিটেনের রানীর একমাত্র কন্যা প্রিন্সেস এ্যান। তিনি প্রায় দুই ঘণ্টা অবস্থান করে মসজিদের বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে অভিভূত হন। তারপর ইস্ট লন্ডন মসজিদ এবং লন্ডন মুসলিম সেন্টার পরিদর্শন করেছেন ব্রিটিশরাজপুত্র ও পুত্রবধূ। ২০২০ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর দ্যা ডিউক এন্ড ডাচেস অফ কেমব্রিজ প্রিন্স উইলিয়াম এন্ড কেট ইস্ট লন্ডন মসজিদ এবং লন্ডন মুসলিম সেন্টার পরিদর্শন করে মুগ্ধ হন।

ইসলাম সম্পর্কে গভীরভাবে জানার জন্য বিভিন্ন ধর্মের লোকেরাও এলএমসিতে আসেন। এমনকি ধর্ম বিদ্বেষী বা ধর্ম নিয়ে অনুসন্ধানী মানুষও আসেন। অমুসলিম ও নতুন মুসলমানদের জন্য উন্নত সেবা নিশ্চিত করা, যুব সমাজের চাহিদা অনুযায়ী উদ্যোগ গ্রহণ করা, মহিলাদের সেবার মান ও ক্ষেত্র বৃদ্ধিসহ এখানে প্রায় ৩৬টি প্রজেক্ট চালু রয়েছে। পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক নামাজের সুব্যবস্থার পাশাপাশি রয়েছে ইভিনিং মাদ্রাসা, প্রাইমারি স্কুল, সেকেন্ডারি স্কুল, বিজনেস সেন্টার, ফিটনেস জিম, ফিউনারেল সার্ভিস, ফ্রি লিগ্যাল সার্ভিস, ম্যারেজ ব্যুরোসহ বহুবিধ সেবাকর্ম। এই বহুমুখি কর্মযজ্ঞ পরিচালনায় রয়েছেন মেধাবী ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এক বিশাল কর্মী বাহিনী।

প্রতি বছর তারাবিহ নামাজ পরিচালনা করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন হাফিজগণ। মদীনা শরীফ থেকে আসেন ইমাম মুহাম্মদ সাউদ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি থেকে শরীয়াহ শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রীধারী প্রখ্যাত আলেম শায়খ সাউদ নাফি আল আনাজী, মিশর থেকে হাফিজ আহমদ রাজাব ও সোমালী বংশোদ্ভুত হাফিজ ক্বারী জামাল মোহাম্মদ প্রমুখ। রামাদ্বানে প্রতিদিন শত শত মানুষ লন্ডন মুসলিম সেন্টারের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ইফতার করে থাকেন। শেষ ১০ দিনে শতাধিক মানুষের জন্য থাকে ইতেকাফের সুব্যবস্থা।

এলএমসি'র বহুমুখী কর্মতৎপরতা নিয়ে রীতিমত গবেষণা হচ্ছে। শতাধিক বছরের পুরনো আড়াই লক্ষ ডকুমেন্টস সংরক্ষণের মধ্যদিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু হয়েছে মস্ক আর্কাইভ স্ট্রংরুম। গবেষকদের ব্যাপক ভিত্তিক সাধনার কেন্দ্র ভূমিতে পরিণত হয়েছে এই আর্কাইভ।

এমসিবি : স্বাধীনভাবে ইসলামী নীতি ও ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেন (এমসিবি)। এই সংগঠনে ৫শতাধিক প্রাজ্ঞ সদস্য রয়েছেন। কর্ম প্রয়াসের মধ্যে আছে মসজিদ, স্কুল, দাতব্য সংস্থা এবং পেশাদার নেটওয়ার্ক। ব্রিটিশমুসলমানদের পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে সহায়তা করা হয়। সদস্যদের নিয়ে গতিশীল নেতৃত্বের মাধ্যমে সাংগঠনিক লক্ষ্য পূরণ করা হয়। একটি আম্ব্রেলা অর্গানাইজেশন হিসাবে তিনটি ভাগে কর্মসূচী সাজানো হয়েছে। স্থানীয়ভাবে স্থিরীকৃত সুচিন্তিত কাজ, সহযোগীদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সমর্থন, জাতীয়ভাবে প্রতিনিধিত্বশীল ভূমিকা পালন। এছাড়া বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার ইস্যুতে ফোকাস করা ও বৃহত্তর সম্প্রদায়ের জন্য ভূমিকা পালনেও সক্রিয় রয়েছে এমসিবি।

কনভার্ট মুসলিম ফাউন্ডেশন : ইসলামে ধর্মান্তরিতদের দ্বারা পরিচালিত সেবামূলক সংগঠন কনভার্ট মুসলিম ফাউন্ডেশন। যারা ইসলামে আগ্রহী এবং যারা ধর্ম গ্রহণ করেন তাদের সমর্থন করার জন্য গত ৩০ বছর ধরে বিশেষায়িত পরিষেবা প্রদান করছে। এই ফাউন্ডেশন ইসলামের গভীরতর এবং আরও অর্থপূর্ণ সারাংশ অন্বেষণে প্রকৃত এবং আন্তরিক হৃদয়ে কাজ করে। নিজেদের বাড়িতে ও কমিউনিটিতে আধ্যাত্মিক জাগরণ এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং চিন্তাশীল ও কল্যাণকামী জীবনযাপনে অনুপ্রাণিত করে।

দাওয়াতুল ইসলাম ইউকে এন্ড আয়ারল্যান্ড, ইসলামিক ফোরাম অব ইউরোপ, মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন, ইসলামিক শরীয়া কাউন্সিল এবং আরও কিছু সংগঠন ইসলামী সমাজ গঠনে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। সেন্ট্রাল লন্ডনের রিজেন্ট পার্ক মসজিদ, কেমব্রিজের কেন্দ্রীয় মসজিদসহ গ্রেট ব্রিটেনে অনেকগুলো মসজিদ

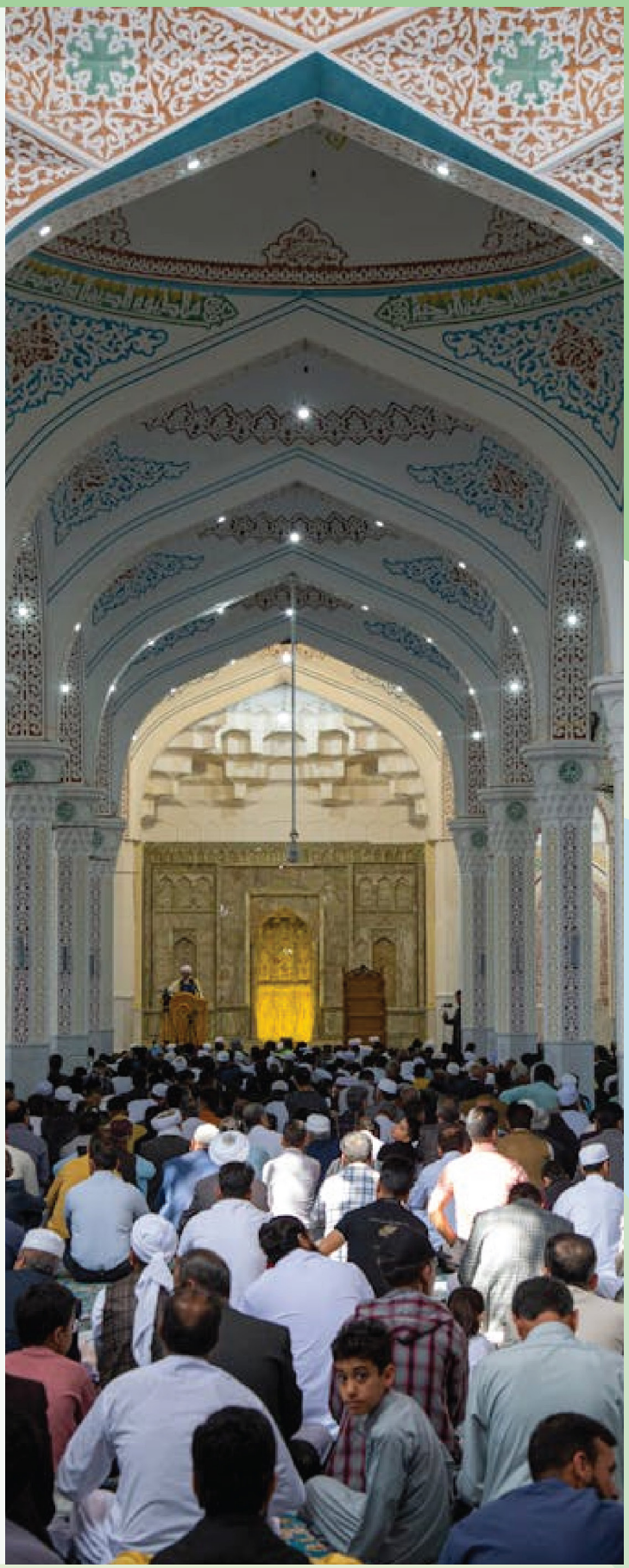

আন্তর্জাতিক মানের সার্ভিস দিয়ে থাকে। যেখানে মুসলিম সম্প্রদায়ের চাহিদা পূরণ, অন্য সম্প্রদায়ের সাথে সংলাপ ও সংহতি রক্ষা এবং মুক্তচিন্তার গবেষকদের জন্য জ্ঞান চর্চা অনুশীলনের ব্যবস্থা করা হয়।

মস্‌চেয়া ডি রোমা : ইতালির রোমে ইসলাম চর্চা ব্যাপক হারে বেড়েছে। মসজিদ ভিত্তিক সোসাইটি দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। মস্ক অফ রোম (মস্‌চেয়া ডি রোমা) ইউরোপের বৃহত্তম মসজিদ। এটির আয়তন ৩০০০ বর্গমিটার (৩২০,০০০ বর্গফুট)। ১২ হাজার মুসল্লী একত্রে নামাজ পড়তে পারেন। ১৯৭৪ সালে নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হয়। ইতালির নগর পরিষদ (ইতালীয় সিটি কাউন্সিল) মসজিদটির জন্য জমি প্রদান করে। আফগানিস্তানের রাজপুত্র মুহাম্মদ হাসান ও তার স্ত্রী রাজিয়া বেগমের উদ্যোগে ও সাউদী আরবের সহায়তায় তৈরি হয়েছে মসজিদটি।

১৯৮৪ সালে মসজিদের আধুনিকায়ন অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন তৎকালীন ইতালীয় প্রধানমন্ত্রী স্যান্ড্রো পার্টিনি। প্রখ্যাত ইতালীয় স্থপতিদের নকশা ও পরিচালনায় অত্যাধুনিক ভাবে সম্পন্ন হয়েছে সকল কাজ। ১৯৯৫ সালের ১ জুলাই মসজিদটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের পর থেকে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের আগ্রহের কেন্দ্রে পরিনত হয়েছে। শুধু মুসলমান নয়, বহু অমুসলিম পণ্ডিত এবং মানবতাবাদী মানুষ জীবন জিজ্ঞাসার জবাব পেতে ছুটে আসেন মস্ক অফ রোমে।

গ্রান্ড মস্ক : ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস শহরে ঐতিহ্যবাহী গ্রান্ড মস্ক এক সময় পর্যটকদের আকর্ষণ ছিল। এখন মানুষ জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার শিক্ষা লাভের জন্য সেখানে যায়। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পরে ফরাসি সাম্রাজ্যের অধীনস্থ উপনিবেশ সমূহের সংগ্রামী মুসলমানদের সম্মানে মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ১৯২৬ সালের ১৫ জুলাই রাষ্ট্রপতি গাস্তোঁ দুমের্গ এটি উদ্বোধন করেন। এরপর থেকে শুরু হয়ে বর্তমানে প্যারিস জুড়ে দুই সহস্রাধিক মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলাম এখন ফান্সে দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম। মুসলমানদের সংখ্যা ৬০ লাখের অধিক। উল্লেখ্য, ১৯০৫ সাল থেকে ফ্রান্সে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তৈরিতে নিষেধাজ্ঞা ছিল। গ্রান্ড মস্ক প্রতিষ্ঠার সময় সে আইন রহিত করা হয়।

ফ্রান্সে রম্য ম্যাগাজিন 'শার্লি এবডো'র ঘটনা এবং ইহুদি সুপার মার্কেটে সন্ত্রাসী হামলার পর মুসলমানদের ধর্মচর্চা অনেকটা বাধাগ্রস্থ হয়েছিল। ইসলামিক স্কলারগণ এখন অন্য ধর্ম ও চিন্তার মানুষকে ফ্রান্সের মসজিদ সমূহে আমন্ত্রণ জানানো শুরু করেছেন। ইসলাম সম্পর্কে যাদের মধ্যে ভূল ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে, তাদেরকে মসজিদে আমন্ত্রণ জানিয়ে সেই ভুল ধারণা ভেঙ্গে দিতে চান। সেখানে তাদের চা এবং কেক দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। ফলে অন্যরা ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা, কর্মশালা এবং বিতর্ক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। এতে অনেক অমুসলিম ইসলামের শীতল ছায়ায় আশ্রয় নিচ্ছেন।

ঈদ ইন দ্য পার্ক : মুসলিম সংস্কৃতির বিশ্বায়ন

দুনিয়া জুড়ে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব ঈদ। এর একটি ঈদ-উল ফিতর, অন্যটি ঈদ-উল আযহা। মুসলমানদের ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বাণী প্রদান করেন ব্রিটেন সহ বিভিন্ন দেশের প্রধানমন্ত্রী বা সরকার প্রধান। উন্মুক্ত ময়দানে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে 'ঈদ ইন দ্য পার্ক' অনুষ্ঠান ইউরোপের সর্বত্র ব্যাপকতা লাভ করেছে। মুসলিম সংস্কৃতির বিশ্বায়নে এটি নতুন মাত্রা পেয়েছে।

২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর লন্ডন ওয়েস্টমিনস্টারের ট্রাফালসার স্কোয়ারে ঈদুল ফিতরের উৎসব ব্রিটেনের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করে। মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেন এবং লন্ডনের মেয়র কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে ২৫ সহস্রাধিক মানুষ অংশ গ্রহণ করেন। দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ইভেন্টের অফিসিয়াল মিডিয়া পার্টনার হল জিটিভি। উৎসবের অংশীদারদের মধ্যে রয়েছে মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেন, ট্রান্সপোর্ট ফর লন্ডন, মুসলিম এইড, ইসলামিক রিলিফ, ইসলাম চ্যানেল এবং ইউনিগন। অনুষ্ঠানে মেয়র কেন লিভিংস্টোন বলেন, ঈদ-উল-ফিতর মুসলিম ক্যালেন্ডারের সবচেয়ে শুভ দিন। এটি একটি মহান আনন্দের দিন এবং সকল ধর্মের লোকদের জন্য শান্তির অনুস্মারক হিসাবে কাজ করে। এটি সহানুভূতি, ঐক্য এবং ভ্রাতৃত্বের পরিচায়ক।

২০০৭ সালে মেয়র কেন লিভিংস্টন জোর দিয়ে বলেছিলেন, ট্রাফালসার স্কোয়ারে ঈদ উদযাপন মুসলিম এবং অমুসলিমদের একত্রিত হওয়ার এবং ইসলামের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি এবং বৈচিত্র্যের অভিজ্ঞতা লাভ করার সুযোগ প্রদান করে। মুসলিম কাউন্সিল অফ ব্রিটেনের সেক্রেটারি জেনারেল ড. মুহাম্মদ আবদুল বারী ঈদ উৎসবে সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, লন্ডনের সাফল্যের গল্পে মুসলিম লন্ডনবাসীরা যথার্থই গর্বিত এবং এটি দীর্ঘস্থায়ী হোক। ২০১৩ সালে লন্ডনের মেয়র বরিস জনসন বলেছিলেন, আমি আশা করি লন্ডনবাসী সমস্ত সম্প্রদায় থেকে ট্রাফালগার স্কোয়ারে আমাদের উৎসবে যোগদানের সুযোগ নেবে। ২০১৪ সালে বরিস জনসন ইভেন্টটিকে রাজধানীর বৈশ্বিক বৈচিত্র্যে একসাথে যোগদান এবং আনন্দ করার একটি সুযোগ হিসাবে বর্ণনা করেন। জি নেটওয়ার্ক ইউরোপের সিইও নীরজ ধিংরা বলেছিলেন, বহু সংস্কৃতির লন্ডন জি নেটওয়ার্ক চ্যানেল জুড়ে আমাদের সমস্ত বিনোদনের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়েছে। লেবারা মোবাইলের ইউকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাস্টিন ককেরিল বলেছেন, আমরা লন্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারে ঈদ উৎসবের সাথে যুক্ত হতে পেরে আনন্দিত।

অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল কোরান তেলাওয়াত, নামাজের জন্য আযান, কবিতা ও সঙ্গীত পরিবেশনা, ঈদ বাজার, এবং সেলিব্রিটি অতিথির উপস্থিতি। প্রধান মঞ্চে ছিল লাইভ সংগীত, নাশিদ, শিশুদের গান ও নাট্য পরিবেশনা, বক্তৃতা, ইন্টারেক্টিভ কর্মশালা এবং ভিডিও শো। ঈদ কমিটি কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনী এলাকায় ছিল লাইভ বিনোদন, ঈদ প্রদর্শনী, ক্যালিগ্রাফি, মসজিদের স্থাপত্য, ইসলামিক শিল্প এবং খাবারের স্টল। শিল্প ও সংস্কৃতির প্রদর্শনীতে ছিল চারুও কারুশিল্প প্রদর্শনী এবং ইসলাম সম্পর্কে প্রদর্শনী, মেহেদি ব্যবহার, ফেস পেইন্টিং, স্যুভেনির বিক্রির স্টল। এছাড়াও একটি গ্লোবাল ফুড ফেস্টিভ্যাল আউটলেট সহ সমগ্র ইসলামী বিশ্বের খাবার পরিবেশন। তুর্কি, মিশরীয়, ইন্দোনেশিয়ান, লেবানিজ, মরক্কো, মালয়েশিয়ান, দক্ষিণ এশিয়ান, আরবি এবং আরও অনেক দেশীয় মজাদার খাবার। সামগ্রীক অনুষ্ঠানে আরবি, ইংরেজি, ফার্সি, উর্দু, বাংলা, স্প্যানিশ সহ বিভিন্ন ভাষায় পারফরমেন্স বহু জাতিগোষ্ঠীর মানুষকে মুগ্ধ করেছে।

ট্রাফালগার স্কোয়ারে ঈদ উৎসবে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্রিটেনের বিভিন্ন এলাকায় বড় বড় পার্কে ঈদের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। প্রতি বছর এসব অনুষ্ঠানে মানুষের অংশ গ্রহণ বাড়ছে। ঈদ ইন দ্য পার্ক উৎসব মুসলিম সংস্কৃতির বিকাশে বিশেষ নিয়মক হিসেবে কাজ করছে। চলছি

বছর ঈদ-উল ফিতর ও ঈদ-উল আযহায় পার্ক সমূহে মানুষেল ঢল নেমে ছিল।

লন্ডন : ইস্ট লন্ডনের মাইল এন্ড স্টেডিয়ামে লন্ডনের বৃহৎ ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ১০ হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলমান নারী-পুরুষ ও শিশু ঈদের জামাতে শরীক হয়েছেন। টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সহযোগিতায় ও ঈদ ইন দ্য পার্ক কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দীর্ঘ ১৪ বছর যাবত ধর্মীয় উৎসব ঈদ ইন দ্য পার্ক আয়োজন করতে পারায় মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা হয়।

রেডব্রিজ সহ লন্ডনের বিভিন্ন পার্কে একই রকম অনুষ্ঠান অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও বড় বড় জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে লন্ডন সেন্ট্রাল মস্ক ট্রাস্ট অ্যান্ড দ্য ইসলামিক কালচারাল সেন্টারে (রিজেন্ট পার্ক মসজিদ), লন্ডন মুসলিম সেন্টার ও ইস্ট লন্ডন মসজিদ, ব্রিকলেন মসজিদ সহ সহস্রাধিক মসজিদে। এছাড়া বার্মিংহাম, ম্যানচেস্টার, নিউক্যাগল, এডিনবরাসহ বিভিন্ন শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে ঈদের জামাত। প্রায় মসজিদে সকাল ৭টা থেকে দুপুর ১১ টা পর্যন্ত প্রতি ঘন্টায় জামায়াত হয়েছে। সর্বত্রই নারী, পুরুষ ও শিশুদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

বার্মিংহ্যাম : ইউরোপের সবচেয়ে বড় ঈদ জামাত বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্রিটেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর বার্মিংহ্যাম স্মলহিথ পার্কে লক্ষাধিক মানুষ একত্রিত হয়ে ঈদের নামাজ আদায় করেছেন।

পর্তুগাল : মার্তিম মুনিজ পার্ক পর্তুগালে ঈদের প্রধান জামাতে হাজার হাজার মুসল্লির ঢল নামে। সাত হাজার মানুষের ধারণ ক্ষমতার এই পার্কটিতে জায়গার সংকুলান না হওয়ায় অনেকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করেন। ঈদ জামাতে আনুষ্ঠানিকতা পর্যবেক্ষণ করার জন্য স্থানীয় মিউনিসিপালটির প্রেসিডেন্ট মিগেল কোয়েলো উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আমিও এই উৎসবে অংশগ্রহণ করতে এসেছি। আমাদের এই অঞ্চলে ঐতিহ্যগতভাবেই বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের মানুষের সমাবেশ ঘটে এবং আমরা সবার সঙ্গে আছি। তাছাড়াও দেশটির পোর্তো, আলগার্ভ, কাশকাইশ, কোইমব্রাসহ বিভিন্ন শহরে যথাযথ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে মুসলমানদের সর্ব বৃহৎ উৎসব পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর।

মাদ্রিদ : স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদের মস্ক অব গ্রানাডায় স্থানীয় সময় সকাল ৯টায় অনুষ্ঠিত হয়েছে ঈদুল ফিতরের জামাত। দেশটির অন্যান্য শহরের মসজিদগুলোতেও ঈদের জামায়াত অনুষ্ঠিত হয়।

প্যারিস : ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের 'গ্র্যান্ড মস্ক ডি প্যারিসে' স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৭টা ও সোয়া ৮টায় দুটি জামাত অনুষ্ঠিত হয়।

রোম : ইতালির রাজধানী রোমের 'গ্র্যান্ড মস্ক ডি রোমা'তে স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৮টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত তিনটি জামাত অনুষ্ঠিত হয়। দেশটির অন্যান্য শহরের মসজিদগুলোতেও আদায় করা হয়েছে ঈদুল ফিতরের নামাজ।

সিডনি : অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে সাধারণ কর্মদিবস থাকায় খুব সকাল থেকেই ঈদের জামাত শুরু হয়। লাকেম্বা মাসালা, টপরাইড মসজিদ, হর্নসবি মসজিদ ও আল বায়ান রিজেন্টস পার্ক, চুল্লোরা পাবলিক স্কুল হল, কোগরাহ ও রকডেল মসজিদে জামাত অনুষ্ঠিত। এ ছাড়া সারিহিলস মসজিদ, ব্ল্যাকটাউন ঈদগাহ মাঠ, লাকেম্বার প্যারিপার্ক কমপ্লেক্স, সেফটন মসজিদ, ম্যারিকভিল টাউন হল সেন্টার, অলিম্পিক পার্ক গ্রাউন্ড, রুটিহিল মসজিদসহ আরও কিছু জায়গায় অনুষ্ঠিত হয় ঈদের জামাত।

সিডনির লাকেম্বার বেশ কটি ঈদের জামাতে মুসল্লিদের সঙ্গে দেখা করেন দেশটির বিরোধী দল লেবার পার্টির নেতা টনি বার্ক। তিনি এ সময় মুসলামনদের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। অস্ট্রেলিয়ার মুসলমানদের ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বাণী দিয়েছেন দেশটির বর্তমান প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন। জার্মানি, গ্রিস, পর্তুগাল, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়াসহ ইউরোপের সব দেশে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যের মেলবন্ধন মুসলিম সংস্কৃতির বিশ্বায়নে অবদান রাখছে।

চিন্তাধারার পরিবর্তন

ইউরোপে ইসলাম : একটি পরিবর্তনশীল বিশ্বাস (ISLAM IN EUROPE: A CHANGING FAITH) শিরোনামে ২০০১ সালের ২৪ ডিসেম্বর ইউএসএ টাইম বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়, মুসলমানরা কখনই অমুসলিম ভূমিতে তাদের ধর্ম সঠিকভাবে পালন করতে সক্ষম হবে না, তাই সেখানে বসতি স্থাপন করা উচিত নয় বলে ধারণা ছিল। কিন্তু ইউরোপের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের মুসলমানরা দ্রুত আবিষ্কার করেন যে, এটি একটি ভুয়া ধারণা। বরং মুসলমানরা সেখানে তাদের বিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি করতে পারেন এবং তাদের ধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী জীবনযাপন করতে সক্ষম।

ইসলামিক স্কলার তারিক রামাদান এই নতুন চিন্তাধারার অন্যতম প্রধান প্রবক্তা। তারিক রামাদান ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসের টাইম ম্যাগাজিনের জরীপ অনুযায়ী একুশ শতকে পৃথিবীর সেরা ১০০ জন বিজ্ঞানী এবং চিন্তাবিদদের মধ্যে অন্যতম। তিনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি অব অরিয়েন্টাল স্টাডিসে কন্টেমপরারি ইসলামিক স্টাডিস বিভাগের অধ্যাপক। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপনা করেন। ইউরোপের আইনের শাসন, বিবেকের স্বাধীনতা এবং উপাসনার স্বাধীনতার প্রশংসা করে তারিক রামাদান বলেন, এই নতুন পরিবেশে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে তাওহীদী বিশ্বাসের বার্তা সর্বত্র পৌছে দেওয়া। ইতোমধ্যে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ছে ইসলাম। সময়ের ব্যবধানে এখানকার ঘরে ঘরে জ্বলবে ইসলামের আলো।

লেখক : সম্পাদক, সময় ও কবি–কথাসাহিত্যিক।

মধ্যম ও মধ্যমপন্থা

ড. মুহাম্মাদ মুজাম্মিল এইচ. সিদ্দিকী

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, "এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্যে এবং যাতে রাসুল সাক্ষ্যদাতা হোন তোমাদের জন্য।" (সুরা আল বাকারাহ : ১৪৩)

"বলুন, হে আহলে কিতাবগণ, তোমরা নিজেদের ধর্ম নিয়ে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না এবং ঐ সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যারা পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে।" (সুরা আল মায়েদাহ : ৭৭)

মুসলিমদেরকে বলা হয় উম্মাতান ওয়াসাতান। কুরআনের তাফসীরকারকগণ 'ওয়াসাত' শব্দের অর্থ করেছেন, ন্যায্যভাবে ভারসাম্যকারী, সর্বোত্তম প্রভৃতি। (দেখুন : আল তাবারি, আল কুরতুবি, ইবনে কাসীর প্রভৃতি) ইউসুফ আলী বলেছেন, "ইসলামের সারকথা ই হলো, উভয়পক্ষের বাড়াবাড়ি পরিহার করা। ইসলাম বরাবরই একটি মার্জিত ও ব্যবহারিক জীবনব্যবস্থা।" (সুরা বাকারার ১৪৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দেখুন)।

আল্লাহ তায়ালা এ উম্মতকে একটি মধ্যমপন্থী উম্মত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। মুসলিমদেরকে সবসময় মধ্যমপন্থা অনুসরণ করতে হবে। এমন একটি পথ যাতে কোনো চরমপন্থা ও বাড়াবাড়ি নেই। ইসলাম এমন একটি পথ যা সামঞ্জস্যপূর্ণ ভারসাম্য নিশ্চিত করে। বিশেষ করে ওহি এবং যুক্তির মাঝে, ব্যক্তি এবং সমাজের মাঝে, দ্বীন ও দুনিয়ার মাঝে এবং ইহকাল ও পরকালের মাঝে– ইসলাম আমাদেরকে ভারসাম্য, নমনীয়তা এবং মার্জিক আচরণ বজায় রাখার শিক্ষা দেয়। কর্কশতা এবং কঠোরতার কোনো স্থান ইসলামে নেই। আল কুরআন মুমিন বান্দাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রেও কর্কশ ও কঠোর মনোভাব (ঘিলযাহ) এড়িয়ে যাওয়ার তাগিদ দিয়েছেন। (দেখুন সুরা তাওবাহ : ৭৩ এবং সুরা আল তাহরিম : ৯ নং আয়াত)

একইসঙ্গে কুরআন মুমিনদেরকে নির্দেশনা দিয়েছে যাতে অপরাধীর প্রতি দরদী বা সহানুভূতিশীল হয়ে তার জন্য প্রযোজ্য আল্লাহর হুদুদ বা নির্দেশিত শাস্তি অগ্রাহ্য না করা হয়। (সুরা নুর : ২) এটুকু ছাড়া অন্যসব ক্ষেত্রেই কুরআন ভদ্রতা, নমনীয়তা ও মার্জিত আচরণ করার আদেশ দেয়।

আকিদা, ইবাদত, শরীয়াহ, নৈতিকতা ও আচারাদি (আখলাক) সহ সকল বিষয়েই ইসলাম মধ্যমপন্থা অবলম্বনের কথা বলে। এবার আসুন, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে শরীয়াত ও আখলাক সংক্রান্ত ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করি–

১.আইন (শরীয়াত) : ইসলামের সকল আইন সার্বজনীন ও সার্বিক। ইসলাম মানবিক মর্যাদা, সমতা ও সম্মান নিশ্চিত করে। ইসলামের মৌলিক নীতিমালা অপরিবর্তনীয়। তবে, জনগণের অবস্থা এবং প্রয়োজনের আলোকে এগুলোর প্রয়োগে শিথিল হওয়ার সুযোগ আছে। ইসলামী আইন বা শরীয়াতের মূল দর্শনগুলো হলো :

ক. সামর্থ্যের বাইরে কোনো দায় দায়িত্ব নয়।

খ. সকল ভালো বিষয়ই অনুমোদন করা হয়েছে আর সকল বাজে বিষয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

গ. দায়িত্ব ও কর্তব্যের মূল উদ্দেশ্য হলো সম্মান ও বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করা, কাউকে হেয় করা কিংবা কারো উপর বোঝা চাপিয়ে দেওয়া নয়।

ঘ. তীব্র প্রয়োজনকে স্বীকৃতি দেওয়া।

২.নৈতিকতা ও আচারাদি (চরিত্র) : ইসলাম নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে খুবই গুরুত্ব দেয়। ইসলাম জানায়, যে মানুষটির চরিত্র নেই, তার দ্বীনও নেই। নৈতিকতা ও মূল্যবোধের বিষয়ে ইসলামের মৌলিক শিক্ষাগুলো হলো–

মুসলিমদেরকে সবসময় মধ্যমপন্থা অনুসরণ করতে হবে। এমন একটি পথ যাতে কোনো চরমপন্থা ও বাড়াবাড়ি নেই। ইসলাম এমন একটি পথ যা সামঞ্জস্যপূর্ণ ভারসাম্য নিশ্চিত করে। বিশেষ করে ওহি এবং যুক্তির মাঝে, ব্যক্তি এবং সমাজের মাঝে, দ্বীন ও দুনিয়ার মাঝে এবং ইহকাল ও পরকালের মাঝে– ইসলাম আমাদেরকে ভারসাম্য, নমনীয়তা এবং মার্জিক আচরণ বজায় রাখার শিক্ষা দেয়।

ক. সার্বজনীন মূল্যবোধ : বিশেষ কোনো সংস্কৃতি, গোত্র বা দেশকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয় না।

খ. ইতিবাচকতা : ইসলাম আপনাকে শিক্ষা দেয় যে, জীবনের যা কিছু ইতিবাচক সবটাই আপনি উপভোগ করতে পারবেন।

গ. ইসলাম বৈশিষ্ট্যগতভাবে তাপস্যবাদ, সন্ন্যাসবাদ বা রোগাক্রান্ত কোনো দর্শন নয়। বরং ইসলাম মানুষকে সুখী, খুশি, স্বাস্থ্যবান, আস্থাবান এবং দূরদর্শী হিসেবে দেখতে চায়।

ঘ. বাস্তবসম্মত : ইসলাম মানুষের প্রয়োজন, চাহিদা, আবেগ-অনুভূতি, প্রত্যাশাকে বিবেচনায় নেয় এবং বিকশিত হওয়ার জন্য যেকোনো ব্যক্তিকে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করে।

ঙ. সমতা : ইসলামে কোনো দ্বৈত অবস্থান নেই। ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের জন্য একটি নিয়ম আবার সাধারণদের জন্য ভিন্ন নিয়ম– এমন বৈশিষ্ট্য ইসলামে নেই।

উপসংহার

এমন অনেক মুসলিম আছে যারা ভালোভাবে ইসলাম সম্পর্কে জানেন না এবং এমনও অনেকেই আছেন যারা সঠিকভাবে ইসলাম অনুশীলনও করেন না। আমাদের জন্য ইসলাম জানা এবং সঠিকভাবে ইসলাম শেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম কর্কশ বা কঠোর নয়, আবার খুব কঠিনও নয়। ইসলামে এমন কোনো বিধান নেই যা অবাস্তব ও অসম্ভব।

রাসুল (সা.) বলেছেন, "নিশ্চয়ই দ্বীন সহজ। দ্বীন নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করে দ্বীন তার উপর জয়ী হয়। কাজেই তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং (মধ্যপন্থার) নিকটে থাক, আশান্বিত থাক এবং সকাল-সন্ধ্যায় ও রাতের কিছু অংশে ইবাদাত সহযোগে সাহায্য চাও। (বুখারি : ৩৯)

ইসলামকে যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য আপনাকে অবশ্যই চেষ্টা চালাতে হবে, একনিষ্ঠ হতে হবে। ঈমান সম্পর্কে জানুন এবং ঈমানের চাষাবাদে মনোযোগ দিন। দ্বীনকে খুব সাদামাটাভাবে বিবেচনা করবেন না। ইসলাম কেবলমাত্র একটি সামাজিক বা সাংস্কৃতিক বিষয় নয়। বরং ইসলাম হলো আল্লাহ নির্ধারিত জীবনবিধান এবং ইসলামই হলো সবচেয়ে মধ্যমপন্থী, ভারসাম্যপূর্ণ, সুন্দর, ত্রুটিমুক্ত এবং বাস্তবসম্মত ধর্ম।

তথ্যসূত্র:
https://fiqh.islamonline.net/en/islam-the-middle-and-the-moderate-path/

লেখক: সাবেক সভাপতি, ইসলামিক সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকা।

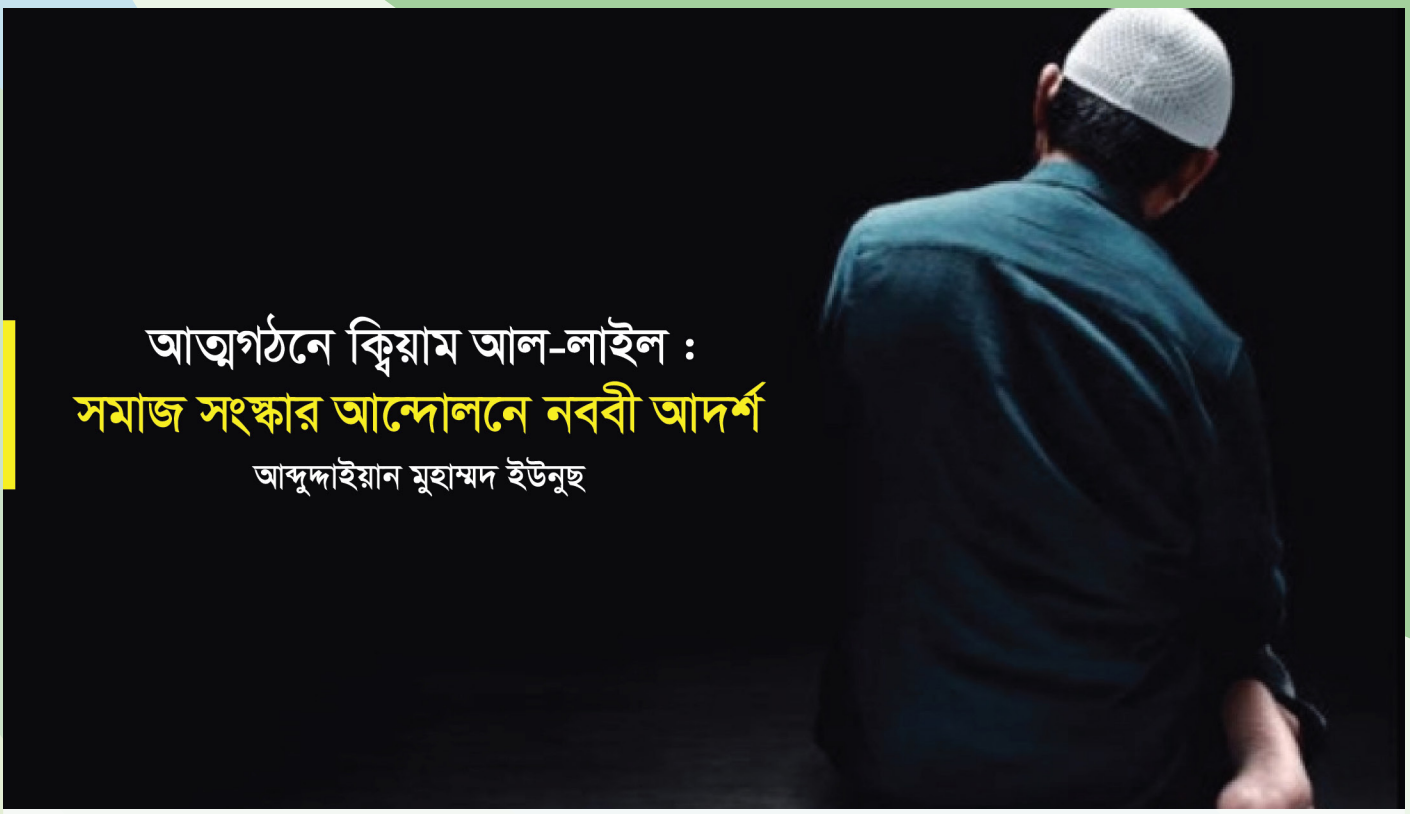

আত্মগঠনে ক্বিয়াম আল-লাইল : সমাজ সংস্কার আন্দোলনে নববী আদর্শ

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

যারা সমাজ সংস্কার নিয়ে কাজ করবেন তাদের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মূলত আদর্শের আলোকে ব্যক্তিগত জীবন গঠন করা। আর ব্যক্তিগত প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সঠিক আকিদা-বিশ্বাস। তাই আল্লাহ তায়ালা সুরা ইখলাসে সঠিক আকিদার তালিম দিয়েছেন। এর পাশাপাশি আখলাকিয়াত তথা চরিত্র গঠন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর উত্তম চরিত্র গঠনের নির্দেশনা সুরা মুমিনুন-এর শুরুতে, সুরা ফুরক্বানের শেষ দিকেসহ কুরআনের আরও অসংখ্য আয়াতে বর্ণিত রয়েছে। সুরা আল-মুযযাম্মিল ও সুরা আল-মুদ্দাসসির এর শুরুতে আল্লাহর রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি নাজিলকৃত কতিপয় আয়াতে আত্মগঠনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা রয়েছে।

আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য কিয়ামুল লাইল

আল্লাহ রাসুল (সা.)-কে দাওয়াতী কাজের উপযোগী হিসেবে গড়ে তুলতে ক্বিয়ামুল্লাইল তথা রাত্রি জাগরণের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (٤) إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا (٥) إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا

‘১. হে বস্ত্রাবৃত! ২. রাতের কিছু অংশ বাদ দিয়ে দণ্ডায়মান হোন। ৩. অর্ধরাত্রি অথবা তার কিছু কম অথবা তার চেয়ে বেশি। ৪. কুরআন তিলাওয়াত করুন সুবিন্যস্তভাবে ও সুষ্ঠুভাবে। ৫. আমি আপনার উপর অবতীর্ণ করেছি গুরুত্বপূর্ণ বাণী।’

মারাকী আল ফালাহ গ্রন্থে উল্লেখ আছে–কিয়াম আল লাইল অর্থ হচ্ছে, রাতের অধিকাংশ সময় আল্লাহর ইবাদতে ব্যয় করা; অথবা রাতের অল্প সময় অর্থাৎ একঘণ্টা কুরআন তিলাওয়াত, হাদিস পাঠ, আল্লাহর জিকির ও রাসুল (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠে ব্যয় করা। আল মাওসুয়াহ আল ফিকহিয়্যা আল কুওয়াতিয়্যায় বলা হয়েছে–‘তাহাজ্জুদ হচ্ছে রাতে ঘুমানোর পর পুনরায় উঠে নামাজ আদায় করা।’ আল হাজ্জাজ ইবনে আমর আল আনসারি বলেন–‘কেউ কেউ মনে করেন তাহাজ্জুদ হচ্ছে ঘুম থেকে উঠে ফজর পর্যন্ত নামাজ আদায় করার নাম; বরং তাহাজ্জুদ হচ্ছে ঘুমানোর পর নামাজ আদায় করে আবার ঘুমানোর পর নামাজ আদায় করা।’ কিয়াম আল লাইল হচ্ছে ঘুমানোর আগে বা পরের রাতের সকল ইবাদত। আর তাহাজ্জুদ হচ্ছে রাতের নামাজ। তাফসিরে তাবারিতে বলা হয়েছে–কারও কারও মতে এটা শুধু ঘুমানোর পর উঠে নামাজ আদায় করাকেই বোঝায়। কারণ, তাজাজ্জুদ শব্দটি হুযুদ থেকে নির্গত। আর হুযুদ হচ্ছে ঘুমিয়ে ওঠা। এই কারণেই মূলত বলা হয় তাহাযযাদা রাজুলু–লোকটি জাগ্রত রয়েছে। আর যিনি তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করেন তাঁকে বলা হয় মুতাহাযযিদ। অনেক ইসলামি চিন্তাবিদ মনে করেন–রাতের যে কোনো সময়ের নামাজই হচ্ছে তাহাজ্জুদ। কারণ, এর ফলে না ঘুমিয়ে জাগ্রত থাকতে হয়।

সুরা দাহরের ২৬ নম্বর আয়াতে একই ধরনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, ‘রাতেরবেলা আল্লাহর সামনে সিজদায় পড়ে থাকো এবং রাতের বেশির ভাগ সময় তাঁর তাসবিহ ও প্রশংসায় অতিবাহিত করো।’ রাসুল (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তায়ালা সুরা মুদ্দাসসিরের শুরুতে বলেন–

“হে বস্ত্র মুড়ি দিয়ে শয়নকারী! ওঠো এবং সাবধান করে দাও। তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। তোমার পোশাক পবিত্র রাখো এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো। বেশি লাভ করার জন্য ইহসান করো না এবং তোমার রবের জন্য ধৈর্য অবলম্বন করো।

সুরা মুযযাম্মিলে উল্লিখিত আল্লাহর বাণী–‘হে বস্ত্র মুড়ি দিয়ে শয়নকারী। রাতের বেলা নামাজে রত থাকো। তবে কিছু সময় ছাড়া অর্ধেক রাত কিংবা তার চেয়ে কিছু কম করো। অথবা তার ওপর কিছু বাড়িয়ে দাও’

থেকে বোঝা যায় সারারাত নামাজে দাঁড়িয়ে কাটাতে বলা হয়নি; বরং বিশ্রাম করে রাতের একটা ক্ষুদ্র অংশ ইবাদত বন্দেগিতে ব্যয় করতে বলা হয়েছে। আয়াতের বাচনভঙ্গি থেকে বোঝা যায়, রাসুল (সা.)-কে অর্ধেক রাত বা তার চেয়ে কম বেশি ইবাদত করে কাটাতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

মানুষ যখন রাতের বেলা ঘুমিয়ে থাকে তখন ঘুম থেকে উঠে কিয়ামুল লাইল অভ্যাসে পরিণত করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 'যারা রাত্রিযাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান হয়ে এবং যারা বলে–হে আমার পালনকর্তা! আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। নিশ্চয়ই এর শাস্তি অবিচ্ছিন্ন। বসবাস ও অবস্থানস্থল হিসেবে তা কতই-না নিকৃষ্ট।

মুফতি শফী (রহ.) তাফসিরে মাআরিফুল কুরআনে উল্লেখ করেন–'এই আয়াতে ইবাদতে রাত্রি যাপনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এ সময়টি নিদ্রা ও আরামের। এতে নামাজ ও ইবাদতের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া যেমন বিশেষ কষ্টকর, তেমনি এতে লোক দেখানো ও নাম-যশের আশংকাও নেই। উদ্দেশ্য এই যে তারা দিবারাত্রি আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকে। দিবাভাগে শিক্ষাদান, দ্বীনের প্রচার, জেহাদ ইত্যাদি কাজ থাকে এবং রাত্রিকালে আল্লাহর সামনে ইবাদত করে।'

তাহাজ্জুদের অসংখ্য ফজিলত হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিজি আবু উমামা থেকে বর্ণনা করেন– রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়। কেননা, এটা তোমাদের পূর্ববর্তী সব নেক বান্দার অভ্যাস ছিল। এটা তোমাদেরকে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য দানকারী। মন্দ কাজের কাফফারা এবং গুনাহ থেকে নিবৃতকারী।'

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন–'যে ব্যক্তি এশার পর দুই অথবা ততোধিক রাকাত পড়ে নেয় সেও তাহাজ্জুদের ফজিলতের অধিকারী।' আবার উসমান (রা.) বলেন–'রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এশার নামাজ জামায়াতের সাথে আদায় করে সে যেন অর্ধরাত এবাদতে অতিবাহিত করল এবং যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামায়াতের সাথে আদায় করল তাকে অবশিষ্ট অর্ধের রাত্রি এবাদতে অতিবাহিতকারী মর্যাদা দেওয়া হবে।'

আল্লাহর প্রিয় বান্দারা সব সময় আখেরাতের চিন্তায় বিভোর থাকেন। তাই রাতের বেলা যখন তারা ঘুম থেকে জাগ্রত হন তখন আল্লাহর কাছে আখেরাতে নাজাতের জন্য ফরিয়াদ করেন। আনাস বিন মালেক (রা.) বলেন–'সাহাবিদের অনেকেই মাগরিবের নামাজের পর এশা পর্যন্ত নামাজেরত থাকতেন। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তাদের পিঠ বিছানা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের রবকে ভয় ও আশা নিয়ে ডাকে এবং আমি যা কিছু রিজিক হিসেবে তাদের দিয়েছি, তা থেকে খরচ করে।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় বান্দাদের প্রসঙ্গে কুরআনে উল্লেখ করেন, রাতের সামান্য অংশই তারা নিদ্রাভিভূত এবং শেষ প্রহরে ক্ষমাপ্রার্থনা করত। আল্লাহ তায়ালা সুরা আল ইমরান এর ১৭ নম্বর আয়াতে মুমিনদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন, 'তারা ধৈর্যধারণকারী, সত্যবাদী, নির্দেশ সম্পাদনকারী, সতপথে ব্যয়কারী এবং শেষ রাতে ক্ষমাপ্রার্থনাকারী।'

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন–'কেয়ামতের দিন ইনসাফের দাড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। দাতাগণ আগমন করলে তাদের দান-সদকা ওজন করে সে অনুযায়ী পূর্ণ সওয়াব দেওয়া হবে। একইভাবে নামাজ, হজ, জাকাত ইত্যাদি ইবাদত মেপে তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে। অতঃপর বালা-মুসিবতের সময় সবরকারীরা আগমন করলে তাদের জন্য কোনো ওজন ও মাপ হবে না; বরং তাদের অগণিত সওয়াব দান করা হবে। ফলে যাদের পার্থিব জীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দে অতিবাহিত হয়েছে, তারা বাসনা প্রকাশ করবে–হায়! দুনিয়াতে আমার দেহ কাঁচির সাহায্যে কর্তিত হলে আজ আমরাও সবরের এমনি প্রতিদান পেতাম।

সুরা যুমারের ৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন–'যে ব্যক্তি রাতের প্রহরে সিজদাবনত হয়ে এবং দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখেরাতকে ভয় করে এবং তার রবের রহমত প্রত্যাশা করে (সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না) বল, 'যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?' বিবেকবান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।'এই আয়াতে উল্লিখিত قَانِتٌ শব্দটির কয়েকটি অর্থ রয়েছে। ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, 'এর অর্থ আনুগত্যশীল। শব্দটি যখন বিশেষভাবে নামাজের ক্ষেত্রে বলা হয়, তখন এর অর্থ হবে সে ব্যক্তি যে নামাজে দৃষ্টি নত রাখে এবং এদিক-সেদিক দেখে না। নিজের কোনো অঙ্গ বা কাপড় দিয়ে খেলা করে না। দুনিয়ার কোনো বিষয় ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজে স্মরণ করে না। ভুল ও অনিচ্ছাকৃত কল্পনা এর পরিপন্থী নয়।'

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি হাশরের ময়দানে সহজ হিসাব কামনা করে তার উচিত হবে আল্লাহ যেন তাকে রাতের অন্ধকারে সিজদারত ও দাঁড়ানো অবস্থায় পান। তার মধ্যে পরকালের চিন্তা ও রহমতের প্রত্যাশা থাকা দরকার। আল্লাহ তায়ালা বলেন–'সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামাজ কায়েম এবং ফজরের কুরআন পাঠ করুন। নিশ্চয়ই ফজরের কুরআন পাঠ হয় সাক্ষীস্বরূপ। রাতের কিছু অংশ কুরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকুন। এটা আপনার জন্য অতিরিক্ত। এর জন্য হয়তো আপনার রব আপনাকে মাকামে মাহমুদে পৌঁছাবেন। আর বলুন, হে পালনকর্তা! আমাকে দাখিল করুন সত্যরূপে এবং আমাকে বের করুন সত্যরূপে এবং আর আপনার নিকট হতে দান করুন একজন সাহায্যকারী।

তাফসিরবিদদের মতে প্রথম আয়াতের প্রথমার্ধে যোহর, আছর, মাগরিব ও এশা এই চার ওয়াক্তের নামাজের কথা বলা হয়েছে। যোহরের প্রথম ওয়াক্ত শুরু হয় সূর্য ঢলে যাওয়ার পর আর এশার প্রথম ওয়াক্ত শুরু হয় অন্ধকার পূর্ণ হয়ে গেলে। আর আয়াতের শেষাংশ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ বলে ফজরের নামাজ বোঝানো হয়েছে। কেননা, নামাজে কুরআন তিলাওয়াত করা হয়। ফজরের কথা আলাদাভাবে বলার মাধ্যমে এই নামাজের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। কেননা, সহিহ হাদিস সমূহের বর্ণনা অনুযায়ী এই সময় দিবা-রাতের উভয় ফেরেশতা নামাজে উপস্থিত হয়। আয়াতে উল্লিখিত তাহাজ্জুদ শব্দটি নিদ্রা যাওয়া ও জাগ্রত হওয়া এই পরস্পর বিপরীত দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই আয়াতে কুরআনসহ জাগ্রত থাকার অর্থ হচ্ছে নামাজ পড়া। এই কারণে রাত্রিকালীন নামাজকে তাহাজ্জুদের নামাজ বলা হয়। সাধারণত কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর পরবর্তী সময়ে উঠে যে নামাজ পড়া হয়, তাকে তাহাজ্জুদের নামাজ বলা হয়। কিন্তু তাফসিরে মাজহারিতে রয়েছে, 'রাতের কিছু অংশ নামাজ পড়ার জন্য নিদ্রা ত্যাগ করো।'

কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর জাগ্রত হয়ে নামাজ পড়লে যেমন এই অর্থ ঠিক থাকে, তেমনিভাবে প্রথমেই নামাজের জন্য নিদ্রাকে পিছিয়ে নিলেও এই অর্থের ব্যতিক্রম হয় না। তাই তাহাজ্জুদের জন্য প্রথম নিদ্রা যাওয়ার শর্ত

কুরআনের অভিপ্রেত অর্থ নয়। কোনো কোনো হাদিস দ্বারা তাহাজ্জুদের এই সাধারণ অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। ইবনে কাসীর হাসান বসরী থেকে তাহাজ্জুদের যে সংজ্ঞা উদ্ধৃত করেছেন, তাও এই ব্যপক অর্থের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ইবনে কাসীর (রহ.) লেখেন–'হাসান বসরী বলেন, এশার পর পড়া হয় এমন প্রত্যেক নামাজকে তাহাজজুদ বলা যায়। তবে প্রচলিত পদ্ধতির কারণে এশার পর কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর পড়ার অর্থে বোঝা দরকার। কেননা, রাসুলে কারিম (সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম শেষ রাতে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ আদায় করতেন।'

ঘরে আসতেন। এরপর চার রাকাত নামাজ আদায় করতেন। অতঃপর ঘুমিয়ে পড়তেন। এরপর মধ্যরাতের কিছুক্ষণ আগে বা পরে ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন। জাগ্রত হওয়ার পর হাত দ্বারা মুখ মুছে নিতেন এবং সুরা আলে ইমরানের শেষ ১০ আয়াত তিলাওয়াত করতেন। তারপর মেসওয়াক ও অজু করে দু'রাকাত করে করে আট রাকাত নামাজ পড়তেন। এরপর বিতরের নামাজ আদায় করে আবার ঘুমিয়ে পড়তেন। ফজরের নামাজের আজান দেওয়া হলে দুই রাকাত নামাজ আদায় করে মসজিদে যেতেন এবং ফজরের নামাজ আদায় করতেন।

আল্লাহর প্রিয় বান্দারা সব সময় আখেরাতের চিন্তায় বিভোর থাকেন। তাই রাতের বেলা যখন তারা ঘুম থেকে জাগ্রত হন তখন আল্লাহর কাছে আখেরাতে নাজাতের জন্য ফরিয়াদ করেন। আনাস বিন মালেক (রা.) বলেন–'সাহাবিদের অনেকেই মাগরিবের নামাজের পর এশা পর্যন্ত নামাজেরত থাকতেন।

ইসলামের প্রথম যুগে যখন সুরা মুযাম্মিল অবতীর্ণ হয়, তখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ ছিল না। কিন্তু তাহাজ্জুদ নামাজ ফরজ ছিল সবার ওপর। যখন মেরাজের রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হয়, তখন সর্বসম্মত মত অনুযায়ী সাধারণ উম্মতের ওপর থেকে ফরজ রহিত হয়ে যায়। তাছাড়া রাসূলে কারিম (সা.)-এর ওপর রহিত হয়েছে কি না, এই ব্যাপারে কিছু মতভেদ রয়েছে। অনেকের মতে তাহাজ্জুদের নামাজ রাসুল (সা.)-এর ওপর অতিরিক্ত ফরজ ছিল। তবে তাফসিরে কুরতুবিতে উল্লেখ আছে–এই মতটি বিশুদ্ধ নয়, কেননা ফরজকে নফল শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কোনো কারণ নেই।

সুতরাং এই আয়াতের সারমর্ম এই যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং উম্মতের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ছাড়া আর কোনো নামাজ ফরজ ছিল না। তাফসিরে মাজহারিতে বলা হয়েছে–তাহাজ্জুদের ফরজ যখন উম্মতের ওপর থেকে রহিত হয়ে যায়, তখন নবি করিম (সা.)-এর ওপর থেকেও রহিত করা হয়। এমতাবস্থায় নাফেলাতান লাক বলার তাৎপর্য হলো–সমস্ত উম্মতের নফল ইবাদত তাদের গুনাহের কাফফারা এবং ফরজ নামাজ সমূহের ত্রুটি পূরণের উপকারে লাগে। আর রাসুল (সা.) তো গুনাহ এবং ফরজ নামাজের ত্রুটি থেকে মুক্ত। কাজেই তাঁর পক্ষে নফল ইবাদত সম্পূর্ণ অতিরিক্ত বৈ কিছুই নয়। তাঁর নফল ইবাদত কোনো ত্রুটি পূরণের জন্য নয়; বরং তা কেবল আল্লাহর অধিক নৈকট্য লাভের উপায়।

আলোচ্য আয়াতে নবিজিকে মাকামে মাহমুদ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। মাকামে মাহমুদ হচ্ছে শাফায়াতে কুবরার মাকাম। হাশরের ময়দানে যখন সমস্ত মানবজাতি একত্রিত হবে এবং প্রত্যেকেই তার পয়গম্বর সমীপে শাফায়াতের দরখাস্ত করবে তখন সব পয়গম্বরই ওযর পেশ করবেন। একমাত্র রাসুল (সা.) এই মহাসম্মান লাভ করবেন এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য শাফায়াতের দুআ করবেন।

তাফাকুর ও তাদাব্বুর করা

ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন–'রাসুল (সা.) এশার নামাজ পড়ে তাঁর

তিনি কখনও অজু করতেন আবার কখনও অজু করতেন না। কেননা, তাঁর চোখ ঘুমালেও তাঁর অন্তর জাগ্রত ছিল। এই কারণে তিনি উপলবদ্ধি করতে পারতেন, অজু ভঙ্গ হওয়ার মতো কোনো কিছু ঘটেনি। আবার কখনও তিনি গোসল করতেন। এই প্রসঙ্গে একটি হাদিস উল্লেখ করছি, আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত,

عن ابي هريرة رضي الله تعالي عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم بينما رجل مستلق علي فراشه اذ رفع راسه فنظر الي النجوم و الي السماء فقال اشهد ان لك ربا وخالقا- اللهم اغفر لي فنظر الله اليه فغفرله- قرطبي

রাসুল (সা.) বলেছেন–জনৈক ব্যক্তি চিৎ হয়ে শুয়েছিল। হঠাৎ সে তার মাথা উঠিয়ে আকাশে নক্ষত্র দেখতে পেল এবং বলল–আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় তোমার একজন রব ও সৃষ্টিকর্তা রয়েছে। হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ তায়ালা সে ব্যক্তির দিকে তাকালেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

এই প্রসঙ্গে আলি (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আরেকটি হাদিস প্রণিধানযোগ্য–

عن علي ان النبي صلي الله عليه وسلم كان اذا قام من اليل يتسوك ثم ينظر الي السماء زيقول: ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل وانهار لايت لاولي الالباب

রাসুল (সা.) প্রতি রাতে যখন তাহাজ্জুদ নামাজের জন্য উঠতেন, তখন মেসওয়াক করতেন এবং আসমানের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতেন। অতঃপর সুরা আলে ইমরানের এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) একবার আয়িশা (রা)-কে বলেন–রাসুল (সা.)-এর খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা আপনি দেখেছেন, তা আমাকে বর্ণনা করুন। উত্তরে আয়িশা (রা.) বলেন–আল্লাহর রাসূলের সবকিছুই গুরুত্বপূর্ণ। এর পর তিনি এক রাতের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা.) বললেন, রাসুল (সা.) একরাতে আমার বিছানায় এসে শোয়ার পর বলেন–"হে আয়িশা! তুমি কি আজ রাত আল্লাহর ইবাদতে

সময় কাটানোর জন্য আমাকে অনুমতি দিবে?" তখন আমি বললাম–"হে আল্লাহর রাসুল! আমি আপনাকে ভালোবাসি এবং আপনি যা ইচ্ছা সম্পন্ন করুন এবং এর পক্ষে সহযোগিতা করতেও আমি ভালোবাসি। এরপর নবিজি অজু করলেন। দাঁড়িয়ে পড়লেন নামাজে। অতঃপর কুরআন তিলাওয়াত শুরু করলেন। এরপর আসমানের দিকে হাত উত্তোলন করে কান্না শুরু করলেন। আয়িশা (রা.) আরও বললেন–'আমি দেখেছি কান্নার তীব্রতায় জমিন ভিজে গেছে। ভোরের ফুটফুটে আলোয় বেলাল ফজরের আযান দেওয়ার জন্য এসে দেখলেন আল্লাহর রাসুল কাঁদছেন। তখন বেলাল বললেন, হে আল্লাহর রাসুল আপনি কাঁদছেন অথচ আল্লাহ ঘোষণা করেছেন আপনার কোনো পাপ নেই। সবকিছুই মাফ করে দিয়েছেন। আপনি নিষ্পাপ। তার এ কথা শুনে নবিজি বললেন–'হে বেলাল! আমি কি আল্লাহর শোকর গুযার বান্দা হব না? তিনি আরও বললেন–আমি কেন কান্না করব না, আল্লাহ তায়ালা আজ রাতে–

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَءَايَٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ

এই আয়াত নাজিল করেছেন। অতঃপর নবিজি আরও বললেন–'সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যে এই আয়াত তিলাওয়াত করল অথচ এর ওপর চিন্তা ভাবনা করল না।'

মুফতি শফী (রহ.) এই আয়াতের তাফসির করতে গিয়ে লিখেন, বুদ্ধিমান বলতে কী বোঝায়? বিশ্বের প্রতিটি মানুষই নিজেদের বুদ্ধিমান বলে দাবি করে। কোনো একজন নির্বোধ ব্যক্তিও নিজেকে নির্বোধ বলে স্বীকার করে না। ফলে কুরআন বুদ্ধিমানের কয়েকটি লক্ষণ বাতলে দিয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। আমরা সাধারণত জ্ঞান, নাক, চোখ, জিহ্বা প্রভৃতি অঙ্গের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করি। নির্বোধ প্রাণীর মধ্যেও এসব রয়েছে। পক্ষান্তরে বুদ্ধির কাজ হলো লক্ষ্যণীয় নিদর্শনাদির মধ্য থেকে গৃহীত দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে এমন কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, যা অনুভবযোগ্য নয় এবং যার দ্বারা বাস্তবতার সর্বশেষ উৎকর্ষ লাভ করা যায়। এই মূলনীতির প্রেক্ষিতে আসমান, জমিন, এর অন্তর্গত যাবতীয় সৃষ্টির এবং সেগুলোর সামগ্রীর পরিচালনার দিকে লক্ষ্য করলে এটা প্রমাণিত হয়, সমগ্র বিশ্ব একজন স্রষ্টা বিশেষ হেকমতের দ্বারা তৈরি করেছেন এবং তাঁর ইচ্ছায়ই সকল ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হচ্ছে। বস্তুত সে সত্তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। আসমান জমিনের ব্যবস্থাপনার দিকে দৃষ্টি দিলেই তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি এ পরিচয় বুঝতে পারে না, সে বুদ্ধিমান লোক নয়।

বর্তমানে আমরা দেখি বিজ্ঞানীরা আগুন, পানি ও বাষ্পকে বিদ্যুৎ তৈরির প্রকৃত শক্তি মনে করে। কিন্তু বুদ্ধিমান মাত্রই উপলবদ্ধি করতে পারে–শক্তি মূলত আগুন, পানি বা বায়ুর নয়, আসল শক্তি তাঁর হাতেই ন্যস্ত যিনি এ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। অর্থ–তিনি একজন বুদ্ধিজীবীর পরিচয় প্রসঙ্গে দুইটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন : ১. আল্লাহর সৃষ্টিরাজি দেখা এবং এর সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করা ২. আর এসব দেখে মুখে আল্লাহর জিকির-আজকার, তাসবিহ-তাহলিল করা এবং আল্লাহর কথা স্মরণে রেখে দুনিয়ার সকল কাজ করা।

সাইয়েদ কুতুব বলেন–'আল্লাহর সৃষ্টিরাজির দিকে সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে তাকালে আমরা দেখতো পাব যে, এ সবকিছুর মাধ্যমে কুরআন আল্লাহর অস্তিত্ব ও শক্তি ক্ষমতার নিদর্শনগুলো আমাদের দৃষ্টির সামনে ফুটিয়ে তুলছে। প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকিয়ে তুলছে আমাদের অনুভূতি; জীবন্ত করছে মৃত হৃদয়। প্রথম দৃষ্টিতে আমরা তা দেখি সাধারণভাবে। এরপর যত দেখি ততই এ সবকিছুর গুপ্ত রহস্য আমাদের চোখের সামনে ভাসতে থাকে। এই যে হাজার নক্ষত্রে ভরা গ্রহরাজি যা নিজ নিজ কক্ষপথে শুন্যলোকে অবিরাম ঘুরে বেড়ায়। এগুলোর বিশালত্ব অনুধাবন করতে না পারলেও, এর রহস্য ভাণ্ডার উদঘাটন করতে না পারলেও আল্লাহ পাক তাঁর কোনো কোনো বান্দাকে এ সবকিছু সম্পর্কে কিছু জ্ঞান দান করেন–যখন তারা এগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে। তিনি আরও বলেন–রাত ও দিনের অবর্তনের মানে হচ্ছে আঁধারের পিছনে আলোর আগমন। অর্থাৎ, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত। এগুলোর দিকে তাকালে চেতনার মধ্যে বিপ্লব সৃষ্টি হয়; আবার কত জনের সামনে প্রকাশিত হয় আশ্চর্যজনক বহু রহস্য। মুমিনের অন্তর ক্রমান্বয়ে এসব দৃশ্য থেকে আরও নতুন নতুন তথ্য পায়। এ সবকিছু আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করতে সাহায্য করে এবং প্রতিবারেই সে নতুন কিছু সৃষ্টির সন্ধান পায়।

সাইয়েদ কুতুব আরও বলেন, সাগরের বুকে যেসব জাহাজ চলে, এই আয়াতের ওপর গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করে আমি যে জিনিসটি বুঝতে পেরেছি তা যেন দুনিয়ার বাস্তবতায় সর্বত্রই প্রত্যক্ষ করছি। আমার নজরে পড়ে মহাসাগরের বুক মাড়িয়ে আমরা যখন জাহাজে করে কোথাও পাড়ি জমাই, তখন সেই নৌযানটিকে বিশাল সাগরের তুলনায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র এক টুকরো কাঠসম মনে হয়। আমরা দেখি ওই মহাসাগর আমাদেরকে তার বুকে ধারণ করে কীভাবে দেশ থেকে দেশান্তরে নিয়ে যায়। জাহাজে করে পাড়ি জমানোর সময় আমরা প্রত্যক্ষ করি আমাদের চতুর্দিকে পবর্তসম হাজারো উত্তাল তরঙ্গ। এক মহান সত্তা এই তরঙ্গমালার মধ্য দিয়ে আমাদের গন্তব্যস্থানে নিয়ে যান। এটা আল্লাহ তায়ালার অমোঘ নিদর্শনের একটি যে, তিনি আমাদের উত্তাল তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েও ক্ষুদ্র নৌযানে করে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেন। আকাশ থেকে পানি বর্ষণ, পৃথিবীর নানা কিছু মরে যাওয়ার পর আবার জিন্দা করা, বায়ুর পরিবর্তন এবং মেঘমালার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চোখ খুলে দেওয়ার মতো আশ্চর্য দৃশ্যও রয়েছে। এ সকল দৃশ্য খোলা হৃদয় নিয়ে চিন্তা করা এবং উন্মুক্ত দৃষ্টি দিয়ে বিশ্বপ্রকৃতির এমন অভূতপূর্ব দৃশ্যাবলি দেখার জন্য তিনি মুমিনকে আহ্বান জানিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা কীভাবে বৃষ্টির পানি দ্বারা শুকনো নির্জীব জমিন সজীব করেন এবং বীজ ও আঁটির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেন। এ সবকিছু দেখে নাস্তিকরা আল্লাহর অস্তিত্বের স্বীকৃতি না দিয়ে উপায় নেই। তবুও তারা এ সবকিছু থেকে মানুষের দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করছে। তারা মনে করে সকল ক্ষমতার মালিক একজনকেই মানতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। রুশ পণ্ডিতগণ দীর্ঘদিন যাবত মানুষকে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছেন যে, তারা জীবন সৃষ্টির কাছাকাছি অবস্থানে আছেন, তারা মনে করেন, আদতে সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাদের ধারণায় খুব বেশিদিন তারা স্থির থাকতে পারেননি, এক পর্যায়ে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, প্রাণসঞ্চারের মাধ্যমে কোনো জীব সৃষ্টি করা কখনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। খানিকটা বায়ু প্রবাহের দিকেই লক্ষ্য করলেই প্রত্যক্ষ করা যায়, কীভাবে এর প্রবাহ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে প্রবাহিত হয় এবং তার ওপর মেঘমালা আলোর ঝাঁকের মতো ভেসে বেড়ায়। মনে হয়, আকাশ ও পৃথিবী–বিশাল এক শূণ্যতার মাঝে মেঘমালা যেন বন্দিত্ব বরণ করে আছে। আফসোসের ব্যাপার হলো, রহস্যভরা পৃথিবীর বক্ষে এত সুষমা থাকার পরও কিছু

জ্যোতিহীন চোখ রয়েছে, যা এসব দেখতে পায় না; এমন অসংখ্য মানুষ আছে যাদের ভোতা হৃদয় এগুলো হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। ফলে তারা বঞ্চিত থাকে পৃথিবীতে বিরাজমান আল্লাহ পাকের একত্ব ঘোষণাকারী নিদর্শনাবলি প্রত্যক্ষ করা থেকে।

মুফতি শফী (রহ.) বলেন–'আসমান জমিনের সৃষ্টি, রাত-দিনের বিবর্তন তাঁরই ক্ষমতার পরিপূর্ণতা ও একত্ববাদের প্রকৃত প্রমাণ।' একইভাবে পানির ওপর নৌকা ও জাহাজ তথা জলযানসমূহের চলাচলও একটি বিরাট প্রমাণ। পানিকে আল্লাহ তাআলা এমন তরল পদার্থ করে সৃষ্টি করেছেন যে, তা প্রবাহমান হওয়া সত্ত্বেও তার বুকে লক্ষ লক্ষ টন ওজনসমতে এক বিশালাকার জাহাজ অনাআসেই দিগ্বিদিক চলাচল করে। তদুপুরি সমুদ্রের বুকে জাহাজ-নৌকাগুলো গতিশীল রাখার জন্য বাতাসের গতি এবং নিতান্ত রহস্যপূর্ণভাবে সে গতির পরিবর্তন করতে থাকা প্রভৃতি বিষয়ও এ দিকে ইঙ্গিত করে–এইসব সৃষ্টি ও পরিচালনার পিছনে এক মহাবিজ্ঞ সত্তা বিদ্যমান।

পানীয় পদার্থগুলো তরল না হলে যেমন এ কাজটি সম্ভব হতো না। তেমনি বাতাসের মাঝে গতি সঞ্চার না হলেও জাহাজ চলতে পারত না। কোনোভাবেই সম্ভব হতো না সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করা। এ বিষয়টি কুরআনে উল্লেখ হয়েছে এভাবে যে,

ان يشا يسكن الرياح فيظللن رواكد علي ظهره

অর্থাৎ–আল্লাহ ইচ্ছা করলে বাতাসের গতিকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জাহাজ সাগর পৃষ্ঠে দাঁড়িয়ে যাবে।

অনুরূপ আকাশ থেকে পানিকে বিন্দু বিন্দু বর্ষণ করা, যেন জমিনের কোনো ক্ষতি সাধন না হয়। যদি এ পানি দুনিয়ার বুকে প্লাবন আকারে আসতো, তাহলে মানুষ, জীবজন্তু কিংবা অন্যান্য জিনিসপত্র কিছুই থাকত না। তাছাড়া পানিকে বৃষ্টি আকারে বর্ষণের পর ভূপৃষ্টে তা নানাভাবে সংরক্ষণ করা মানুষের সাধ্যায়ত্ব ব্যাপার হয়। যদি বলা হতো–তোমাদের প্রয়োজন মাফিক তোমরা সংরক্ষণ করে রাখ, তাহলে মানুষের জন্য সম্ভব হতো না। আল্লাহ তায়ালা তার কুদরতি ক্ষমতায় পানিকে ভূমিতে ধারণ করিয়েছেন। পুকুর, কল, কূপ থেকে পানি উত্তোলন করা যায়। কোথাও সাগর দিয়েছেন, আবার কোথাও বইয়ে দিয়েছেন নদী-উপনদী আর কোথাও সংরক্ষণ করে রেখেছেন তুষারাকারে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে পানি নিঃশেষ করে দিতে পারতেন।

و انا علي ذهاب به لقدرون

–বৃষ্টির পানি পড়ার পর তাকে প্রবাহিত করে নিংশেষ করে দেওয়ার ক্ষমতা আমার ছিল।

দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, আজকের সমাজে এমন কিছু বুদ্ধিজীবী রয়েছেন যারা আল্লাহর সৃষ্টিরাজি দেখেন সত্য, কিন্তু তাদের মনের অভিব্যক্তি প্রকাশের সময় আল্লাহর প্রশংসাকীর্তন থাকে না–ভরা থাকে নিছক কিছু জাগতিক রূপ-রসে। বস্তুগত দৃষ্টিকোণ কিংবা নিছক মনোরঞ্জনের জন্যও তারা এসব সৃষ্টির রূপ সৌন্দর্য প্রকাশ করেন। নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালি এসব যে একমাত্র আল্লাহরই কুদরতের নিদর্শন, সে কথা প্রকাশিত হয় না; বরং কেউ কেউ নামে মুসলিম হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের লেখনী ও বক্তব্যের বিষয়বস্তু আল্লাহর দ্বীন বিরোধী।

আল্লাহ তায়ালা মহাগ্রন্থ আল কুরআন কেবল তিলাওয়াত করার জন্য নাজিল করেননি। এর প্রতিটি বর্ণ তিলাওয়াত করলে কম পক্ষে দশ নেকি পাওয়া যায়। আবার কিন্তু শুধু নেকি গণনার জন্য কুরআন নাজিল হয়নি। নাজিলের উদ্দেশ্য মূলত এই কুরআন আমরা পড়ব এবং সে অনুযায়ী জীবন গড়ব; অন্যকে শেখাবো এবং কুরআনের বিধি-বিধান নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করব। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন–

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

তারা কি কুরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না, নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ।'

কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা, আল্লাহর সৃষ্টিরাজি নিয়ে ভাবনা বিরাট ইবাদত। এই প্রসঙ্গে রাসুল (সা.) বলেন–لا عبادة كتفكر অর্থাৎ, তাফাক্কুর তথা চিন্তা-গবেষণার মতো আর ইবাদত হয় না। তিনি আরও বলেন– تفكر ساعة خير من عبادة سنة

অর্থাৎ, এক ঘণ্টা তাফাক্কুর করা এক বছর অন্য নফল ইবাদত করার চেয়ে উত্তম।

ইবনে মুসাইয়্যেব বলেন–'কেবল যোহর ও আসর নামাজ ইবাদত নয়। ইবাদত হচ্ছে আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা থেকে বিরত থাকা এবং আল্লাহর নির্দেশাবলি সম্পর্কে তাফাক্কুর করা।' হাসান বলেন–'এক ঘণ্টা তাফাক্কুর করা সারা রাত ইবাদত করার চেয়ে উত্তম।' আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি ও সৃষ্ট জগতের ওপর চিন্তা-গবেষণা করে তার মহাত্ম ও কুদরত সম্পর্কে অবগত হওয়া একটি মহৎ উচ্চ পর্যায়ের ইবাদত। সেগুলোর মধ্যে গভীর মনোনিবেশ করে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করা একান্তই নির্বুদ্ধিতা। দ্বীনের জ্ঞান-গবেষণায় সময় ব্যয় করা নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম। কেননা, নফল বন্দেগির মাধ্যমে একজন ব্যক্তির অত্মিক উন্নতি হয়, আর জ্ঞান-গবেষণার মাধ্যমে সমাজের অনেক মানুষ উপকৃত হয়। অপরদিকে দ্বীনের সহিহ ইলম ছাড়া সঠিকভাবে দ্বীন পালনও সম্ভব নয়। তাই ইসলাম দ্বীনের ইলম অর্জন করার প্রতি উৎসাহিত করেছে। এ প্রসঙ্গে অনেক হাদিস রয়েছে, যেমন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন–

تدارس العلم ساعة من الليل خير من احياءها- رواه الدارمي

'রাতে এক ঘণ্টা দ্বীন সম্পর্কে অধ্যয়ন সারারাত নফল ইবাদত চেয়ে উত্তম।'

রাসুল (সা.) বলেন–

فقيه واحد اشد علي الشيطان من الف عابد- رواه الترمذي

এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, একজন ফকিহ শয়তানি চক্রান্ত মোকাবিলায় ১০০০ আবেদের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। তাছাড়া তাফাক্কুরের কয়েকটি বিষয় নিম্নে তুলে ধরা হলো–

খলকুল্লাহ তথা আল্লাহর সৃষ্টিরাজি

রাসূলে কারিম (সা.) ইরশাদ করছেন–

تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق

তোমরা সৃষ্টিরাজি নিয়ে গবেষণা করো, কিন্তু সৃষ্টিকর্তা নিয়ে গবেষণা করো না।

ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি (রহ.) বলছেন–এর কারণ হচ্ছে সৃষ্টিরাজির ধরন, প্রকৃতি, আকৃতি প্রভৃতি সম্পর্কে গবেষণা করা সম্ভব। কিন্তু সৃষ্টি কর্তার গঠন-প্রকৃতি তাঁর জন্য যেমন শোভনীয় তেমনিই অছেন, এ সম্পর্কে বিস্তারিত কোনোকিছুই জানা যায় না। এ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই আমাদের সৃষ্টিরাজি সম্পর্কে তাফাক্কুর ও তাদাব্বুর করতে হবে। সৃষ্টিরাজি সম্পর্কে গবেষণা করতে

গেলে আমাদের সামনে অনেক বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন–একজন মানুষ গাছের একটি পাতা নিয়ে চিন্তা করলে তার কাছে মনে হবে, পাতায় অনেক ছোটো ছোটো রেখা আছে। কিছু রেখা স্পষ্ট, আর কিছু রেখা এত সূক্ষ্ম ও অস্পষ্ট যে খোলা চোখে তা দেখা যায় না। আবার আরেকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সেই পাতাটি গ্রহ-নক্ষত্রের তুলনায় কিছুই নয়। একজন মানুষ পাতাটি হাতে নিয়ে সূক্ষ্মভাবে দেখেও যা তার নজরে আসে না, কিন্তু যিনি পাতাটি সৃষ্টি করেছেন তাঁর নজরে সবকিছুই রয়েছে। এই ধরনের চিন্তা করার পর কোনো একজন মানুষের পক্ষে কখনো পাপ কাজ করা সম্ভব হয় না।

আত্মপর্যালোচনা মানুষের জন্য আয়নাস্বরূপ

الفكرة مراة المومن ينظرفيها الي حسناته وسئاته- ومما يتفكر فيه مخاوف الاخرة من الحشر والنشر والجنة ونعيمها والنار وعذابها

হাসান বলেন, 'চিন্তা-ভাবনা (রিফলেকশন) হচ্ছে মানুষের আয়না। এর মাধ্যমে মানুষ নিজের ভালো-মন্দ দেখতে পায়। আর এই চিন্তার সময় আখেরাতের ভয়, হাশর, জান্নাতের সুখ ও জাহান্নামের আযাবের কথা জেগে ওঠে মনন্তরে।' আবু সুলাইমান আদ-দারেসি এক রাতে অজু করার জন্য পানির পাত্র হাতে নেন। সে রাতে তাঁর কাছে একজন মেহমান ছিল। তিনি দেখলেন, আদ-দারেসি পানির পাত্রে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ফজরের নামাজ পর্যন্ত দাঁড়িয়েই থাকলেন। ফজরের সময় মেহমান তাঁকে প্রশ্ন করলেন, হে আবু সুলাইমান! তোমার কী হয়েছে? তখন তিনি বললেন, আমি পানির পাত্রে হাত দেওয়ার পর কেয়ামতের দিন আমার অবস্থা কী হবে, এ নিয়ে চিন্তা শুরু করি এবং অস্থির হয়ে সকাল পর্যন্ত তা-ই চিন্তা করতে থাকি।' ইবনে আতিয়া বলেন–'এটা ভয়ের চূড়ান্ত পর্যায়। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে, মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। সুফিদের মতে তাফাক্কুর নফল নামাজের চেয়ে উত্তম। তবে ফকিহদের মতে নামাজই উত্তম। কেননা, এতে দুয়া আছে।

শারীরিক গঠন নিয়ে চিন্তা

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم

অর্থাৎ–আমি তো মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করেছি। স্বাভাবিক দুনিয়ায় কোনো একজন মানুষের শরীর-কাঠামোতে ভারসাম্য না থাকলে তাকে অসুস্থ বলা হয়। তাছাড়া প্রত্যেক মানুষের মধ্যে মেধা লুক্কায়িত। এ প্রসঙ্গে রাসুল (সা.) বলেছেন,

الناس معادن كمعادن الذهب والفضة

অর্থাৎ–মানুষ স্বর্ণ-রূপার খনির ন্যায়। তবে স্বর্ণ ও রূপার খনির মধ্যে যে রকম তারতম্য আছে, অনুরূপ সকল মানুষের প্রতিভার মধ্যেও তারতম্য বিদ্যমান। এ কারণে সকলের সৃজন ক্ষমতা সমান নয়। স্বর্ণ ও রূপার খনি কাজে না লাগিয়ে মাটি চাপা দিয়ে রাখলে মানুষ 'খনির অস্তিত্ব' সম্পর্কে জানতে পারে না। একইভাবে প্রত্যেকের মধ্যে যে প্রতিভা লুক্কায়িত, তা কাজে না লাগালে প্রতিভার অস্তিত্ব বোঝা যায় না। যারা প্রতিভা কাজে লাগান তাঁরাই প্রতিভাধর হিসাবে যশস্বী হন।

আমাদের আসমান ও জমিনের সৃষ্টি-রহস্য নিয়ে ভাবতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

والفجر- وليال عشر- والشفع والوتر- والليل اذا يسر- هل في ذلك قسم لذي حجر

ফজরের কসম, দশটি রাতের, জোড় ও বেজোড়ের এবং রাতের কসম–যখন তা বিদায় নিতে থাকে। এর মধ্যে আলাদাভাবে কোনো বুদ্ধিমানের জন্য কি কোনো কসম আছে? মহান আল্লাহ আরও বলেন–

وهو الذي جعل اليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا

যারা অনুসন্ধানপ্রিয় অথবা যারা কৃতজ্ঞতাপ্রিয়, তাদের জন্য তিনি রাত্রি ও দিনকে সৃষ্টি করেছেন পরিবর্তনশীলরূপে।

ভাবতে হবে প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে

আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর সকল কিছুই মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন–

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

অর্থাৎ–তিনিই পৃথিবীতে তোমাদের জন্য সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করেছেন। এই আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর সমস্ত কিছু মানবতার কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন। এমনকি বাহ্য দৃষ্টিতে ক্ষতিকর প্রাণীও মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ সবকিছু মানবকল্যাণে ব্যবহার করার জন্য যথেষ্ট যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকতে হবে।

আল্লাহ পৃথিবীতে অনেক সম্পদ দিয়েছেন। মুসলিম দেশসমূহের তেল, খনিজ পদার্থ, তুলা, স্বর্ণসহ বহু প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। বাংলাদেশেও ব্যাপক প্রাকৃতিক সম্পদের খোঁজ পাওয়া গেছে। কিন্তু খোঁজ পাওয়া যায়নি সত্য ও যোগ্য নেতৃত্বের। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করার মতো প্রযুক্তি বাংলাদেশে থাকলে এই প্রাকৃতিক, খনিজ ও মৎস্য সম্পদ কাজে লাগিয়ে আমরা অনেক উন্নতি লাভ করতে পারতাম।

বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল রাঙামাটির অনেক ফল পঁচে যায়; চাঁপাইনবাবগঞ্জের আম এখনও আন্তর্জাতিক বাজারজাতকরণ সম্ভব হয়নি। ব্যাপকভাবে তেল ও গ্যাস কাজে লাগানোর মতো প্রযুক্তি আমাদের হাতে নেই; বিশ্বায়নের এই যুগে এখনও বিদেশী বিশেষজ্ঞদের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হচ্ছে। নদ-নদীতে প্রচুর মাছ। তার সুষম বণ্টন-ব্যবহার কোনোটাই সম্ভব হচ্ছে না। এইভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, পাশ্চাত্য তাদের সম্পদকে যেভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম, সে তুলনায় আমরা মানব ও প্রাকৃতিক উভয় সম্পদের কোনোটাই তেমন কাজে লাগাতে পারছি না।

জিকির, দুআ, তাসবিহ ও তাহলিল

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–"নিজ প্রভুর নাম স্মরণ করতে থাকো এবং সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁরই জন্য হয়ে যাও।" এই নির্দেশনা থেকে স্পষ্ট যে, মুমিন কখনো দুনিয়াবি হাজারো ব্যস্তার মাঝে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল থাকে না; বরং কোনো না কোনোভাবে আল্লাহকে স্মরণ করে। আল্লাহর স্মরণে নিবেদিত জীবনই হচ্ছে রাসূলের জীবন। কুরআনের একটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ

"কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখব এবং আমার শোকর আদায় করো, আমার নিয়ামতের কুফরি করো না।" আমরা কি এর চাইতে উন্নত আর কোনো অবস্থা ভাবতে পারি, যখন আমরা আল্লাহকে স্মরণ করলে তার বিনিময়ে–বিশ্বজাহানের স্রষ্টা, প্রতিপালক ও পরিচালক–তিনি আমাদের স্মরণ করবেন। একইভাবে হাদিসে কুদসিতে এসেছে–

"আমি আমার বান্দার সাথে সেভাবে আচরণ করব, যেভাবে সে আমার ব্যাপারে আশা করে। আমি তার সাথে থাকি, যখন সে আমাকে স্মরণ

করে–যদি সে আমাকে তার 'হৃদয়ে' স্মরণ করে–আমি তাকে আমার হৃদয়ে স্মরণ করি। সে যদি আমাকে সমাবেশে স্মরণ করে, আমি তাকে এর চেয়ে অনেক উন্নত একটি সমাবেশে স্মরণ করি। সে যদি আমার এক হাত দূরত্বের মধ্যে ফিরে আসে, আমি তার অর্ধেক হাতের মধ্যে ফিরে আসি। সে যদি আমার অর্ধেক হাতের মধ্যে ফিরে আসে, আমি তার এক বিঘতের মধ্যে চলে আসি। সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।

যারা দাঁড়ানো, বসা এবং শোয়া অবস্থায় আল্লাহর স্মরণ করে, আর যারা পৃথিবী ও আকাশসমূহের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে তাদের সম্পর্কে কুরআনে উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে। তারা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী; যেহেতু তারা তাদের হৃদয়কে আল্লহর স্মরণে পরিপূর্ণ করে রাখে–প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি পরিস্থিতিতে এবং জীবনের সঙ্কটময় অবস্থায়ও। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

'যারা উঠতে, বসতে ও শুয়তে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান-জমিনের গঠন-প্রকতি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে। (তারা দিল থেকে বলে ওঠে) হে আমাদের রব! এ সবকিছু অনর্থক ও বিনা উদ্দেশ্যে সষ্টি করোনি, আর বেহুদা কাজ থেকে তুমি পবিত্র। তাই দোযখের আজাব তুমি আমাদের থেকে বাঁচাও।'

সকল সময়ে আল্লাহর স্মরণ হচ্ছে আমাদের জন্য তাঁর সর্বোচ্চ ও সর্বব্যাপী ভালোবাসার নিদর্শন। আমাদের জন্য আল্লাহর দরজা সব সময় উন্মুক্ত। তিনি তো বলেই দিয়েছেন–আমাকে স্মরণ করো এবং আমি তোমাকে স্মরণ করব। এই প্রসঙ্গে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا﴿٤١﴾ وَّ سَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا ﴿٤٢﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর। আর সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।'

قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

তারা বলল–হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের ওপর জুলুম করে ফেলেছি। এখন যদি আপনি আমাদের মাফ না করেন এং আমাদের ওপর রহম না করেন, তাহলে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবো।'

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

আর যাদের অবস্থা এমন, যদি কখনো কোনো অশ্লীল কাজ তাদের দ্বারা হয়ে যায় অথবা কোনো গুনাহ করে নিজেদের ওপর জুলুম করে বসে, তাহলে সাথে সাথেই আল্লাহর কথা তাদের মনে হয় এবং তাঁর কাছে তারা নিজেদের গুনাহ মাফ চায়। কেননা, আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে, যে গুনাহ মাফ করতে পারে? এসব লোক যেটুকু (গুনাহের) কাজ করে ফেলেছে তা জেনেবুঝে আর করতে থাকে না।'

আল্লাহকে উকিল হিসাবে গ্রহণ করা

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 'তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নাই। তাই তাঁকেই নিজের উকিল হিসাবে গ্রহণ করো।' উকিল বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যার প্রতি আস্থা রেখে কোনো ব্যক্তি নিজের ব্যাপার তার ওপর সোপর্দ করে। যেমন আমরা মামলা-মোকাদ্দমা যার ওপর ন্যস্ত করি, তাকে বলি উকিল। কেননা, তার প্রতি দায়িত্ব অর্পন করে আমরা নিশ্চিত হই, সে তার পক্ষ থেকে ভালোভাবে মামলাটিতে লড়বে। রাসুল (সা.) দ্বীনের দাওয়াত শুরু করার পর চতুর্দিক থেকে বিরোধিতার সম্মুখীন হন। এমতাবস্থায় তাঁকে নির্দেশনা দেওয়া হয় আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করার জন্য।

আল্লাহর পক্ষে যারা সংগ্রাম-সাধনা করে, তিনি তাদের সব সময় সাহায্য করতে প্রস্তুত। ঈমানদারদের এই ঐকান্তিক ধারণা ও উপলব্ধি আত্মবিশ্বাসের জন্ম দেয়। আল্লাহর ভয়ে নির্ভরশীলতা, তিনি আপনাকে সাহায্য করবেন, রক্ষা করবেন এবং রহমত বর্ষণ করতে সদা প্রস্তুত এই থেকেও আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। মহান আল্লাহ বলেন–

فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى

'যে দান করেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে, আর উত্তমকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে, আমি তার জন্য সহজ পথে চলা সুগম করে দেবো।' আল্লাহ তাঁর অপরিসীম দয়ায় আপনাকে সে সকল যোগ্যতা দান করেছেন, যা আপনার দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন। এই বিষয়টি অবগত হওয়ার মাধ্যমেও আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক ও সর্বোচ্চ দয়ার আঁধার, সেই সত্ত্বার পক্ষে আপনাকে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা দান না করে দায়িত্বের বোঝা চাপানো শোভা যায় না।

সবর ও হিজর

আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়ে বলেন–'আর লোকেরা যা বলে বেড়াচ্ছে, সে বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করো এবং ভদ্রভাবে তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাও।' এই আয়াতের মানে এই নয় যে, বিরুদ্ধবাদীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাবলিগ বন্ধ করে দেওয়া; বরং এর অর্থ হচ্ছে, বিরোধীদের অসভ্য আচরণের জবাব দেওয়ার পরিবর্তে উপেক্ষা করে চলো। অভদ্রতার জবাব না দিয়ে নীরব থাকা কোনো দুর্বলতা নয়।

সুরা মুদ্দাসিরেও প্রায় একই ভাষায় বলা হয়েছে–'তোমার রবের জন্য ধৈর্য ধারণ করো।' এর মানে হলো, দাওয়াত ও তানজিরের এই কাজ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। তা করতে গেলে বিপদাপদ, দুঃখ-কষ্ট এবং নানান মুসিবতের মুখোমুখি হতে হবে। তবে এই পথে যত বিপদই আসুক না কেন, ধৈর্য ধারণ এবং অটলাবস্থনে থেকে পালন করতে হবে নিজের দায়িত্ব। ভয়-ভীতি, লোভ-লালসা, বন্ধুত্ব-শত্রুতা সকল ক্ষেত্রেই থাকতে হবে স্থির ও অটল। আল্লাহ তায়ালার এই নির্দেশনার মাধ্যমে ফুটে উঠেছে, তিনি তাঁর নবি-রাসুলদের দাওয়াত ইলাল্লাহর যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা পালন করতে গেলে নানান সময়ে বিভিন্ন বাধাবিপত্তি আসবে। কিন্তু এই সময় ধৈর্য ধারণ করতে হবে।

কুরআনে যে তিনজন সাহাবির তওবা কবুলের কথা উদ্ধৃত হয়েছে তাদের একজন ছিলেন কাব বিন মালেক (রা.)। তিনি বলেন, কাব বিন আশরাফ কবিতার মাধ্যমে রাসূলে কারিম (সা.)-কে বিদ্রুপ করত। এমনকি রাসুল (সা.)-এর বিরুদ্ধে এগিয়ে আসার জন্য উদ্ধুদ্ধ করত মক্কার কুরাইশ-কাফিরদের। নবিজি যখন মদিনায় এলেন তখন সেখানে মুসলমান, ইহুদি ও মুশরিক লোকদের মিশ্র বসবাস ছিল। তিনি ইচ্ছা পোষণ করলেন সকলের উন্নতি সাধনে কাজ করবেন, অথচ ইহুদি-মুশরিকরা তাঁকে ও তাঁর সাহাবিদের ভীষন কষ্ট দিত। এই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাজিল করেন–'অবশ্যই তোমাদের জান ও

মাল উভয় দিক থেকেই পরীক্ষা করা হবে এবং তোমরা মুশরিক ও আহলে কিতাব উভয়ের পক্ষ থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। আর তোমরা যদি ধৈর্য ও তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে নিশ্চয়ই তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ।'

এখানে আরেকটি বিষয় তুলে ধরা দরকার। দাওয়াত দানকারীকে অতীতেও অনেক কটুক্তি, মশকরা-টিপ্পনী শুনতে হয়েছে। যেমন : রাসুল (সা.)-কে পাগল, গণক, যাদুকর, মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল এবং বন্দি করে রাখা হয়েছিল শিয়াবে আবু তালেবে। চলার পথে বিছিয়ে রাখা হতো বিষাক্ত কাটা। ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হতো মরা উটের অর্ধ-গলিত নাড়িভূড়ি। তায়েফের ময়দানে প্রস্তরাঘাতে তাঁকে রক্তাক্ত করা হয়েছিল। এইভাবে নানা উপায়ে চেষ্টা করা হয়েছিল নবিজির ক্ষতি করার জন্য। এক পর্যায়ে এমন পরিকল্পনাও করা হয়েছিল যে, তাঁকে হত্যা করা হবে। অন্যান্য নবি-রাসুলদের সাথেও এমন ঘটনা ঘটেছে। তাঁরা যখন নিজ নিজ জাতিকে দাওয়াত দিতেন, তাদের উম্মতরা তখন কানে কাপড় ঢুকিয়ে রাখত। ইউসুফ (আ.)-কে দেওয়া হয়েছিল জেলখানায়। মুসা (আ.) স্বদেশ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। ইবরাহিম (আ.)-কে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তপ্ত আগুনে। ঈসা (আ.) কে শুলিবিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। যাকারিয়া (আ.) কে মাথা থেকে পা পর্যন্ত করাত দিয়ে চিড়ে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছিল। হত্যা করা হয়েছিল অসংখ্য বনি ইজরাইলের নবি-রাসুল। নুহ (আ.)-কে হুমকি দেওয়া হয়েছিল এই বলে–'যদি এখনও ক্ষান্ত না হও, তাহলে পাথর মেরে তোমাকে আমরা হত্যা করব।' এভাবে এক দিক থেকে নির্যাতন করা হতো এবং অপরদিকে প্রদর্শন করা হতো নানা ধরনের লোভ-লালসা। আর সকল লোভ-লালসার উর্ধ্বে উঠে রাসুল (সা.) ঘোষণা করেছিলেন, 'আমার এক হাতে যদি চাঁদ এবং আরেক হাতে যদি সূর্য এনেও দেওয়া হয়, তবুও আমি সত্য থেকে কখনো বিচ্যুত হবো না।'

তানজির ও তাকবির

সুরা মুদ্দাসিরের শুরুতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–"হে বস্ত্রাবৃত! ওঠো, সাবধান করে দাও। তোমরার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।' এই আয়াতের মাধ্যমে বলা হচ্ছে, হে বস্ত্র জড়িয়ে শয়নকারী তুমি ওঠো। তোমার চারপাশের লোকজনকে জাগিয়ে তোলো। মূলত একজন নবির প্রধানতম কাজ হলো এই কথা ঘোষণা করা–'এই পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া আর কারও কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই।' আদতে এই কারণেই আল্লাহু আকবর বলে আজান-ইকামত-নামাজ শুরু হয়। এর ফলেই আল্লাহু আকবর স্লোগানটি মুসলমানদের কাছে অতি প্রিয়। অতীতের সকল নবি-রাসুল আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেছেন এবং সতর্ক করেছেন। নূহ (আ.)-কে বলা হয়েছিল–'তোমার নিজের কওমের ওপর এক ভীষণ কষ্টদায়ক আজাব আসার পূর্বেই তাদের সাবধান করে দাও।'

পবিত্র থাকার প্রতি নির্দেশ

আল্লাহর নির্দেশ পেয়ে রাসুল (সা.) পূর্ণ এক বছর রাতের পুরো অংশ অথবা আংশিক ইবাদাতে কাটাতেন। শেষ পর্যন্ত যখন আধ্যাত্মিকভাবে দাওয়াতের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, তখন আল্লাহ ঘোষণা করেন–

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ - قُمْ فَأَنْذِرْ - وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ - وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

'হে বস্ত্রাবৃত! উঠুন, সতর্ক করুন, আপন পালনকর্তার মহাত্ম্য বর্ণনা করুন এবং আপন পোশাক পবিত্র করুন।'

উক্ত আয়াতত্রয়ে দাওয়াত দানকারীর কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। যেমন:

(ক) দাওয়াতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ।
(খ) উম্মাহকে ভীতি প্রদর্শন।
(গ) আল্লাহর নির্দেশকে সম্মান করা।
(ঘ) আল্লাহর শক্তির ওপর আস্থাশীল ও নির্ভরশীল হওয়া।
(ঙ) মন ও হৃদয় পবিত্র করা।
(চ) সকল কাজ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে আদায় করা। এবং
(ছ) দ্বীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিকট অনুগ্রহ বা সাহায্য না চাওয়া। আর এর মাধ্যমে লোকদের ওপর অনুগ্রহ করা হয়েছে, তা মনে না করা। ব্যক্তিগত কোনো উদ্দেশ্যে এ কাজ করা হচ্ছে, এমন চিন্তা না করা। কারণ, এ কাজের যাবতীয় ফলাফল এবং সকল উদ্দেশ্যই আল্লাহর জন্য।

ইমাম কুরতুবি তাঁর তাফসিরে বলেন, আল্লাহ তায়ালার বাণী–'তোমার পোশাক পবিত্র রাখো, অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো।' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, আত্মার পবিত্রতার সাথে পবিত্র রাখতে হবে পাশাক পরিচ্ছেদও। কোনো পবিত্র আত্মা গন্ধযুক্ত অপবিত্র পোশাকের ভেতর থাকতে পারে না। আকিদা-বিশ্বাসের পবিত্রতার সাথে সাথে পরিচ্ছেদের পবিত্রতাও জরুরি। এই আয়াতের আরেকটি অর্থ হলো বৈরাগ্যবাদী ধ্যাণ-ধারণায় প্রভাবিত হয়ে নোংরা পোশাক পরিধান করাকে নেকির কাজ মনে করা ঠিক নয়। তাছাড়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করা দুনিয়াদারীর লক্ষণও নয়। এই আয়াতের আরও অর্থ এমন যে, পোশাক-পরিচ্ছেদ গর্ব-অহংকারের প্রকাশ থেকে যেন পবিত্র থাকে। দাঈ ইলাল্লাহর কাজ যারা করেন, তাদের এমন পোশাক পরিধান করা উচিত, যা দেখে সকলে মনে করেন তিনি একজন ভদ্র-কোমল মানুষ। তাছাড়া এই আয়াতত্রয়ের এমন অর্থও প্রকাশ পায়, নৈতিক চরিত্রবান হওয়া তথা অনৈতিকতা থেকে পবিত্র থাকা। মূল কথা হচ্ছে সমাজের সব ধরনের অপবিত্র পরিবেশ থেকে পবিত্রসম অবস্থান হতে দ্বীনের দাওয়াত দিতে হবে।

নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–'বেশি লাভ করার জন্য ইহসান করো না।' এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। আল্লাহ তাঁর নবিকে নির্দেশ দিয়েছেন, 'তুমি যার প্রতিই ইহসান বা অনুগ্রহ করবে তা নিঃস্বার্থভাবে করবে।' একে অপরের প্রতি বদান্যতা, দানশীলতা ও উত্তম আচরণ কেবল আল্লাহকে খুশি করার জন্য করতে হবে। তিনি নবিজিকে আরও বলেন যে, নবুওয়তের দায়িত্ব পালন করে মানুষের কাছ থেকে কোনো স্বার্থ আদায় উদ্ধার করবে না এবং এর মাধ্যমে মানুষের উপকার করা হয়েছে এমন মনোভাবও পোষণ করা যাবে না। এই কাজকে বড়ো কাজ মনে করে রবের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়েছে, তা মনে করবে না।

আল্লাহ তায়ালা রাসুল (সা.)-কে বলেন–'আপনি বলুন আমি তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাই না' (সুরা আনআম : ৯০)। একই কথা সুরা ফুরকান : ৫৭, সাবা : ৪৭ ও কলমের : ২ নম্বর আয়াতে বর্ণিত আছে।

লেখক: রিসার্চ, পাবলিকেশন ও এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স সেক্রেটারি, এমসিএ

রামাদ্বান মাসের ঐতিহাসিক সব বিজয়

আলী আহমদ মাবরুর

ইসলামের ইতিহাসের প্রথম বিজয় ছিল বদরের যুদ্ধের বিজয়। আল কুরআনে এ দিনটিকে ইয়াওমুল ফুরকান বলা হয়েছে। অর্থাৎ যেদিন সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ নির্ধারিত হয়েছিল। কুরাইশ কাফের ও মুশরিকদের মোট সেনা সংখ্যার মাত্র এক তৃতীয়াংশ নিয়ে মুসলিমরা ঐতিহাসিক এ বিজয় লাভ করেছিল রমাদান মাসের ১৭ তারিখে। এ বিজয়টা মানবিক কোনো হিসেবেই কেউ কল্পনা করেনি। কেননা, কাফেরদের সেনা সংখ্যা এবং অস্ত্র ভাণ্ডার দুটোই মুসলিমদের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। কিন্তু আল্লাহ সরাসরি গায়েবি মদদ দিয়ে মুসলিমদেরকে বিজয় দান করেছিলেন।

কাফেরদের সংখ্যা ৩ গুণ বেশি এই বিষয়টি মুসলমানদেরকে হতাশ করেনি বরং সংখ্যার এ তারতম্যটাই ছিল তাদের জন্য সবচেয়ে স্বস্তির জায়গা। আর তাই খুব অল্প সময়ের মাঝেই মুসলিমরা তাদের তুলনায় ৩ গুণ বেশি থাকা কুরাইশ বাহিনীর ওপর নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। আর মুশরিক সেনারাও মুসলিমদের চোখে মুখে এই বলিষ্ঠতা ও ঈমানী চেতনা দেখে বিস্মিত হয়ে যায়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই তারা যেন মানসিকভাবে পরাজয়ের স্বাদ পেয়ে যায়।

বদরের যুদ্ধ ছিল সদ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া ইসলামিক রাষ্ট্রের সাথে ইসলামের প্রথম দিন থেকে শত্রুতা করে আসা আরব ভূখণ্ডের শক্তিশালী বংশধর কুরাইশদের মধ্যকার প্রথম আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ। তাই এ যুদ্ধের তাৎপর্য অনেক বেশি। এ কারণে রাসুল (সা.) নিজে যেমন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের কদর করতেন তেমনি খোলাফায়ে রাশিদুনের সময়েও বদরী সাহাবিদের সম্মান ও মূল্যায়ন অন্য সবার তুলনায় আলাদা ছিল।

বদরের যুদ্ধে কুরাইশরা জয়ী হলে হয়তো মদিনার দিকে অগ্রসর হবে এবং মদিনার ইসলামিক রাষ্ট্র এবং ইসলামকে একইসাথে ধ্বংস করে দেয়ার চেষ্টা করবে। অন্যদিকে, মুসলিমরা বিজয়ী হলে ইসলাম টিকে থাকবে। পাশাপাশি, মুসলিমরা আরবের একটি শক্তিশালী বাহিনীতে পরিণত হবে এবং কুরাইশদের মতো একই মর্যাদায় স্বীকৃতি লাভ করবে। এই প্রেক্ষাপটেই রাসুল (সা.) আল্লাহর কাছে একনিষ্ঠভাবে পূর্ণাঙ্গ বিজয়ের জন্য সাহায্য কামনা করছিলেন।

অন্যদিকে, মুসলিমরা এও জানতেন যে, পূর্ণাঙ্গ বিজয় ছাড়া তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার নয়। তারা ঈমানী মনোবল নিয়ে যুদ্ধে গিয়েছিল শুধু এ কথা প্রমাণ করার জন্য যে, কেবলমাত্র সংখ্যা বা বস্তুগত সম্পদ দিয়ে ঈমানের শক্তিকে মোকাবেলা করা যায় না। প্রখ্যাত সাহাবি হযরত আবু হুরায়রা (রা.), যিনি হুদাইবিয়া সন্ধি চুক্তির পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি মুসলিম ও কাফেরদের বাহিনীর মধ্যকার সৈন্যের সংখ্যাগত এ ব্যবধান নিয়ে খুবই বিস্মিত হতেন। তিনি বলেন, আমি মু'তার যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। যখন বাতিল পক্ষের সেনারা আমাদের নিকটে চলে আসলো, আমরা দেখলাম তাদের হাতে অনেক ভারী ও আধুনিক অস্ত্রসস্ত্র। শরীরেও তারা বেশ ভালো মানের বর্ম পরিধান করে আছে। তাদের সংখ্যা মুসলিমদের তুলনায় অনেক অনেকগুণ বেশি। আমি এসব দেখে একটু দ্বিধায় পড়ে গেলাম।

তখন সাবিত ইবনে আরকাম (রা.) এসে আমাকে বললেন, "আবু হুরায়রা, তুমি নিশ্চয়ই প্রতিপক্ষের বিশাল সেনাবহর দেখে ঘাবড়ে গেছো।" আমি তার কথায় সায় দিলাম।

তারপর তিনি বললেন, "তুমি তো আমাদের সাথে বদরের যুদ্ধের সময় ছিলে না। তাহলে বুঝতে। মুসলিমরা কখনোই নিজেদের সেনা সংখ্যার ভিত্তিতে জয়ী হয় না। আর কাফেররাও কখনো বিশাল সেনা বহরের শক্তিতে মুসলিমদেরকে পরাস্ত করতে পারে না।" বদরের যুদ্ধ তারই প্রমাণ।

এবার আসা যাক, ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায়ে। ২০ বছরের মুসলিমদের ক্রমাগত ত্যাগ স্বীকার, নির্যাতন ও জুলুম নিপীড়নের পর ৮ম হিজরিতে আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদেরকে মক্কা বিজয় দান করেন। এ বিজয়টিও আল্লাহর পক্ষ থেকে ঐতিহাসিক মিরাকল। মক্কা বিজয় হয়েছিল রমাদান মাসের ২৩ তারিখ। কোনো ধরনের রক্তপাত ছাড়া মক্কা বিজয়ের এ

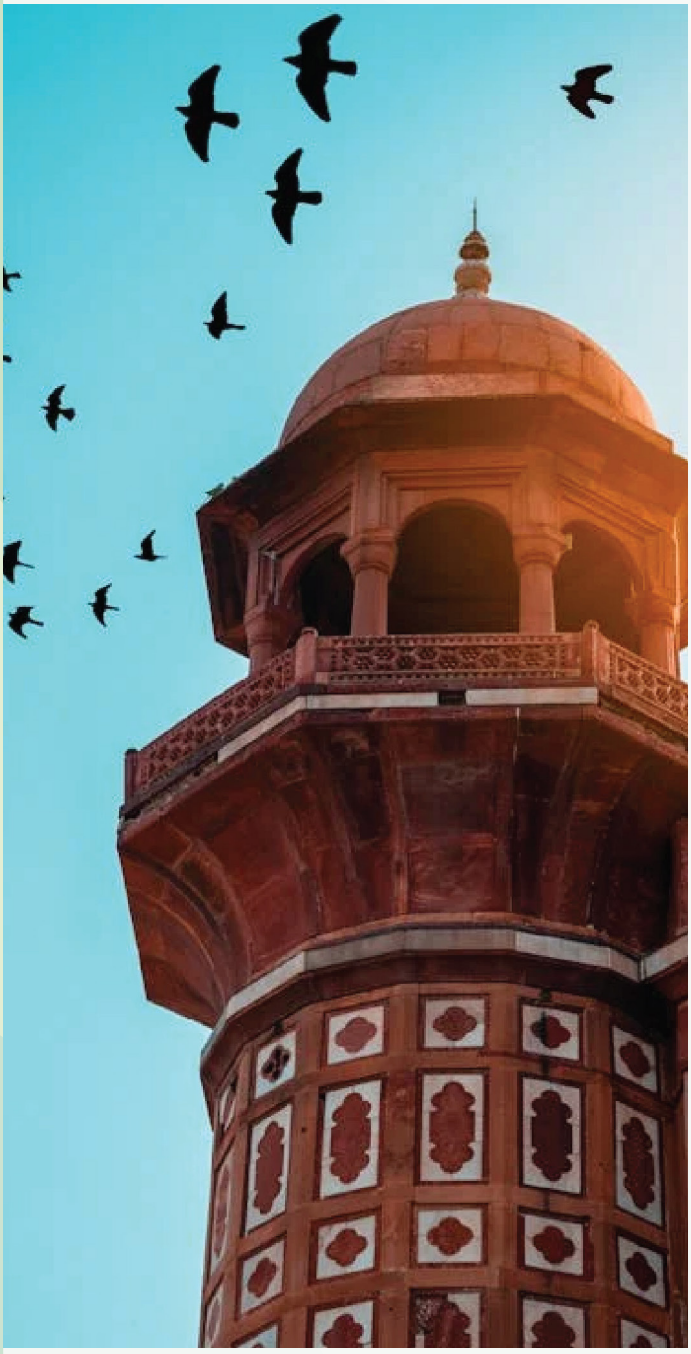

ঘটনা ছিল ভিন্নধর্মী ও ব্যতিক্রম।

এ অভিযানের ফলে মুসলিমরা যা অর্জন করেছিল তার কোনো তুলনা হয় না। এ বিজয়টি ছিল এমন একজন ব্যক্তিত্বের স্বমহিমায় নিজ জন্মভূমিতে ফিরে আসা– যাকে কয়েক বছর আগে তার নিজের এলাকা থেকেই বের করে দেয়া হয়েছিল। তার মাথার বিনিময়ে চড়া মূল্যও ঘোষণা করা হয়েছিল। বাধ্য হয়ে তিনি কোথাও গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং সেখানে নিজের পায়ের নীচে মাটি শক্ত করেই দাঁড়াতে পেরেছিলেন। সেখানে তিনি শক্তি অর্জন করেন এবং একটা সময়ে নিজ জন্মভূমির আশপাশের এলাকায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

রাসুল (সা.) মক্কাকে ইসলামের ভিত্তিমূল হিসেবে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। কারণ এ শহরেই প্রাচীন সে পবিত্র ঘর আছে যা এক আল্লাহর ইবাদতের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। আর রাসুল (সা.), তার সাহাবাগণ এবং পরবর্তী সময়ের নেককারদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে শহরটি আজও ইসলামের ভিত্তিমূল হিসেবেই রয়ে গেছে। মুসলিমদের যাবতীয় ইবাদতের কেন্দ্র এ পবিত্র নগরী। এখানে আজও মুসলিমরা নিরাপত্তা ও স্বস্তি অনুভব করে। মক্কাকে ইসলামের সূতিকাগার করার প্রয়োজনীয়তা ছিল। কারণ ঐতিহাসিকভাবেই মক্কার একটি ভূমিকা আছে আর ইসলামের সে গৌরবজ্জ্বল অতীতের সাথে বর্তমান ও অনাগত সময়ের মুসলিমদের মধ্যেও একটি সম্পর্ক স্থাপন করা জরুরি। আবার মক্কার দিক থেকে যদি চিন্তা করা যায়, মক্কা অমুসলিম বা পৌত্তলিকদের হাতে থাকবে– এটাও কোনোভাবে মক্কার শান ও ইজ্জতের সাথে যায় না।

এসব বিষয়কে বিবেচনায় রেখেই রাসুল (সা.) তার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারন করেন এবং সে আলোকেই তিনি অগ্রসর হন। তিনি এও উপলব্ধি করেন যে, আল্লাহ তার হাত দিয়ে মক্কার বিজয় দেখতে চান, তবে তা সামরিক যুদ্ধ বা রক্তপাতের ভেতর দিয়েও নয়। মক্কা বিজয়ের বছর দুয়েক আগে রাসুল (সা.) যখন কুরাইশদের সাথে হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তিতে সম্মত হন, তখনই মুসলিমরা অনুধাবন করতে পারেন যে, রাসুল (সা.) প্রতিটি পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত আল্লাহর নির্দেশনার আলোকেই নিয়ে থাকেন। এরপরও মুসলিমদেরকে আরো বেশি নিশ্চিন্ত করার জন্য হুদাইবিয়ার ঘটনার পরপরই আল্লাহ তাদেরকে জানিয়ে দেন, যদি কখনো কুরাইশদের সাথে তাদের যুদ্ধ হয় তাহলে তাদের জন্য বিজয় নিশ্চিত। হুদাইবিয়ার ঘটনাবলী যে সুরায় বিবৃত হয়েছে, সেই সুরা ফাতহতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

"যদি কাফেররা তোমাদের মোকাবেলা করত, তবে অবশ্যই তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করত। তখন তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেত না।" (সুরা ফাতহ : আয়াত ২২)।

আল্লাহ পাক এর মাধ্যমে বুঝিয়ে দেন যে, হুদাইবিয়ার সময়ও যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে তখনো মক্কার পতন মুসলিমদের হাতে ঘটাতে পারতেন। কিন্তু মুসলিমরা সে দাবি তুলেইনি। মুসলিমরা শুধু কাবাঘরে তাওয়াফ ও ইবাদত করতে চেয়েছিল। যদি মুসলিমরা তখন মক্কা জয়ের চেষ্টা করতো তাহলে কুরাইশরা অবধারিতভাবে তাদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করতো। আর উভয় পক্ষের মাঝে সংঘাত ও রক্তপাত অনিবার্য হয়ে উঠতো। আর তেমনটা হলে পূর্ণাঙ্গভাবে মক্কার পতনও হতো না। এ কারণেই আল্লাহ মুশরিকদেরকে আরও দু'বছর মক্কার নেতৃত্বে থাকার সুযোগ দিলেন যাতে সর্বোত্তম ফলাফল পাওয়া যায় এবং চূড়ান্ত ও স্থায়ীভাবে পবিত্র নগরীটি মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পরও রমাদান মাস কেন্দ্রিক মুসলিমদের এই বিজয় অব্যাহত থাকে। ৬৩৬ সালে কাদিসিয়ার

যুদ্ধে মুসলিমরা তৎকালীন সময়ের সুপার পাওয়ার সাসানিদদের পরাজিত করে। মুসলিম সেনাপতি সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) এ যুদ্ধে অনন্য এই গৌরব অর্জন করেন। এর আগে প্রায় ৪শ বছর দুই পরাশক্তি রোমান-পারস্য নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করেছিল। কেউ কাউকে হারাতে পারেনি। অথচ মুসলিমরা এ সমীকরণের বাইরে থেকে এসে সাসানিদদেরকে পরাজিত করে। যার মাধ্যমে পারস্য সাম্রাজ্যের পতনের দুয়ারও উম্মোচিত হয়। কাদিসিয়ার এই যুদ্ধটি হয়েছিল রমাদান মাসের শুরুর ঠিক পূর্বক্ষণে।

এর কয়েক বছর পরের কথা। খলিফা উমর (রা.) তখন দায়িত্বে। মুসলিমরা মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় যুদ্ধে সফলতা পাচ্ছিলো না। আলেকজান্দ্রিয়া এবং ব্যাবিলনীয় নামক দুটো দুর্ভেদ্য দুর্গ মুসলিমরা কোনোভাবেই জয় করতে পারছিল না। আমর ইবনুল আস (রা.) নেতৃত্বাধীন বাহিনীকে হযরত উমর (রা.) বারবার সেনা সহযোগিতা দেয়ার পরও তিনি কাঙ্ক্ষিত সফলতা না পাওয়ায় একটা পর্যায়ে সেখানে হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়ামকে (রা.) পাঠানো হয়। এর পর মুসলিম বাহিনী আলেকজান্দ্রিয়া তথা গোটা মিশরকে পরাভূত করতে সক্ষম হয়। এই বিজয়টাও এসেছিল রমাদান মাসে।

এর কয়েক দশক পরের কথা। তখন উমাইয়া শাসন চলছিল। উমাইয়া সেনাপতি তারেক ইবনে জিয়াদ হিজরী ৯৩ সালের রমাদান মাসের ২৫ তারিখ ভিজিগথিক সাম্রাজ্যের রাজা রডারেককে পরাজিত করে স্পেন জয় করেন। মুসলিম স্পেনকে বলা হতো আন্দালুস। আন্দালুস মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম সভ্যতার নাম। এত বেশি বিদ্বান, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসাবিদ মানব ইতিহাসে আর কোনো সভ্যতা উপহার দিতে পারেনি। তারেক বিন জিয়াদের এই বিজয়যাত্রা ইউরোপ জুড়ে বিস্তৃত হতে হতে ফ্রান্স অবধি পৌঁছে গিয়েছিল।

এর ঠিক এক বছর পর হিজরী ৯৪ সালে উমাইয়া সেনাপতি মুহাম্মাদ বিন কাসেম সিন্ধের রাজা দাহরকে পরাজিত করে সিন্ধ জয় করেন। আজকের পাকিস্তান ও ভারতবর্ষের বিরাট এলাকা মুসলিমদের হাতে চলে আসে। যুদ্ধটি হয়েছিল মাকরান নামক অঞ্চলে যা করাচি থেকে ২৫০ কিলোমিটার দূরে। এশিয়ার এই অঞ্চলে ইসলাম আগমনের এই ঐতিহাসিক বিজয়টিও হয়েছিল রমাদান মাসেই।

৫৮৩ হিজরী সালে (১১৮৭ সালে) সালাউদ্দিন আইউবি ক্রুসেডারদেরকে পরাজিত করে জেরুজালেমকে আবার মুসলিমদের হাতে ফিরিয়ে আনেন। ক্রুসেডাররা জেরুজালেমে যে অমানবিক গণহত্যা চালিয়েছিল। মুসলিম, ইহুদি এবং অসংখ্য আরব বংশোদ্ভুত খৃস্টানও সেদিন হত্যা হয়েছিল। বলা হয়, ক্রুসেডারদের হাতে এত বেশি সংখ্যক মুসলিম নিহত হয়েছিল যে, জেরুজালেমের শহরের রাস্তাঘাট হাঁটু পর্যন্ত রক্তে ভরে গিয়েছিল। ক্রুসেডাররা ৯০ বছর জেরুজালেম দখলে রাখার পর ৫৮৩ সালের রমাদান মাসে সালাউদ্দিন আইউবি আবারও জেরুজালেম ও বায়তুল মাকদিসকে মুক্ত করেন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, মুসলিমরা যেদিন জেরুজালেমে যুদ্ধের জন্য যাবে, তার আগের দিন বেজোড় রাত ছিল। সালাউদ্দিন আইউবির নেতৃত্বে মুসলিমরা সারারাত তারাবিহ ও কিয়ামুল লাইল পড়ে বায়তুল মাকদিসকে মুক্ত করার জন্য আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে সাহায্য কামনা করেছিল। এই মানুষগুলোর ঈমান ও আমল এতটাই উন্নত ছিল যে, আল্লাহ তাদের দুয়া কবুল করে নিয়েছিলেন এবং পরের দিন তাদেরকে উত্তম বিজয় দান করেছিলেন।

এখানে উল্লেখ্য, সালাউদ্দিন জেরুজালেম জয় করার পর সবাইকে নির্দেশনা জারি করেছিলেন যাতে খৃস্টানদের মতো বর্বরতা তারা না করেন। একজন খৃস্টানও যেন হত্যার শিকার না হয়। বরং সবাইকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। রাসুলের (সা.) মক্কা বিজয়ের ক্ষমার ঐতিহাসিক ঘটনার ইতিহাস সালাউদ্দিন আইউবির হাত দিয়ে আবারও পুনরাবৃত্তি হয়।

আইন জালুতের যুদ্ধ ১২৬০ সালের ৩ সেপ্টেম্বর সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধটি হয়েছিল আজকের সময়ের ইসরাইলে মামলুক ও মঙ্গোলদের মধ্যে। আইন জালুত যুদ্ধের বছর কয়েক আগে এই মঙ্গোলদের হাতেই আব্বাসীয় খেলাফতের রাজধানী বাগদাদের পতন ঘটেছিল। বাগদাদ ধ্বংসের ফলে কয়েক শতাব্দী প্রাচীন আব্বাসীয় খিলাফত ধ্বংস হয়ে যায়। বাগদাদে দারুল হিকমাহ ধ্বংস করা হয়। হাজার হাজার মুসলিমদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়। ফোরাত নদী বইয়ের কালি আর মুসলিমদের রক্তে ভরে গিয়েছিল।

মুসলিমরা তখন ভেবেছিল বোধহয় কেয়ামত এসে গেছে। অনেকেই চেঙ্গিস ও হালাকু খানকে রীতিমতো দাজ্জাল ও ইয়াজিজ মাজুজ মনে করেছিল। মঙ্গোলদের হাতে এরপর দামেস্কের আইয়ুবীয়দের পতন হয়। হালাকু খান দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে মামলুক সালতানাত জয় করার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু আইন জালুতের যুদ্ধে মুসলিম মামলুক কাছে শোচনীয় পরাজয়ের ফলে মঙ্গোলদের সাম্রাজ্য বিস্তার থেমে যায়। অথচ মামলুকদের জন্ম হয়েছিল ক্রীতদাস শ্রেণি থেকে। ভয়ংকর দুর্ধষ ও অপ্রতিরোধ্য মঙ্গোলদের শক্তিকে আল্লাহ তায়ালা এই মামলুকদেরকে মাধ্যমেই ধরাশায়ী করেছিলেন। এই শ্রেণির উত্থান ও শক্তিমান হয়ে ওঠার মধ্যেও আল্লাহ তায়ালার বড়ো একটি শিক্ষা রয়েছে। এই ঐতিহাসিক বিজয় হয়েছিল ৬৫৮ হিজরীর (ইংরেজি ১২৬০ সাল) ২৫ রমাদান।

রমাদান মাস তাকওয়া অর্জনের মাস। আত্মশুদ্ধির মাস। এভাবেই আমরা এই পবিত্র মাসটিকে চিনি। কিন্তু মুসলিম ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়– এ মাসটি একইসাথে ছিল বিজয়ের মাস। এই মাস ইসলামের ইজ্জত ও সম্মান প্রতিষ্ঠার মাস। যতদিন মুসলিমরা উন্নত মানে ছিল, রোজার গুরুত্ব অনুধাবন করেছিল ততদিন আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দিয়েছিলেন। অথচ আমরা এখন অন্যায়ের বিরুদ্ধে জয় লাভ করা তো দূরের কথা, নিজেদের প্রবৃত্তি আর মনের গহীনে থাকা পাপের বিরুদ্ধেও জয় অর্জন করতে পারছি না। রাসুলে করিম (সা.) সাহাবায়ে আজমাইন, তাবেয়ী, আর সালাফগন রমাদান মাসে ইসলামের সম্মান রক্ষায় ঝাপিয়ে পড়েছিলেন। তারা আল্লাহর সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়তে পেরেছিলেন। তাকওয়া আর তাওহিদের চেতনায় সমৃদ্ধ হয়েছিলেন। তাই তারা অসাধ্যকে সাধন করতে পেরেছিলেন। ছোটখাটো প্রতিপক্ষ নয়, তৎকালীন সুপারপাওয়ারদেরকেও তারা পরাজিত করতে পেরেছিলেন।

আল্লাহ আমাদেরকে রমাদান মাসের গুরুত্ব, ফজিলত ও বরকত অনুধাবন করার ও হাসিল করার তাওফিক দিন। আমিন।

লেখক : বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও অনুবাদক।

মিযান-২

মো. সারওয়ার কবির শামীম

জনমানুষ দ্বীন শিক্ষার অভাবে কোনো একটি দিকে বা বিষয়ে হেলে পড়ে জীবনের ভারসাম্য নষ্ট করে। জীবনের অপর কোনো দিক উপেক্ষা করাই হয় এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ফলাফল। তাই আমাদের মহান রব আমাদের পুরো সৃষ্টিজগৎ হতে শিক্ষা নেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন। পুরো সৃষ্টিজগতে "ভারসাম্য" সবচাইতে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মিযান-১ হতে আমরা এর বিস্তারিত জানতে পারি। এখন আমরা আমাদের জীবনে কীভাবে ভারসাম্য নষ্ট হয় তা দেখে নিবো। আমরা আরও দেখবো ভারসাম্য নষ্টের মাধ্যমে আমরা কত বড়ো ক্ষতির সম্মুখীন হই।

এক. স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক

মানবজীবনে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্য বিষয় হলো স্রষ্টার সাথে মানুষের ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক। এ সম্পর্ক মানবজীবনের মৌলিক বিষয়াদিকে সর্বতোভাবে প্রভাবিত করবে। মানুষ তার সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্রষ্টার অস্তিত্ব, ক্ষমতা, ক্ষমা, দয়া, নিরাপত্তা, ইত্যাদির স্পর্শ অনুভব করতে হবে। সুখ, দুঃখ, প্রাপ্তি, হারানো সর্ব ক্ষেত্রে সে নিজেকে তার একমাত্র প্রভুর সান্নিধ্য অনুভব করতে হবে। আর এর সবই সম্ভব যদি মানুষ তার প্রভুর সাথে একটি কার্যকর ও ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়। এবং তার জন্য লালায়িত ও চিন্তিত থাকে। স্রষ্টার সাথে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্কের অভাবে মানুষের সকল কর্ম ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেমন :

১. নিয়তের উপর কর্মের ফলাফল নির্ভরশীল। স্রষ্টার সাথে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক না থাকলে তার নিয়তে ক্ষতিকর উপাদান প্রভাব সৃষ্টি করবে। ফলে তার বহু সৎকর্ম তাকে প্রকৃত কোনো বিনিময় দিতে ব্যর্থ হবে।

২. ব্যক্তি তার স্রষ্টা সম্পর্কে কম জানবে। ফলে সে জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তালগোল পাকিয়ে জীবনকে উদ্দেশ্যহীন তরির মত সাগরে ভাসিয়ে নেবে, কোনো কূলকিনারা পাবে না।

৩. ছোট কাজকে বড়ো মনে করবে, আর বড়ো কাজকে ছোট মনে করবে।

৪. কম গুরুত্বপূর্ণ কাজে মনোযোগ ও আনন্দ পাবে, বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজে অনাগ্রহ।

৫. নিজের নফস, খায়েশ, হুইম, পছন্দ ইত্যাদির দাসে পরিণত হবে। আল্লাহর সাথে সম্পর্কে ভারসাম্য আনতে হলে জ্ঞানার্জনে উৎসাহ-উদ্দীপনাকে প্রাধান্য দিতে হবে। অতঃপর তৃষ্ণার্ত মন নিয়ে সঠিক পথ জানা-বুঝার জন্য আল-কুরআন নিয়মিত অধ্যয়ন করতে হবে। আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে হবে। কুরআনের শব্দ, আয়াত, বিষয়, কিসসা হতে সমস্যার জীবনমুখী সমাধান খুঁজতে হবে। আল্লাহ যেসব বিষয় উৎসাহিত করেছেন, যা তিনি ভালোবাসেন, যা তিনি পছন্দ করেন না– এ তালিকার প্রতি আগ্রহ নিয়ে সে অনুযায়ী সাধ্যমত কর্মতৎপর হতে হবে। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ভারসাম্যপূর্ণ করণে এ হলো ন্যূনতম কর্ম। এর কোনোটি যদি বাদ যায় তাহলে সম্পর্কে ভারসাম্য নষ্ট হবে।

ভারসাম্য ভঙ্গে প্রভাবক

মানুষকে তার স্রষ্টা এ দুনিয়ার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব (ইসতি'মার) দিয়ে পাঠিয়েছেন। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যাবতীয় উপায়-উপাদান সরবরাহ করেছেন। সকল সৃষ্টিকে সে রক্ষণাবেক্ষণের কাজে মানুষের অনুগত বানিয়েছেন। মানুষের সাথে কথোপকথনে মহান আল্লাহর প্রথম নির্দেশে সে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন (দাসত্ব ২ : ২১)। মানুষ যদি তার যাবতীয় তৎপরতায় সে দায়িত্ব কর্তব্যের কথা না বুঝে, ভুলে যায়, তা পালনে গাফলতি করে, সে কাজকে কম গুরুত্ব দেয় কিংবা অবহেলা করে তাহলে সে ভারসাম্য ভঙ্গে সবচাইতে বড়ো পদক্ষেপ নিল।

আল্লাহর সাথে সম্পর্কে ভারসাম্য আনতে হলে জ্ঞানার্জনে উৎসাহ-উদ্দীপনাকে প্রাধান্য দিতে হবে। অতঃপর তৃষ্ণার্ত মন নিয়ে সঠিক পথ জানা-বুঝার জন্য আল-কুরআন নিয়মিত অধ্যয়ন করতে হবে। আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে হবে।

ভারসাম্য ভঙ্গের চিহ্নস্বরূপ ব্যক্তি

১.সালাতে আগ্রহী হবে কিন্তু সালাতের উদ্দেশ্য ও এর কাঙ্ক্ষিত ফল কী (২৯ : ৪৫) তা জানতে বা অর্জনে কার্যকর কোনো আগ্রহ অনুভব করবে না।

২.মসজিদের উন্নতিতে সময় ও শ্রম দানে আনন্দ পাবে কিন্তু মানবোন্নয়নে কোনো আগ্রহ বা উৎসাহ অনুভব করবে না।

৩.ব্যবসায়িক উন্নতিতে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ইয়াতিমখানায় বস্তায় বস্তায় চাল পাঠাবে কিন্তু ব্যবসায়িক সততার বিষয়টি তার নিকট অস্বস্তিকর মনে হবে।

৪.ফ্যাক্টরি স্থাপন করে এলাকার লোকদের চাকুরি দিয়ে আমলে সালেহার আনন্দ অনুভব করবে কিন্তু এ ফ্যাক্টরির দূষিত কেমিক্যাল যে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যহানী ঘটাচ্ছে সে দিকে চোখ কানা রাখতে প্রচেষ্টা চালাবে।

৫.একের পর এক উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে আনন্দে ঘনঘন ওমরাহ করবে কিন্তু নিকটাত্মীয়দের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, নিরাপত্তার মত মৌলিক বিষয়াদির উন্নতিতে আগ্রহ থাকবে না।

৬.হাজার-হাজার ছাত্রকে বুখারি পড়িয়ে তৃপ্তি পাবে, লক্ষজনতার সমাবেশে ওয়াজ করে আনন্দিত হবে কিন্তু যুগের পরিবর্তনে জনতার নিত্যনতুন সমস্যার সমাধান কুরআন গবেষণার মাধ্যমে বের করার কাজে সামান্যতম উৎসাহ পাবে না।

৭.মসজিদে আল্লাহর দাস হবে আর মসজিদের বাইরে সকলকে নিজের দাস বানাতে কৌশল খাটাবে, উপায় খুঁজবে, সফলতায় তৃপ্তি পাবে।

৮.সালাতে আল্লাহর দাসত্ব করবে কিন্তু অন্যত্র নিজের শখের দাস হবে, লাইকের দাস হবে, গেজেটের দাস হবে, অ্যাপার্টমেন্টের দাস হবে, ক্যাশের দাস হবে, পদের-সম্মানের-জমির, সভাপতি-আসনের দাস হবে।

৯.মুসলিম পরিচয়ে আগ্রহ কমে বিভক্তিমূলক পরিচয়ে আগ্রহী হবে। তাতে ব্যবহৃত হবে– সাইন-সিম্বল, সুন্নত-নফল, বিশেষ আমল, সংখ্যা বিতর্ক ইত্যাদি।

১০.বড়ো মুফতি-শায়খ-মুহাদ্দিস-মুফাসসির হয়ে জ্ঞানের খৈ ফুটাবে কিন্তু দ্বীনের গভীর সমাজ লাভে অক্ষম হবে। দ্রুত ফতোয়া দানে উৎসাহ পাবে কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান ঢেকে রাখবে। জনতার যে বিষয়গুলো জানা ও মানা জরুরি তা নয়, জনতা যা চায় তা দিয়ে আনন্দ পাবে।

দুই. সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক

প্রথম কাজে অর্থাৎ আল্লাহর সাথে সম্পর্কে ভারসাম্য আনায়নের পর ক্রমধারায় দ্বিতীয় যে ভারসাম্য নিশ্চিত করতে হবে : সর্বদা, সর্বক্ষেত্রে সৃষ্টির সাথে সম্পর্কে ভারসাম্য বজায় রাখা। আমরা ধরে নিবো ব্যক্তি প্রথম কাজে ভারসাম্য আনয়নে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাতে আগ্রহী হয়ে দ্বিতীয়টিতে নজর দিবেন।

ভারসাম্য রক্ষার পরিধি–১ : নিজ পরিবার, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন সহ যার সাথে মেলামেশা, লেনদেন, আলাপ-আলোচনা, সামাজিকতা, ব্যবসা ইত্যাদি সম্পন্ন হবে– সবাই। অর্থাৎ সকলের সাথে ভারসাম্যমূলক আচরণের বিষয়টি তীক্ষ্ম নজরে রাখতে হবে। কোথাও ভারসাম্যে ব্যাঘাত ঘটলে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে ভারাসাম্য মেরামত করে নিতে হবে।

যেভাবে ভারসাম্য নষ্ট হয় : অধিকার আটকে রাখলে, পাওনা ধরে রাখলে, সত্য গোপন কিংবা বিকৃত করলে, ক্ষমতা দেখিয়ে অন্যায় প্রভাব সৃষ্টি করলে, খারাপ কাজে প্ররোচিত বা বাধ্য করলে, অসৎ কাজে জোট বাধলে বা সহযোগিতা করলে ভারসাম্য নষ্ট হবেই হবে।

সম্ভাব্য কর্ম–১ : পিতা তার দ্বিতীয় সন্তানকে অপর সন্তানদের উপর অগ্রাধিকার দেন। তিনি সবার জন্য একটি উপহার কিনলেন কিন্তু দ্বিতীয় জনকে একাধিক উপহার দেন। সম্পদ বণ্টনের বিষয়ে ছেলে সন্তানদের অগ্রাধিকার দেন। মেয়ে সন্তানদের কম দেন কিংবা মনে করেন যে, মেয়ে তো পরের ঘরে চলে যাবে। কিংবা পিতা এমন পরিবেশ তৈরি করেন যাতে মেয়ে বলতে বাধ্য হয়; আমাদের অনেক আছে। লাগবে না, আমার ভাইদের দিয়ে দেন। এভাবে ভারসাম্য নষ্টের বীজ বপন করা হয়।

সম্ভাব্য কর্ম–২ : কর্মচারীকে যেদিন মাসিক বেতন দেওয়ার চুক্তি হয়েছিল সে চুক্তি না মেনে নিয়োগকর্তা ইচ্ছামত দেরি করে বেতন দেন। কেন? কারণ তিনি নতুন আরেকটি প্রজেক্টে হাতে নিয়েছেন কিংবা তার প্রিয়তমা স্ত্রী একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুল খুলতে যাচ্ছেন। সব অর্থ সেখানে বিনিয়োগ করেছেন। পরিণতিতে বহু কর্মচারী/ কর্মকর্তার জীবনে বিশৃঙ্খলা নেমে আসে এবং ভারসাম্য নষ্ট হয়।

সম্ভাব্য কর্ম–৩ : আপনি অর্থ ধার করে ওয়াদামত সময়ে তা পরিশোধ করলেন না। কারণ? গড়িমসি, নিয়তে নাপাকি, ঘোরানোর ইচ্ছা। এতে পরস্পর বিশ্বাস ওঠে যায়। উন্নতি অগ্রগতি থেমে যায়। ফলে বিশ্বাসের ভারসাম্য নষ্ট হয়। সমাজে বসবাসরত নিকটজনদের মধ্যে অস্থিশীলতা দেখা দেয়।

ভারসাম্য রক্ষার পরিধি–২ :

যাদেরকে আল্লাহ মানুষের সার্ভিসে নিয়োজিত করেছেন তাদের সাথে আচরণে, কর্মে, রূপে, সৌন্দর্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। মধ্যাকর্ষণ শক্তি, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, গ্যালাক্সি, অরোরা, শুটিং স্টার, বায়ুমণ্ডলীয় স্তর সমূহ, ম্যাগনেটিক ফিল্ড, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, গাছপালা-উদ্ভিদ, মেঘ-পানি-বৃষ্টি, সাগর, মাছ ইত্যাদি।

যেভাবে ভারসাম্য নষ্ট হয় : সৃষ্টি দেখে অভিভূত হয়ে স্রষ্টাকে ভুলে গেলে। সৃষ্টির মধ্যকার শক্তি দেখে শক্তির মূল উৎস আল্লাহকে ভুলে সৃষ্টিকে রক্ষাকারী, উদ্ধারকারী মনে করলে। সৃষ্টির রূপে ও ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে স্রষ্টাকে ভুলে সৃষ্টির গুণগান গাইলে। যে সকল সৃষ্টি মানুষের কাছাকাছি থেকে সরাসরি সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে সেসবের অপচয় করলে, সেসবকে কষ্ট দিলে, অযথা হত্যা করলে, পুড়িয়ে দিলে, অপব্যবহার করলে, পিষিয়ে মারলে, অযথা তাদের ক্ষতি করলে। সকল কিছুর জন্য স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করলে, তাঁর প্রশংসা না করলে।

সম্ভাব্য কর্ম- ১ : বিশালাকৃতির পাহাড় দেখে অভিভূত হয়ে যদি আমি একে শক্তির উৎস মনে করি, পাহাড় কিছু করতে পারবে– মনে এ ধরনের চিন্তা লালন করি তাহলে ভারসাম্য নষ্ট হবে। তদ্রুপ সূর্য, চন্দ্র, বড়ো গাছ ইত্যাদি কোনো কিছুর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে, এর বিশালতা জেনে যদি সে সবকে কোনো কৃতিত্ব দেই, শক্তি বা গুণের উৎস মনে করি তাহলে চিন্তাজগতে ভারসাম্য নষ্ট হবে।

সম্ভাব্য কর্ম- ২ : পরিবেশ ও জলবায়ুর উপর সরাসরি বা পরোক্ষ আঘাত আসবে এমন কোনো কাজ করতে থাকলে ভারসাম্য ভেঙে পড়বে। জমিতে সর্বদা অত্যধিক কীটনাশক ব্যবহার করলে পরিবেশের উপর ব্যাপক দুর্যোগ নেমে আসবে। পুরো এলাকার মাটি, পানি, পশু, কীট-পতঙ্গ, গাছ, উদ্ভিদ-লতাপাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ভারসাম্যের ব্যাপক ক্ষতি করবে। চূড়ান্ত ক্ষতি হবে আল্লাহর প্রিয় সৃষ্টি মানুষের।

সম্ভাব্য কর্ম- ৩ : অদ্ভুত প্রাণী, আজব গাছপালা কিংবা উদ্ভিদ বা কীট-পতঙ্গ– তাদের ক্ষমতা, রূপ ও আকর্ষণ (Koala, Sloth, Shrew, Dolphin, Friesian Horse, Narwhale, Welwitschia) দেখে কিংবা কোনো স্থানের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যদি তাদের স্রষ্টার প্রশংসা করা না হয়, অথবা মানুষের আকৃতি বা কর্মক্ষমতা দেখে স্রষ্টার প্রশংসা না করে সৃষ্টির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলে বিশ্বাস ও চিন্তাজগত নীরবে কলুষিত হয়। এ সবের প্রভাবে চিন্তাজগতের নৈরাজ্য লাফিয়ে লাফিয়ে ঊর্ধ্বমুখী হয়। যার প্রভাবে ব্যক্তির কর্ম দ্বারা সর্বত্র ভারসাম্য নষ্ট হয়।

তিন. দ্বীন–দুনিয়া সম্পর্ক

আল্লাহর সাথে ও আল্লাহর সৃষ্টির সাথে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার পর নজর দিতে হবে দ্বীন-দুনিয়ার ভারসাম্যে। বিভ্রান্তি ও হ-য-ব-র-ল অবস্থা বিবেচনায় দ্বীন-দুনিয়া সবচাইতে বিপজ্জনক ও বিশৃঙ্খল অবস্থায় রয়েছে। জ্ঞান-জগতে বৃহৎ বিভ্রান্তির একটি হলো দ্বীন-দুনিয়া সম্পর্ক বিভ্রান্তি। যারা এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান দিতে পারতো তারাই স্বয়ং ব্যাপক বিভ্রান্তির শিকার। ফলে জনতা দ্বীন অনুসরণে সীমাহীন বিশৃঙ্খলার মধ্যে দুনিয়া যাপন করছে। যে দুনিয়ায় ব্যর্থ সে দ্বীনেও ব্যর্থ। দ্বীনে সফলতার সাথে দুনিয়ার সফলতা অবিচ্ছেদ্য। এটি বুঝার জন্য ওহির জ্ঞান অপরিহার্য। জনতাকে সে জ্ঞান কে দেবে? কে জ্ঞানার্জনের আগ্রহ ইগনাইট করবে? কে উদ্যোগ নেবে, কে এগিয়ে আসবে? কে জনতাকে মিযান বা ভারসাম্যের তীব্র প্রয়োজন বুঝাবে? কে সে ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা ও অর্থনীতি প্রণয়নে ব্যবস্থা নেবে?

ভারসাম্য রক্ষার পরিধি : আনুষ্ঠানিক ইবাদাহ, আমলে সালিহা, সুন্নাহ-নফল পালন। ধর্মীয় জীবন, ধর্মপালন, ইবাদাত বান্দেগী। কুরআন তিলাওয়াত, তাযোয়ীদ শিক্ষা, কুরআন হিফয, আরবি শিক্ষা কোর্স, ওমরী কাদা ও তাহাজ্জুদ আদায়, নফল রোজা পালন, তারাবি আদায়, ওয়াজ শুনা, হুজুরের অনুসরণ ইত্যাদি। বিষয়টি অতি সূক্ষ্ম। শুদ্ধ-অশুদ্ধ পার্থক্য কঠিন। আদয়্যুন মুবিন শয়তান সর্বদা তার স্বার্থ উদ্ধারে ঘাপটি মেরে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। ঈমানদারের সকল কল্যাণমূলক ও ভাল তৎপরতায় তার ভাগটি যে নিশ্চিত করতেই হবে!

যেভাবে ভারসাম্য নষ্ট হয় : কুরআনের জ্ঞানহীন ধর্মপালনে ব্যক্তির হুইম অর্থাৎ যা ভাল লাগে তাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। অগ্রাধিকারযোগ্য, জরুরি, কমগুরুত্বপূর্ণ, গুরুত্বহীন ইত্যাদির মধ্যে তালগোল পাকিয়ে হ-য-ব-র-ল অবস্থা সৃষ্টি হয়। ফলে যাকে সে ইবাদাত মনে করে তা তার কাজে আসে না। জীবনের সাথে সামঞ্জস্যতা থাকে না ধর্মের। দ্বীন-দুনিয়া ভারসাম্যহীন হয়। পরিণতিতে উভয় পাড়ে ক্ষতি।

সম্ভাব্য কর্ম–১ : ব্যক্তি হঠাৎ কুরআন হিফয করা শুরু করে– যা অতি উচ্চমানের কাজ। হঠাৎ তাযোয়ীদে পাক্কা হওয়ার জন্য খুব ডিসিপ্লিন অনুসরণ করে। সপ্তাহে তিন বা দুই দিন হুজুর রেখে বেশ সময়দান করে কুরআন তিলাওয়াতে পারফেক্ট হতে চেষ্টা করে– যা উঁচু মানের কাজ। হঠাৎ সে আরবি ভাষা শিক্ষা কোর্সে সাইন আপ করে– যা অতি ভাল কাজ। গভীর রাতে কোনো নামী-দামী ওস্তাদের সাথে কিংবা নামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনলাইনে ক্লাস করে। এর পেছনে প্রতি সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা ব্যয় করে। এর সবই উত্তমকাজ। কিন্তু সব কাজ সবার জন্য উত্তম নয়। কর্ম হতে ফল আহরণের জন্য কাজের সময়ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উপরিউক্ত কর্মে ভারসাম্য নষ্ট হবে যদি ব্যক্তি কুরআনের জ্ঞান অর্জন না করে ঐসব কাজে বেশি মনোযোগী হন। ৬০ বা ৭০-উর্ধ্ব বয়সের ব্যক্তি জীবনে কোনোদিন কুরআনের তাফসির বা অনুবাদ পড়েননি। এখন হঠাৎ তার মাথায় ঢুকেছে, তিনি আরবি ভাষা শিখবেন কিংবা হাফিজ হবেন– তার এ কর্ম তথা আমলে তার দ্বীন পালনে ভারসাম্য নষ্ট হবে। তার উচিত দ্রুত আল্লাহ ঘোষিত বড়ো গুনাহ ও বড়ো ভাল কাজের তালিকা তৈরি করা। আল্লাহর নির্দেশ, নিষেধ, উপদেশ, পছন্দের কাজ, অপছন্দের কাজ ইত্যাদি জেনে নেওয়ার প্রজেক্ট শুরু করা, অনতিবিলম্বে শুরু করা। তা না হলে তার দ্বীন-দুনিয়ার জীবনে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার সর্বোচ্চ আশঙ্কা রয়েছে।

সম্ভাব্য কর্ম–২ : হঠাৎ কোনো নারী/পুরুষ হুজুরের কাছ থেকে কোনো নির্দিষ্ট আমল শুরু করে। ওমরী কাদা, খতমে ইউনুস, দোয়া হাজারী, এ দোয়া সে দোয়া, সুরা তিলাওয়াত, বিশেষ পদ্ধতির জিকির ইত্যাদি ধরনের আমলে পরিশ্রমী হয়। হঠাৎ তাহাজ্জুদে খুব নিয়মিত হয়ে প্রতি রাতে আল্লাহর নিকট কান্না-কাটি করে। এতে দৈনন্দিন জীবনের সাথে তার একটি বিভাজন তৈরি হয়ে ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। সমাজে চলমান অনৈতিকতার সয়লাব, নারী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি জুলুমের আচরণ, সন্তানদের একটি ভারসাম্যপূর্ণ এডুকেশন, প্রতিবেশীর সাথে সদ্ভাব, দাওয়াতি কাজের বাধ্যবাধকতা বা ফরজিয়াত, নিকটাত্মীয়দের সাহায্য করা, নিজ কমিউনিটির সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সম্ভাব্য কর্ম–৩ : দিনরাত ওয়াজ শুনা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওয়াজ শুনতে থাকা। এতেও দ্বীন-দুনিয়ার তৎপরতায় ভারসাম্য নষ্ট হয়। নিজের অলক্ষে দেহ ও আত্মার ক্ষতি করা হয়। জ্ঞান ও আমলের ভারসাম্য চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মানুষ যত বেশি ওয়াজ শুনবে তত অলস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। তত মানব-বিমুখ হওয়ার, বাস্তবতা এড়িয়ে যাওয়ার, তিক্ত কথা বা পরিস্থিতি হতে পলায়ন করার, বাস্তবতা অস্বীকারের প্রবণতা, কাল্পনিক ও স্বপ্নের জগতে ঘুরে বেড়োনো ইত্যাদি ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

যে জনতা নামাজ বুঝে কিন্তু মিযান বুঝে না, আমানাহকে দু'পয়সার মূল্য দেয় না কিন্তু শাওয়াল-মহররমের রোজায় অতি আগ্রহী, সোমও বৃহস্পতিবার উপবাস থাকে কিন্তু সন্তানদের দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার কোনো জরুরত অনুভব করে না, তারাবি কায়েমে অনড় কিন্তু দলাদলিতে দক্ষ– তাদের রোগ বুঝে ঔষধ কে দেবে?

আমাদের প্রভু আমাদের দুর্বলতা প্রকাশ করে দয়া করেছেন। আমাদেরকে তিনি বারবার আমাদের দুর্বল দিকগুলোর যত্ন নিতে তাগিদ দিয়েছেন।

অধিকাংশ মানুষ শিরক করা ব্যতীত আল্লাহকে বিশ্বাস করে না। (সুরা ইউসুফ : ১০৬)

জনতা কারও দিকে তাকিয়ে থাকা এক বিরাট আহাম্মকী। আমাকে ধরে নিতে হবে– কেউ এগিয়ে আসবে না। আমার স্বার্থ আমাকে রক্ষা করতে হবে। আমার দ্বীন আমাকে বুঝে নিতে হবে এবং তা পালনে পদক্ষেপ নিতে হবে। আমার দুনিয়া, আমার পরকালের হিসাব আমাকেই দিতে হবে।

কেউ যদি বলে : এসব জানার সময় নেই? সে আহাম্মক। খুবই তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যদি সামনে পানি রেখে বলে, আমি ব্যস্ত এবং পানি পান করার সময়ই নেই! পরীক্ষার্থী যদি বলে, আমার পড়ার কোনো অবসর নেই! এ দু'জনকে যদি আহাম্মক, গাধা, স্টুপিড বলা যায়; তাহলে সে ব্যক্তিকে কী বলবো, যার ওহির জ্ঞানার্জনের সময় নেই? একই তকমা বা তার চাইতে ঝাঁজালো কোনো টাইটেল নয় কী?

প্রভু নির্দেশ দিয়েছেন : লা তাতগাওফিল মিযান– ভারসাম্য নষ্ট করো না। দাসগণ জলে-স্থলে সর্বত্র ভারসাম্য (মিযান) ভঙ্গের তীব্র স্রোতে গা ভাসিয়ে দুনিয়াটাকে জাহান্নামের প্রিভিউ বানাবেই– সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হয়ত গুটিকতক সে স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটার চেষ্টা করবে। আল্লাহ তাদের চেষ্টা সহজ করুন। আমিন।

মুসলমানদের সোনালি অতীত
(৩য় পর্ব)

আবু নাঈম মু শহীদুল্লাহ

ঝঞ্ঝাট বিক্ষুব্ধ পরিবেশে ইসলামী নীতির দৃষ্টান্ত

আরবসহ বিশ্বব্যাপী যে অশান্তি বিরাজমান ছিল ইসলামের আগমন ও মুসলিম খেলাফত সম্প্রসারণের মাধ্যমে তা ধীরে ধীরে দূর হতে লাগলো। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.), আমিরুল মোমেনিন হযরত ওমর ফারুক (রা.) এবং হযরত ওসমান (রা.) এর দীর্ঘ সময় ইসলামের দাওয়াত ও খিলাফত সম্প্রসারণে মজলুম মানুষগুলো যেমন আনন্দিত ছিল, তেমনি কিছু মানুষ নানান অজুহাতে অখুশি ছিল। আমিরুল মোমেনিন হযরত ওমর ফারুক (রা.) এবং বিশ্বের প্রভাবশালী মুসলিম খলিফা হযরত ওসমান (রা.) এর মতো পরপর দুজন খলিফার শাহাদাতের পর খিলাফতের দায়িত্বে আসেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা.)। ইসলামের তৃতীয় খলিফার শাহাদাত অনেকেই সহজভাবে নিতে পারেননি। যার ফলে মুসলমানদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সমস্যা দিন দিন আরও বাড়তে থাকে। পুরো খিলাফত জুড়ে ঝঞ্ঝাট বিক্ষুব্ধ পরিবেশ বিরাজমান। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম চ্যালেঞ্জ ছিল হযরত ওসমান (রা.) হত্যার বিচার করা। মুয়াবিয়া (রা.) ঘোষণা দিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর চাচাতো ভাই হযরত ওসমান (রা.) হত্যার বিচার না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি নতুন আমিরের হাতে বায়াত নিবেন না। একদিকে বিক্ষুব্ধ জনগণ অন্যদিকে বিদ্রোহীদের মদিনায় শক্ত অবস্থান। এমতাবস্থায় মুসলমানদের মধ্যে বিরাজমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও অভ্যন্তরীণ সমস্যা দূর করে একটি ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য হযরত আলী (রা.) ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থানান্তর করলেন ইরাকের কুফায় এবং জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন "হে জনগণ! জেনে রেখো নবুয়তের যুগে যে সমস্যায় তোমরা পর্যদুস্ত ছিলে আজ আবার সেই সমস্যাতেই জড়িয়ে পড়লে। তোমাদের মধ্যে একটা ব্যাপক পরিবর্তন ঘটবে। যে সকল মহৎ ব্যক্তিরা এতদিন পিছিয়ে ছিলেন তারা এখন সামনের সারিতে চলে আসবেন।"

তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করছিলেন। সাহাবিদের মধ্য থেকে বারবার হযরত ওসমান (রা.) হত্যার বিচারের দাবি আসছিলো এক পর্যায়ে হযরত আয়েশা (রা.) হযরত তালহা (রা.) ও হযরত যুবাইয়ের (রা.) এর নেতৃত্বে এ দাবি জোরদার হতে লাগলো। যার প্রেক্ষিতে ৬৫৬ সালে বিচার প্রার্থীগণ ইরাকের বসরা নামক স্থানে সমবেত হন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে খলিফার সৈন্য বাহিনীর প্রস্তুতিকালে বয়োবৃদ্ধ সম্মানিত সাহাবিগণের মধ্যস্থতায় বিষয়টি সমঝোতায় পৌঁছাতে সক্ষম হন। কিন্তু উভয় পক্ষের কিছু অতি উৎসাহী সৈন্য বিষয়টিকে যুদ্ধের ময়দানে সমাধান করতে চেয়েছিলেন, যার কারণে জঙ্গে জামাল সংগঠিত হয়। জঙ্গে জামালে বিশিষ্ট সাহাবি হযরত তালহা (রা.) ও হযরত যুবায়ের (রা.) শহীদ হন। অতি উৎসাহী সৈন্যদের উসকানিতে সংগঠিত যুদ্ধে উভয় পক্ষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। উম্মুল মোমেনিন হযরত আয়েশা (রা.) ও হযরত আলী (রা.) অক্ষত অবস্থায় যুদ্ধের ময়দান থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। যুদ্ধে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি দেখে উভয়ের মন ভেঙে যায়। হযরত আয়েশা (রা.) এর নিরাপত্তার জন্য আলী (রা.) একটি নিরাপত্তা বাহিনী প্রস্তুত করে উনাকে মদিনায় পাঠিয়ে দেন। এরপর থেকে উম্মুল মোমেনিন হযরত আয়েশা (রা.) সকল রকম রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। মুসলিম উম্মাহর বিপুল পরিমাণ ক্ষতির পরেও খলিফা হিসাবে হযরত আলী (রা.) নিরাপদে দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। কারণ জঙ্গে জামালের সময় মুয়াবিয়া (রা.) কোনো পক্ষ নেননি। যুদ্ধের পরে তিনি নিজ চাচাতো ভাই হযরত ওসমান (রা.) এর হত্যার বিচারের দাবিতে অনড় ছিলেন। আর অন্য দিকে উম্মাহর

মধ্যে বড়ো ধরনের বিশৃঙ্খলা এড়াতে হযরত আলী (রা.) বিচার বিলম্ব করছেন। বিচার বিলম্বের কারণে মুয়াবিয়া (রা.) বাইয়াতও নেননি সাম্রাজ্য পরিচালনায় কোন সহযোগিতাও করেননি।

যেহেতু মুয়াবিয়া (রা.) আরবের লেভান্ট অঞ্চলের (আধুনিক সিরিয়া, লেবানন, জর্দান, প্যালেস্টাইন) গভর্নর ছিলেন, মুসলিম সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের সাথে সম্পর্কে অটুট রাখতে ৬৫৮ সালে ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে দুই পক্ষের একটা সমোঝোতা বৈঠক হয়। যার মূল লক্ষ্য ছিল মুসলিম সাম্রাজ্যের ভাঙনরোধ এবং নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা।

মুসলিম সাম্রাজ্যের খলিফা হযরত আলী (রা.) ও পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক বিষয়ক দক্ষ চৌকস সাহাবি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর মধ্যে দূরত্ব কমে গেলে মুসলিম উম্মাহ ভাঙনের দ্বারপ্রান্ত থেকে উঠে আবারো ইসলামের পতাকা পতপত করে উড়াবে মুসলিম সেনাপতিরা। কিন্তু বৈঠকে সমোঝোতা না হওয়ায় মতামত আসছে মুসলিম সাম্রাজ্যের ঐক্য ধরে রাখতে দুজনই স্ব-স্ব দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিবেন এবং নতুন খলিফা নির্বাচন করবেন। এ মতের প্রতি আলী (রা.) এর নমনীয়তা দেখে উনার সমর্থকদের মধ্যে থেকে একটি দল বেরিয়ে আসেন এবং চরম সমালোচনা শুরু করেন। যাদেরকে বলা হয় খারেজি বা দলত্যাগকারী। পরবর্তীতে হযরত মুয়াবিয়া নিজে দায়িত্বে বহাল থাকায় হযরত আলী (রা.) তার দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। সমঝোতা বৈঠক খলিফার জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে– হযরত মুয়াবিয়া (রা.) (উমাইয়া বংশের লোক) হযরত আলী (রা.) (হাশেমী বংশের লোক) নতুন করে খারেজিদের উত্থান!

> প্রায় ৪ বছর ৫ মাস খিলাফত পরিচালনাকালে তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তার আলোকে প্রশাসনিক পরিবর্তন, ইসলামী নীতির অনুসরণ অব্যাহত রেখেছেন।

সাম্রাজ্যজুড়ে বিরাজমান পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ৬৫৭ সালে সিফফিনের যুদ্ধে ব্যাপক হতাহতের পর সালিশি সমঝোতা, খারেজি নেতা আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহব আল-রাসেবীর বাহিনীর বিরুদ্ধে ৬৫৮ সালে নাহরাওয়ান যুদ্ধে হযরত আলী (রা.) বিজয়সহ সকল ক্ষেত্রে তিনি বুদ্ধিমত্তা ও ইসলামী নীতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন।

খারেজি উগ্রপন্থীরা দুইজনকেই হত্যার ষড়যন্ত্র করে এবং সিরিয়া ও ইরাকে দুজন আততায়ী প্রেরণ করেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কে হত্যার জন্য যাকে পাঠিয়েছে সে গ্রেফতার হয়। আর হযরত আলী (রা.) কে হত্যার জন্য যাকে পাঠিয়েছে সে ইবনে মুলজাম বিষ মাখা তলোয়ার দিয়ে আলী (রা.) এর মাথায় আঘাত করে, বলতে লাগল,

‘لَا حُكْمَ إِلَّا لله لَيْسَ لَكَ يَا عَلِيُّ وَلَا لِأَصْحَابِكَ

‘হে আলী! রাজত্ব আল্লাহর জন্য, তোমার জন্য নয় বা তোমার সাথীদের জন্যও নয়।’

তখন সে পাঠ করছিল-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ

‘লোকদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে।’ (বাক্বারাহ : ২০৭)। তখন আলী (রা.) বলে ওঠেন, فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ‘কাবার রবের কসম! আমি সফল হয়েছি।’ কেননা রাসুল (সা.) এ ব্যাপারে আগেই ভবিষ্যতবাণী করে বলেছিলেন, ‘তোমাদেরকে কী আমি সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগা দু’ব্যক্তি সম্পর্কে বলব না? তাদের একজন হলো উটকে হত্যাকারী কওমে ছামূদের উহাইমির। আর অপরজন হলো তোমাকে তোমার এ স্থানে (মাথার শিংয়ের নিকট) আঘাতকারী ব্যক্তি। হে আলী! এমনকি রক্তে তোমার দাড়ি ভিজে যাবে।’

আলী (রা.)-কে যখম অবস্থায় বাড়িতে নিয়ে আসা হলো। ইবনু মুলজাম গ্রেপ্তার হলে তাকে আলী (রা.)-এর নিকট নিয়ে আসা হলো। তিনি তাকে বললেন, ‘হে আল্লাহর দুশমন! আমি কী তোমাকে নাহরাওয়ানের যুদ্ধের দিন ক্ষমা করিনি? সে বলল, হ্যাঁ। তাহলে তোমাকে এ কাজে কে প্ররোচিত করল? সে বলল, আমি ৪০ দিন যাবত এ তরবারিতে ধার দিয়েছি যেন আপনাকে হত্যা করতে পারি। এর দু’দিন পর ৬৬১ সালে ১৯ রমজানে ৬৩ বছর বয়সে শাহাদাতবরণ করেন বিচক্ষণ সেনাপতি ও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জামাতা মুসলিম সম্রাজ্যের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.)।

প্রায় ৪ বছর ৫ মাস খিলাফত পরিচালনাকালে তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তার আলোকে প্রশাসনিক পরিবর্তন, ইসলামী নীতির অনুসরণ অব্যাহত রেখেছেন। আলী (রা.) এর শাহাদাতের পর খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হন হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.)। তবে ছয় বা সাত মাস শাসনকার্য পরিচালনার পর প্রথম ফিতনা অবসানের লক্ষ্যে মুয়াবিয়া (রা.) এর নিকট মুসলমানদের শাসনভার সমর্পণ করেছিলেন এই শর্তের ভিত্তিতে যে, “তিনি আল্লাহর কিতাব এবং নবীর সুন্নত অনুসারে কাজ করবেন। মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর উত্তরাধিকারী নিয়োগ করতে পারবেন না, তবে একটি নির্বাচনী পরিষদ (শুরা) থাকবে। জনগণ যেখানেই থাকুক না কেন তারা নিজেরা, তাদের সম্পত্তি এবং তাদের বংশধরেরা নিরাপদ থাকবে। মুয়াবিয়া (রা.) গোপনে বা প্রকাশ্যে হাসান (রা.) বিরুদ্ধে কোনো অন্যায় কাজ করবেন না এবং তাঁর সাথীদের কাউকে ভয় দেখাবেন না। আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস এবং আমর ইবনে সালিমা এ শর্তগুলোর বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। উল্লিখিত শর্তসাপেক্ষে ক্ষমতাভার মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের নিকট হস্তান্তর করা হয়। হযরত হাসান (রা.) পদত্যাগের পর মুয়াবিয়া

ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে খিলাফতে রাশেদার অবসান হয়।

আমি আগেই বলেছিলাম যে, আমার লেখা আমাদের সোনালী অতীত নিয়ে। তাই আমি কোনো বিচার বিশ্লেষণ বা সূক্ষ্ম পর্যালোচনায় করছি না। ইসলামী খিলাফতের পর মুসলিম শাসনভার যিনি বহন করেছিলেন তাঁর সম্পর্কে আমাদের একটু জানা থাকা দরকার।

মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা.)

মুয়াবিয়া (রা.) ৬০৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছেন। রাসুল (সা.)-এর হিজরতের সময় তাঁর বয়স ছিল ১৮ বছর। তাঁর বংশ পঞ্চম পুরুষে এসে রাসুল (সা.)-এর বংশের সঙ্গে মিলে যায়। তিনি উম্মুল মোমেনিন উম্মে হাবিবা (রা.)-এর সহোদর ভাই ছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় রাসুল (সা.) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে ইসলাম প্রকাশ করলেও মূলত হিজরতের আগেই তিনি গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। যার কারণে বদর, ওহুদ, খন্দকসহ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেননি। তিনি আল্লাহ প্রদত্ত অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও যোগ্যতার অধিকারী এবং কাতেবে ওহিদের একজন ছিলেন। তিনি ফকিহ সাহাবিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। রাসুল (সা.) থেকে তাঁর সূত্রে ১৬৩টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। সর্বপ্রথম তিনিই ইসলামের ইতিহাস রচনা করেছেন।

হজরত উম্মে হারাম (রা.) বলেন, "আমি রাসুল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের সর্বপ্রথম সামুদ্রিক অভিযানে অংশগ্রহণকারী বাহিনীর জন্য জান্নাত অবধারিত" (সহিহ বুখারি, হা : ২৯২৪)। এ হাদিসের ব্যাখ্যায় মুহাল্লাব (রহ.) বলেন, "হাদিসটিতে হজরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। কেননা হজরত মুয়াবিয়া (রা.)-ই ছিলেন ঐ বাহিনীর সিপাহসালার।" (ফাতহুল বারী : ৬/১০২)

হজরত আবদুর রহমান ইবনে আবি উমায়রা (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) মুয়াবিয়ার জন্য এ দোয়া করেছিলেন, "হে আল্লাহ! মুয়াবিয়াকে সঠিক পথে পরিচালনা করুন ও তাঁকে পথপ্রদর্শক হিসেবে কবুল করুন।" (তিরমিজি, হা : ৩৮৪২) ।

একবার মুয়াবিয়া (রা.) রাসুল (সা.)-এর অজুতে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন, তখন রাসুল (সা.) তাঁকে বললেন, "হে মুয়াবিয়া, যদি তোমাকে আমির নিযুক্ত করা হয়, তাহলে আল্লাহকে ভয় করবে এবং ইনসাফ করবে।" মুয়াবিয়া (রা.) বলেন, "সেদিন থেকেই আমার বিশ্বাস জন্মেছিল যে, এ কঠিন দায়িত্ব আমার উপর এসে পড়বে।" (মুসনাদে আহমাদ, হা : ১৬৯৩৩)

হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত। একদিন জিবরাঈল (আ.) রাসুল (সা.)-এর কাছে এসে বললেন, "হে মুহাম্মদ (সা.), মুয়াবিয়াকে সদুপদেশ দিন, কেননা সে আল্লাহর কিতাবের আমানতদার ও উত্তম আমানতদার।" (আল মুজামুল আওসাত, হা : ৩৯০২)

তিনি হজরত ওমর (রা.)-এর খিলাফতকালে দামেস্কের আমির, হজরত ওসমান (রা.) এর সময়ে পুরো শামের (সিরিয়ার) আমির থাকাকালীন সময়ে বহু যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে বিজয় অর্জন করেছেন।

মুসলিম সম্রাজ্য (উমাইয়া খিলাফত) প্রতিষ্ঠা

খোলাফায়ে রাশিদিনের যুগের অবসানের পর মুয়াবিয়া (রা.) মুসলিম সাম্রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁর মেয়াদকাল ছিল ৬৬১ থেকে ৬৮০ সাল পর্যন্ত। মিশর থেকে ইরান পর্যন্ত বিস্তীর্ণ মুসলিম সম্রাজে বিভক্তি ও বিভাজনে এক জটিল পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল,

তিনি প্রজ্ঞা ও রাজনৈতিক দক্ষতার মাধ্যমে মুসলমানদের এ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়েছেন এবং মুসলমানদের মধ্যে উদ্যমতা ফিরিয়ে আনতে সর্বোচ্চ মেধা বিনিয়োগ করেছেন। তার রাজনৈতিক দক্ষতা, মেধা ও প্রজ্ঞায় পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে ইসলামের বিজয় নিশান। তিউনিশিয়ার কায়রাওয়ান থেকে উজবেকিস্তানের বুখারা পর্যন্ত এবং ইয়ামান ও ইথিউপিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল মুসলিম সাম্রাজ্য। হেযাজ, শাম, মিশর, ইরাক, জাযীরাতুল আরব, আরমানিয়া, পারস্য, খুরাসান এবং আমু দরিয়ার ওপাড়ের রাজ্যগুলো ছিল মুসলিম সাম্রাজের অধীনে, তিনি অসংখ্য জল ও স্থলভাগ অধিকার করেন।

মুয়াবিয়া (রা.) এর নেতৃত্বে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) গণ এবং তাবেয়ীগণের উত্তম আখলাক ও চরিত্র মাধুরিমা ইসলামের বিস্তৃতি এবং স্থায়িত্বের জন্য অনেক অবদান রেখেছিলো। যদিও উনার কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এখনো পর্যন্ত দ্বিধা বিভক্তি রয়েছে। উনার শাসনকালীন সময় থেকে ৭৫০ সাল পর্যন্ত উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিল।

মুয়াবিয়া (রা.) মুসলিম সাম্রাজ্যের পরিধি সম্প্রসারণের জন্য পূর্বাঞ্চল পশ্চিমাঞ্চল ও বাইজেন্টাইনে অভিযান প্রেরণ করেন। হযরত ওসমান (রা.) এর পর মুসলিম সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে মুয়াবিয়া (রা.) এর উদ্যোগ ও কৌশল মুসলিম সেনাবাহিনীতে প্রাণ ফিরে আসে। চারিদিকে আল্লাহু আকবার ধ্বনি তোলে মুসলিম সেনারা নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে শুরু করেন। সেনাপতি মুহাল্লাব এর নেতৃত্বে পূর্বাঞ্চলের কাবুল জয় করেন ৬৬১-৬৬২ সালে। গজনী বলখ ও কান্দাহারও মুসলমানদের দখলে চলে আসে। ৬৭৪ সালে বুখারা ও সিন্ধু প্রদেশ এবং সিন্ধু নদের অববাহিকা, ৬৭৬ সালে সামাররা ও তিরমিজ অধিকার করেন মুসলমানরা। পশ্চিমাঞ্চলে অভিযানের নেতৃত্ব দেন ওকবা বিন নাফি তিনি উত্তর আফ্রিকা জয় করেন। ৬৭০ সালে তিউনিসিয়ার দক্ষিণ কায়রোয়ান শহর প্রতিষ্ঠা করে সেখানে রাজধানী কায়রো প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে পশ্চিমাঞ্চল শহর নগর বন্দরসহ পুরো পশ্চিমাঞ্চল আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত উমাইয়া খিলাফত বা মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে যে অঞ্চলের প্রতি মুসলমানদের বেশি আগ্রহ ছিলো তা হলো বাইজেন্টাইন। মুয়াবিয়া (রা.) এর শাসন আমলে পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের পাশাপাশি বাইজেন্টাইন অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি আমিরুল মোমেনিন হযরত ওমর ফারুক (রা.) এর নীতি অনুসারে স্থল ও নৌপথে সামরিক অভিযান অব্যাহত রেখে এজিয়ান সাগরের রোডস ও ক্রিট এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ দখল করে নেন। এ বিজয়কে পুঁজি করে মুসলমানরা সর্বপ্রথম বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করতে সক্ষম হন। ৬৭৪ সালে মুসলমানগণ শহরে দোরগোড়ায় পৌঁছে যায় এবং ৬৭৪-৬৭৮ সাল পর্যন্ত কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করে রাখেন। এ সময়ে মুসলমানদের বড়ো সম্পদ রাসুলুল্লাহ (সা.) এর ঘনিষ্ঠ সাহাবি হযরত আবু আইউব আনসারি (রা.) ইন্তেকাল করেন।

কনস্টান্টিনোপল : রাসুলুল্লাহ (সা.) এই শহর সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের সামনে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, "লাতাফতাহুন্নাল কুসতুনতিনিয়াতা, ফালা নে'মাল আমীরু আমীরুহা ওয়ালানে'মা জাকাল জাইশু" অর্থাৎ নিশ্চিতরূপে তোমরা কুসতুনতিনিয়া জয় করবে। সুতরাং তার শাসক কতই না উত্তম হবে এবং তাঁর জয় লাভকারী সৈন্যরাও কতই না উত্তম হবে!" (মুসনাদে আহমদ)

উমাইয়াদের নেতৃত্বে মুসলিম সেনাবাহিনী সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের ভূমিকা ঠিক যেন হযরত ওমর (রা.) ও হযরত ওসমান (রা.) এর সময়ের মত ছিল। ৬৮০ সালে ৭৭ বছর বয়সে উমাইয়া (বংশের দ্বিতীয় খলিফা) খিলাফতের প্রথম খলিফা মুয়াবিয়া (রা.) দুনিয়ার সফর শেষ করে মহান রবের সান্নিধ্য চলে যান।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এর পর মুসলিম সাম্রাজ্যের খলিফা কে হবেন এ বিষয়টি যদি তিনি মুসলমানদের মধ্যে মাশোয়ারার জন্য ছেড়ে দিতেন তা হতো সর্বোত্তম পন্থা। কিন্তু উনার জীবদ্দশায় নিজ পুত্র ইয়াজিদকে স্থলাভিষিক্ত করায় নতুন বিতর্কের সূচনা হয়। ইতিহাসে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রথম খলিফা হন ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া। অথচ তখনও তাক্বওয়া পরহেযগারী ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সাহাবিগণ অবশিষ্ট ছিলেন। বিশেষ করে হযরত হুসাইন (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.), হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু বকর (রা.) গণের মত প্রথম সারির যোগ্যতা সম্পন্ন সাহাবিগণ জীবিত ছিলেন।

প্রিয় পাঠক! আমি আগেও বলেছি আমি কোনো সূক্ষ্ম পর্যালোচনা বা সমালোচনার উদ্দেশ্যে লিখছি না বরং আমার লেখনীর মূল উদ্দেশ্য হলো আমাদের গৌরবময় ইতিহাসকে তুলে ধরা। তাই মুসলমাদের জন্য সবচেয়ে বেদনাবিধুর সময় ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়ার শাসনকাল নিয়ে আমি বিস্তারিত লিখছি না!

পিতা মুয়াবিয়া (রা.) এর মৃত্যুর পর ৬৮০ সনের এপ্রিল মাস থেকে ৬৮৩ সাল পর্যন্ত তিন বছর মুসলিম সাম্রাজ্য শাসন করেছেন ইয়াজিদ। ইয়াজিদ যেহেতু সাহাবি ছিলেন না তাই তার মধ্যে সাহাবিদের মতো মুমিনীয় গুণাবলি না থাকাই স্বাভাবিক। মুসলিম উম্মাহর জন্য খলিফা নির্বাচন পদ্ধতি সঠিক না হওয়ায় ইয়াজিদের শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ করেন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.), পাশাপাশি হযরত হাসান (রা.) ইন্তেকালের পর ইরাকের জনগণ খলিফা হিসাবে হযরত হুসাইন (রা.) কে আমন্ত্রণ জানান, তিনি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য ইরাকের পথে রওয়ানা হোন।

শাসক ইয়াজিদ বাহিনীর হাতে হযরত হুসাইন (রা.) পরিবারসহ শাহাদাতের নিষ্ঠুর ও হৃদয়বিদারক ঘটনায় ইয়াজিদ বিরোধী আন্দোলন আরও জোরদার হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) মক্কায় বিদ্রোহের ডাক দেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) এর দৌহিত্র আলী (রা.) এর পুত্র হুসাইন (রা.) এর কারবালায় শাহাদাতের মর্মান্তিক ঘটানার পর পুরো মুসলিম উম্মাহ স্তম্ভিত হয়ে যান। ফলে ইয়াজিদের বিরুদ্ধে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) বিদ্রোহ শত চেষ্টা করেও দমাতে পারেনি ইয়াজিদ। ৬৮৩ সালে ইয়াজিদের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যে উমাইয়াদের একক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায়। নিজেদের আন্তবংশীয় সংঘাত, কম বয়সী অনভিজ্ঞ শাসক নিযুক্ত ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) নিজেকে খলিফা ঘোষণা এবং ইরাক, মিশর ও সিরিয়ার কিছু অংশের জনগণ আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) আনুগত্যে স্বীকার করায় উমাইয়া খিলাফত প্রায় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছে।

চলবে ----

সভাপতি, মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন, পর্তুগাল।

সার্কুলার ২০২৪

পবিত্র রামাদ্বান ১৪৪৫ হিজরি উপলক্ষ্যে

কেন্দ্রীয় সভাপতির বাণী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রিয় দ্বীনি ভাই ও বোনেরা,
আসসলামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু।

এমসিএ'র শুরা কাউন্সিল এবং কেন্দ্রীয় বিভাগসমূহের পক্ষ থেকে, আমি আন্তরিকভাবে আপনাকে এবং আপনার পরিবারের সবাইকে 'রামাদ্বান কারীম' এর উষ্ণ অভিবাদন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে আমরা রমাদ্বানের কল্যাণ ও উপকারিতা অর্জনের আরেকটি সুযোগ পেয়েছি। আমি আশা করি এবং একইসাথে দুয়াও করি, যাতে আপনি ও আপনার পরিবারের সবাই কুরআনের উত্তমরূপে অধ্যয়ন, তাকওয়াপূর্ণ উপবাস, একনিষ্ঠ সালাত আদায় এবং সমাজের দুস্থ ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মাধ্যমে পবিত্র এই কুরআনিক মাসের সর্বোচ্চ ফায়দাটুকু হাসিল করতে পারেন। এই মাসে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য ও রাসুল (সা.) এর অনুসরণে আমাদের আন্তরিকতা যেন বৃদ্ধি পায় যাতে করে দুনিয়ায় আমরা শান্তি ও উন্নতি এবং পরকালে জান্নাত অর্জন করতে পারি।

পবিত্র রমাদ্বান আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনকে নতুন করে নবায়ন, ঘাটতি পূরণ এবং ইতিবাচক সংস্কার সাধনের অপূর্ব সুযোগ করে দেয়। রমাদ্বান মুসলিমকে নতুন করে উজ্জীবিত করে এবং জীবনের উত্থান-পতন ও সমস্যা-সম্ভাবনাকে মোকাবেলা করার মতো শক্তি জোগায়। রমাদ্বান মাসটি তাওবাহ ও অনুশোচনা করার মাস। বিগত বছরে আমরা যে গুনাহগুলো করেছি, সেগুলো সাফ করে পবিত্র করে দেয় এই রমাদ্বান। রমাদ্বান মাস ক্ষমা প্রার্থনার মাস। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে উন্নত সম্পর্ক তৈরি করার এবং নামাজ ও ইবাদতে সমৃদ্ধ একটি জীবন গড়ার উৎকৃষ্ট সময় এই রমাদ্বান।

আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

"আর আমার বান্দারা যখন আপনার কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে; বলে দিন, আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা যখন আমার কাছে

দুয়া করে, আমি তাদের দুয়া কবুল করে নেই। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎ ও সঠিক পথে আসতে পারে।" (সুরা বাকারা : আয়াত ১৮৬)

রমাদ্বান হলো একনিষ্ঠভাবে চেষ্টা করার সময় যাতে করে ঈমানের উচ্চতরমানে পৌঁছানো যায়, ব্যাপক পরিসরে ইবাদত করা যায় এবং শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশি করার নিয়তে বেশি বেশি জনমানুষের সেবা করা যায়। রমাদ্বান মাসে উপবাস করার অনেকগুলো উপকারিতা রয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহতে রমাদ্বান মাসে পানাহার থেকে বিরত থাকার অসংখ্য ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। রমাদ্বানের অসংখ্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপকারিতার মধ্যে আমরা এ পর্যায়ে মূলত তিনটি উপকারিতার ওপর আলোকপাত করতে চাই:

১.আত্মসচেতনতার মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন :

আমরা যখন পানাহার থেকে সক্রিয় ও সচেতনভাবে বিরত থাকতে শুরু করি, আমাদের আধ্যাত্মিক চেতনাগুলো তখন সমৃদ্ধ হয়। আমাদের কথা, চিন্তা ও ভাবনাগুলো এই মাসে নিজের আভ্যন্তরীণ সত্তার সাথে সংযুক্ত হয়। আল্লাহভীতি ও তাকওয়ার পাশাপাশি এই গভীর আত্মসচেতনতা তৈরি হওয়ায় আমরা ভেবে চিন্তে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে শিখি। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,
"মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামীকালের কর্মকাণ্ড নিয়ে চিন্তা করা। আর আল্লাহ তাআলাকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে খবর রাখেন।" (সুরা হাশর : আয়াত ১৮)

মুসলিম হিসেবে এই মাসে ইতিবাচক একটি ভিত্তি থেকে আমাদের সবারই আত্মপর্যালোচনার সর্বোচ্চ প্রয়াস চালানো প্রয়োজন। আমরা যে অবস্থায় আমরা থাকি না কেন, আমাদের সবারই আল্লাহর পরিকল্পনার কথা স্মরণ করা উচিত এবং একইসাথে, জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে তাঁর ফায়সালাগুলো আমাদের জন্য সর্বোত্তম হিসেবে মেনে নেয়ার মানসিকতাও থাকা প্রয়োজন। আমাদের অন্তরে সুপ্ত অবস্থাতেও যেন কোনো অভিযোগ না থাকে। জীবনটা কেন আমার ক্ষেত্রে এমন হলো তা অনুধাবন করতে এই অনুভূতি আমাদের সহায়তা করে। জীবনের অনিশ্চয়তাগুলো তখন আমরা ঈমানের শক্তিতে বলিয়ান হয়ে অতিক্রম করতে পারি এবং সবসময় উত্তম কিছু হওয়ার সম্ভাবনায় উজ্জীবিত থাকতে পারি। আল্লাহর ফায়সালাকে তখন আমরা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিতে পারি। এমনকি যদি এ ফায়সালাগুলো আপাতদৃষ্টিতে মন্দ ও অনুভূত হয় তারপরও আমরা বুঝতে পারি যে, সবকিছু আল্লাহ তাআলাই নিয়ন্ত্রণ করছেন (কদর)।

রমাদ্বান মাসে এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক যে, আমরা সূর্য উদয়ের আগে একবার খাবো এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পর আরও একবার খাবার গ্রহণ করবো।

২.রমাদ্বান আত্মনিয়ন্ত্রণের শিক্ষা দেয় :

ইসলাম এমন একটি বিশ্বাসের নাম যা আত্মনিয়ন্ত্রণের ওপর খুব বেশি গুরুত্বারোপ করে। আমরা উপবাসকে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মশৃঙ্খলা শেখার জন্য শক্তিশালী প্রশিক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করি। কারণ, উপবাস আমাদের সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখায় (সুরা বাকারা : ১৮৩)। ভোর হওয়ার আগেই ঘুম থেকে ওঠা এবং প্রতিটি ভোরে নামাজ আদায় করার জন্য যেমন কষ্ট করতে হয়, তেমনি রোজাদারকে তার নিজের মঙ্গলের স্বার্থে জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয় এবং নিজের সতীত্ব ও গোপনাঙ্গও হেফাজত করতে হয়। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের ছাড় দেয়ার সুযোগ নেই। একজন মুসলিম হিসেবে আমাদেরকে প্রতিনিয়তই এমন সব পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয় যেখানে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সংযমের প্রয়োজন হয় এবং নাফস ও প্রবৃত্তির ওপরও জয়ী হতে হয়।

নিজেকে সংশোধন করার জন্য এবং অনিষ্টকর শক্তির সাথে আমাদের লড়াইয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার এবং নিজেদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উৎকৃষ্ট সময় হলো রমাদ্বান। রমাদ্বান এমনই এক মাস যা আমাদেরকে জুলুম ও অনাচার, অসমতা, নিপীড়ন, দারিদ্রতা এবং সমাজের অন্যান্য ভোগান্তি মোকাবেলা করার শক্তি জোগায়। একইসঙ্গে, রমাদ্বান আমাদেরকে চারপাশের মানুষগুলোর সাথে সম্পর্ক রক্ষার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং আমাদের সৃষ্টির নেপথ্যের মূল কারণ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কেও সচেতন করে। এর অর্থ হলো, আমাদেরকে ধর্ম ও গোত্র নির্বিশেষে সকল অসহায় ও দরিদ্র মানুষকে সহযোগিতা করতে হবে। ইসলামের প্রায়োগিক রূপ এমনটাই। (কুরআন, ৩ : ১১০)

৩.রমাদ্বান অপরকে সাহায্য করার শিক্ষা দেয়:

রমাদ্বান ভালোবাসা ও কল্যাণ ছড়িয়ে দেয়ার মাস। রমাদ্বান অপরের প্রতি ভালোবাসার জায়গা থেকে দান-সদাকা করার মাস। আল্লাহ

সার্কুলার

পাক কুরআন মজিদে ইরশাদ করেন–
“সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিমদিকে মুখ করবে, বরং বড়ো সৎকাজ হল এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর কেয়ামত দিবসের ওপর, ফেরেশতাদের ওপর এবং সমস্ত নবী-রসূলগণের ওপর, আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম-মিসকিন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে। আর যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, জাকাত দান করে এবং যারা নিজেদের দেয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য্য ধারণকারী তারাই হল সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই পরহেযগার।” (কুরআন ২: ১৭৭)

আমাদের প্রিয়নবি (সা.) বলেন, “রোজা পালনের সময় কিয়ামতের দিনের ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কথা স্মরণ করবেন। গরিব-দুঃখীকে দান করুন। বড়োদের সম্মান করুন, ছোটদের প্রতি সহানুভূতি করুন এবং আপনার আত্মীয় এবং আত্মীয়দের প্রতি সদয় হোন...” {রমাদ্বান মাসের আগে নবিজি (সা.) এর খুতবা}

অতএব, রমাদ্বান হলো ঐ মানুষগুলোকে মনে রাখার সর্বোত্তম সময় যাদের কাছে পর্যাপ্ত খাবার নেই এবং যারা প্রায়শই ক্ষুধার্ত থাকেন। আমাদের গাজার ভাই ও বোনেরা বর্তমানে ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন। আমাদের জন্য কেবল আর্থিক এবং শারীরিক সহায়তার মাধ্যমেই তাদের পাশে দাঁড়ানো যথেষ্ট নয় বরং তারা যেন এ দুর্দশা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন সেই জন্য নিয়মিত দুয়া করাও জরুরি। গাজাবাসী যেভাবে দুর্যোগ মোকাবেলা করছে তা থেকে আমাদেরও ধৈর্য ও প্রত্যয়ী হওয়ার শিক্ষা নেয়া উচিত।

এই পবিত্র কুরআনিক মাসে, আমরা অবশ্যই কুরআনকে বেশি বেশি ভালোবাসবো, কুরআন থেকে শিখবো, কুরআনের আলোকে জীবন যাপন করবো, অন্যকেও কুরআনের মাধ্যমে পরিচালনা করবো, কুরআনের মাধ্যমে জীবনের ভোগান্তি ও বোঝা উপশম করবো, অনিষ্টতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখবো, আল্লাহ ও জান্নাতের সাথে কুরআনের সাথে সম্পর্ক তৈরি করবো, সুন্দর ও সুমিষ্ট তেলাওয়াত শুনে অন্তরকে শীতল করবো, কুরআনের আলোকে ভবিষ্যতকে সুন্দর করার চেষ্টা করবো, কুরআনের ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রচনা করবো এবং এভাবে জান্নাত হাসিলের জন্য প্রয়াস চালাবো। বিশেষ এই মাসে, আমাদের ভাবনা, চিন্তা, অনুভূতি, অগ্রাধিকার ও কার্যক্রমকে উন্নত করতে হবে যাতে করে পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়, এমসিএ’র জনশক্তির সাথে ভাতৃত্ব মজবুত হয়, এবং উন্নত শিষ্টাচার অনুশীলনের মাধ্যমে সকলের কল্যাণ নিশ্চিত করা যায়।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমরা আল্লাহর বান্দা হিসেবে নিজেদেরকে আল্লাহর গোলামীতে কতটুকু সোপর্দ করতে পেরেছি, কিংবা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মানব সেবায় কতটুকু নিয়োজিত হতে পেরেছি– তা নিয়ে আমাদের চিন্তাভাবনা করা উচিত। আমাদের চরিত্র ও আচার আচরণ আমাদের জন্য প্রেরিত সর্বোত্তম আদর্শ তথা রাসুল (সা.) এর সাথে কতটা সঙ্গতিপূর্ণ? আভ্যন্তরীণ ব্যক্তিত্ব এবং বাহ্যিক আচরণ ও পারদর্শিতার ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে আরও উন্নত করতে পারি? আসুন, এই মাসটুকু আমরা আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য কাজে লাগাই। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রচেষ্টাগুলো কবুল করে নিন। এমসিএ’র মূল লক্ষ্য স্মরণে রাখবেন, “আমাদের এমসিএ: জান্নাতে যাওয়ার একটি বাহন; খুলুসিয়াত হলো আমাদের জ্বালানি আর ভ্রাতৃত্ব হলো আমাদের মূল চালিকাশক্তি।”

আসুন আমরা এই রমাদ্বানের জন্য যত্নের সাথে এমন একটি কার্যকরী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করি। আসুন, আমরা আমাদের সময়গুলোকে সঠিক ও কার্যকরভাবে ব্যবহার করি। অপ্রয়োজনীয় কাজ এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অহেতুক ব্যবহার থেকে বিরত থাকি। আল্লাহ তাআলা আসন্ন রামাদানে আমাদের সবাইকে ইবাদতে ও মুআমেলাতে সক্রিয় থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন।

আপনার প্রিয় দ্বীনি ভাই

হামিদ হোসাইন আজাদ
কেন্দ্রীয় সভাপতি

সংগঠন সংবাদ

এমসিএ'র মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

নেই কেউ নেই আল্লাহ ছাড়া– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এমন গানে গানে মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ছিল এলএমসি প্রাঙ্গনে। সময়ের আগেই জড়ো হতে থাকেন নবীন-প্রবীণ শিল্পী ও সংগীতপ্রেমিরা। মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন (এমসিএ) আয়োজিত কালচারাল কনফারেন্সে যোগ দিয়ে ছিলেন ১২ সংগঠনের বিপুল সংখ্যক সাংস্কৃতিক কর্মী।

গত ১ মার্চ ২০২৪ (শুক্রবার) এই সংগীতসন্ধ্যা উপভোগ করেছেন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। শিল্পীদের কণ্ঠ লহরিতে মুগ্ধ-আপুত হয়েছেন তারা। তরঙ্গায়িত হয়েছেন বাংলা ভাষার এমন সৃষ্টি সৌকর্যে। অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রধান অতিথি ব্যারিস্টার হামিদ আযাদ একঝাক বাছাই করা শিল্পী নিয়ে কালজয়ী শিল্পী মতিউর রহমান মল্লিকের গানে কণ্ঠ দিলেন। তিনি যে এমন ভালো গাইতে পারেন তা অনেকের জানা ছিল না। প্রাণ খুলে গাইলেন দারুণ মিষ্টি কণ্ঠে। সবার মন ছুঁয়ে গেল। "পাখির গানে গানে হাওয়ার তানে তানে ঐ নামেরই পাই মহিমা হলে আপনহারা" পংক্তিটি এমন হৃদয় দিয়ে গেয়েছেন, মনটা যেন মুচড়ে দিয়েছে। আর তখনই উপস্থিত সকলে শিল্পীদের সাথে সুর ধরলেন "ফুলের ঘ্রাণে ঘ্রাণে অলির গুঞ্জরণে ঐ নামেরই গান শুনে মন দেয় যে নীরব সাড়া।" "আকাশ নীলে নীলে মুখর ঝিলে ঝিলে ঐ নামেরই ঝরনা ধারা আকুল ব্যাকুল পারা।" পুরা গানটাই যেন সকলের মুখস্ত। এরপর প্রাণবন্ত আসরে চলেছে একের পর এক গান, কবিতা আবৃত্তি, নাটিকা ও মুকাভিনয়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে ম্যাসেজ কালচারাল গ্রুপ, ওয়াননেস কালচারাল গ্রুপ, ভিশন কালচারাল গ্রুপ, রেনেসাঁ কালচারাল গ্রুপ, প্রেরণা কালচারাল গ্রুপ, সাইট এন্ড সাউন্ড কালচারাল গ্রুপ, আল হেরা কালচারাল গ্রুপ, থেম্‌স কালচারাল গ্রুপ, ফ্লাওয়ার বার্ড ও তারান্নুম কালচারাল গ্রুপের শিল্পীবৃন্দ।

তবে সুরের স্রোতে আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়নি কল্পলোকে। কেবল নাটক আর গান নয়, আলোচনাও ছিল শিক্ষণীয়। মুগ্ধতায় ভরপুর। মনের ক্যানভাসে যেন আঁকিয়ে দেওয়া সত্য সুন্দরের ছবি।

মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন (এমসিএ) আয়োজিত কালচারাল কনফারেন্সে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংগঠনের সেন্ট্রাল প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার হামিদ হোসাইন আজাদ বলেছেন, আমাদের সংস্কৃতি হবে প্রশান্তিময় গতিশীল সমাজ গঠনের সংস্কৃতি। এটি বেহায়াপনার উদ্দাম চর্চা নয়, অনৈতিকতার সুড়সুড়ি মাখা গানের চর্চা নয়, স্বার্থপরতার পদলেহী নাটকের মঞ্চায়ন নয়, হিংসা ও পরশ্রীকাতরতায় পূর্ণ কাব্য গাথা নয়, দানবিকতার উন্মেষ ঘটানোর নগ্ন হাতিয়ার নয়, ইতিহাস বিকৃতির গাল্পিক প্রতিযোগীতাও নয়। বরং আমাদের সংস্কৃতি আত্মিক ও মানবিক মূল্যবোধের উজ্জীবন ঘটানোর সংস্কৃতি, আমাদের সংস্কৃতি সুন্দর ও সাবলীল সমাজ বিনির্মাণের সংস্কৃতি, আমাদের সংস্কৃতি সামাজিক ঐক্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার সংস্কৃতি, আমাদের সংস্কৃতি ন্যায় ও নৈতিকতার বিকাশ সাধনের সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির

SIGHT & SOUND
CULTURAL GROUP

VISION
CULTURAL GROUP

MUSLIM COMMUNITY ASSOCIATION
CULTURAL CONFERENCE 2024

PRAYER

MUSLIM COMMUNITY ASSOCIATION
CULTURAL CONFERENCE 2024

CULTURAL GROUP

TARANNUM
CULTURAL GROUP

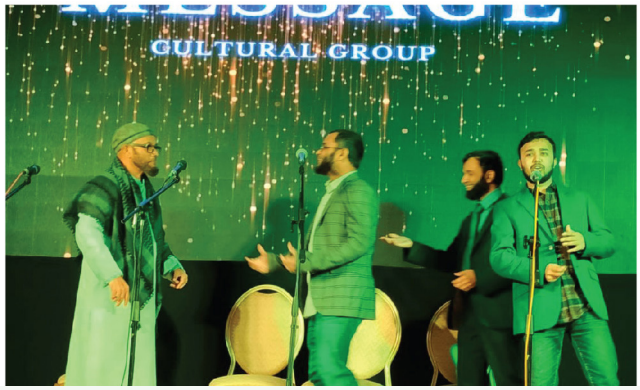
CULTURAL GROUP

নৈকট্য প্রতিষ্ঠার সংস্কৃতি। ব্যারিস্টার হামিদ দৃঢ়তার সাথে বললেন, আমাদের সংস্কৃতি হবে ফিলিস্তিন মিয়ানমারসহ বিশ্বময় নিষ্পেষিত মজলুমের পক্ষে উদ্দীপনা সৃষ্টির গান, আমাদের সংস্কৃতি হবে হতাশাগ্রস্ত অসহায় মানুষের মনের আকাশে আশার ধ্রুব জ্যোতি জ্বালানোর গান। পাহাড় বনানী, সাগর নদী আর পাখ পাখালির সুরের তানে আমাদের সংস্কৃতি হবে বিশ্ব জাহানের মালিকের শ্রেষ্ঠত্বের গান। মহান রবের একত্বের গান। অনুষ্ঠানটি লাইভ সম্প্রচার করেছে ব্রিটেনের জনপ্রিয় টেলিভিশন ইসলাম চ্যানেল। এছাড়া অনলাইনে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দেখেছেন বহু সংখ্যক সঙ্গীতপ্রেমী মানুষ। এমসিএ'র কালচারাল ডিপার্টমেন্টের ডাইরেক্টর মনোওয়ার হোসাইনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন সংগঠনের জেনারেল সেক্রেটারি নুরুল মতিন চৌধুরী। উপস্থিত সকল অতিথি এবং দেশ-বিদেশে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণকারীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অনুষ্ঠানে পরিচালক। এমসিএ'র কালচারাল কনফারেন্সে মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন লেখক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মসহ বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষ। প্রধান অতিথির সাথে প্রতিধ্বনি করে তারাও বলেছেন– এমন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আমাদের মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাবে। যেটি আলোকিত পৃথিবী গড়ার কথা বাতলাবে। বলবে মানবতার কথা, সামাজিক ঐক্যের কথা, জালিমের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদী হওয়ার কথা। বলবে স্বাধীনতার কথা, কুরআনের কথা। চারদিকে ছড়িয়ে দেবে প্রিয়নবীর আদর্শ জীবনের আলোকচ্ছটা।

মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশনের লুটন ব্রাঞ্চের কর্মী সম্মেলন ২০২৪ অনুষ্ঠিত

গত ২৮ শে জানুয়ারি ২০২৪ রোববার লুটনের হকওয়েল রিং জামে মসজিদে মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশনের লুটন শাখার কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাদ মাগরিব থেকে সম্মেলন শুরু হয়ে এশার নামাজের পূর্বে শেষ হয়। সংগঠনের বিপুল সংখ্যক জনশক্তি পরিবার-পরিজন নিয়ে সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে সম্মেলন থেকে দাওয়াতি কাজের খোরাক নিয়ে যান।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন লুটন ব্রাঞ্চের সভাপতি জনাব আবুল কালাম ও সঞ্চালনা করেন আশরাফুল হত খান রুমান। পবিত্র কুরআন থেতে তেলোয়াত করেন হযরত আবু বকর (রা.) ইউনিটের সভাপতি মাওলানা হাফিজুর রহমান।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন এমসিএ-র কেন্দ্রীয় সভাপতি ব্যারিস্টার হামিদ হোসাইন আযাদ। তিনি সংগঠনের ভিশন ও মিশন নিয়ে বক্তব্য রাখেন। সংগঠনের কর্মীদের কাঙ্ক্ষিত মান এ বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন জেনারেল সেক্রেটারি নুরুল মতিন চৌধুরী। এতে আরও বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় মিডিয়া সেক্রেটারি সৈয়দ তোফায়েল হুসেইন, ইস্ট অব ইংল্যান্ড রিজিয়নের সভাপতি শরিফুর রহমান, সেক্রেটারি মাওলানা শাহীদ আহমদ প্রমুখ।

সম্মেলনে লুটন ইসলামিক কালচারাল গ্রুপের সংগীত শিল্পীদের হৃদয়গ্রাহী ও শ্রুতিমধুর চমৎকার ইসলামী সংগীত বাড়তি আকর্ষণ সৃষ্টি করে। অনুষ্ঠানে আগত লুটন ব্রাঞ্চের সকল ইউনিট দায়িত্বশীল এবং বেডফোর্ড, সেন্ট আল বান্স ও মিল্টন কিন্স শাখার দায়িত্বশীলদের পরিচয় পূর্বক সকলের নিকট দাওয়াতি কাজের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সম্বলিত ফাইল তুলে দেন প্রধান অতিথিসহ মেহমানবৃন্দ।

ব্রামিংহাম ইস্ট ব্রাঞ্চের উদ্যোগে ট্রেনিং এবং ডেভেলপমেন্ট সেশন অনুষ্ঠিত। প্রধান অতিথি মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব ব্যারিস্টার হামিদ হোসাইন আযাদ।

ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস রিজিয়নের উদ্যোগে মেম্বার ট্রেনিং সেশন অনুষ্ঠিত। প্রধান অতিথি মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব ব্যারিস্টার হামিদ হোসাইন আযাদ ও জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা নুরুল মতিন চৌধুরী।

ব্রামিংহাম ইস্ট ব্রাঞ্চের উদ্যোগে ট্রেনিং এবং ডেভেলপমেন্ট সেশন অনুষ্ঠিত। প্রধান অতিথি মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব ব্যারিস্টার হামিদ হোসাইন আযাদ।

লন্ডন ওয়েস্ট রিজিয়নের উদ্যোগে ট্রেনিং এবং ডেভেলপমেন্ট সেশন অনুষ্ঠিত। প্রধান অতিথি মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব ব্যারিস্টার হামিদ হোসাইন আযাদ।

এমসিএ এর সেন্ট্রাল উলামা এন্ড রিলিজিয়াস ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে উলামা কনফারেন্স অনুষ্ঠিত। প্রধান অতিথি এমসিএ এডভাইজারি কাউন্সিলের সেক্রেটারি মোসলেহ ফারাদী।

এমসিএ এর সেন্ট্রাল উলামা এন্ড রিলিজিয়াস ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে উলামা কনফারেন্স অনুষ্ঠিত। প্রধান অতিথি এমসিএ এডভাইজারি কাউন্সিলের সেক্রেটারি মোসলেহ ফারাদী।

KARAM AL - HEJAZ
FOR UMRAH SERVICES
Madinah AlMunawwarah - Hotel Karam AlMadinah - Beside Masjid AlGhamamah
Mobile : +966542940540-+966 538932179
Email : karamalhijaz@gmail.com - khumrahservice@gmail.com

ALL SEASON FOODS
ALL SEASON
FOODS
SANDWICH &
CHILLED FOOD SUPPLIER
RAMADAN
SPECIAL OFFER
FOR IFTAR
SCHOOL
MEAL CATERER
HALAL
WEDDING
& EVENT
MANAGEMENT
Contact Us
020 7423 9366
www.allseasonfoods.com
88 Mail End Road, EI 4UN
info@allseasonfoods.com
sandwiches@allseasonfoods.com

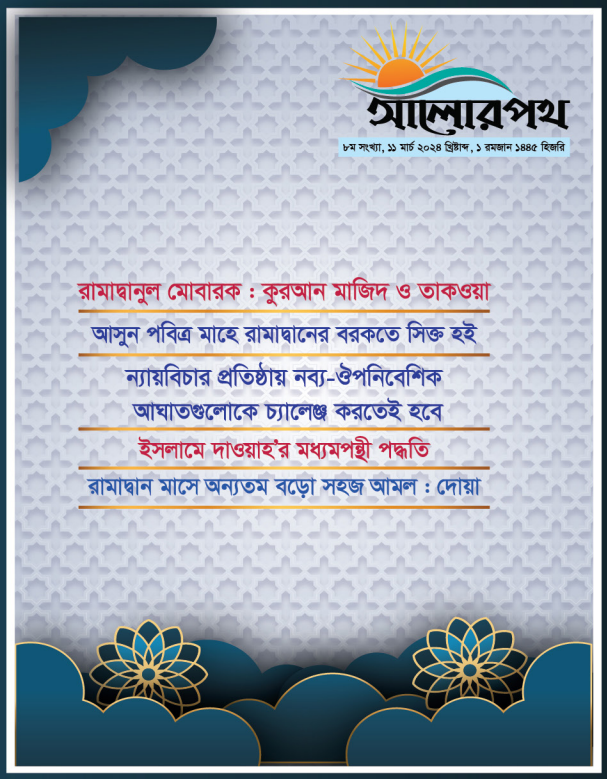
আলোরপথ
৮ম সংখ্যা, ১১ মার্চ ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ, ১ রমজান ১৪৪৫ হিজরি
রামাদ্বানুল মোবারক : কুরআন মাজিদ ও তাকওয়া
আসুন পবিত্র মাহে রামাদ্বানের বরকতে সিক্ত হই
ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় নব্য-ঔপনিবেশিক
আঘাতগুলোকে চ্যালেঞ্জ করতেই হবে
ইসলামে দাওয়াহ'র মধ্যমপন্থী পদ্ধতি
রামাদ্বান মাসে অন্যতম বড়ো সহজ আমল : দোয়া